DECADENCE

by M. Gorky

Translated into Bengali by

Amiya Roychowdhury

প্রচ্ছদ : মদন সরকার

প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৭



প্রকাশিকা / আরতি চক্রবর্তী, পত্রপুট, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক / বিজয় চক্রবর্তী, মুদ্রণায়ন, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় সুহৃদ

শ্রী শচীন্দ্র নাথ দে-কে

প্রথম খণ্ড

কৃষকদের দাসত্ব মুক্তির* পর প্রায় দুটি বছর কেটে গিয়েছে। যীশু খৃষ্টের রূপান্তর* উৎসব উপলক্ষে উপাসনার জন্যে ড্রায়ামোভের অধিবাসীরা সেন্ট নিকোলাস গির্জায় সমবেত হয়েছিল। উপাসনা চলাকালীন দীর্ঘদেহী বহিরাগত একটি মানুষ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অত্যন্ত শক্তিধর বলিষ্ঠ চেহারা লোকটির। লম্বা নাক, ঘন কুঞ্চিত চাপদাড়ি, তাতে সাদার ছোপ লেগেছে। মাথায় বেদের মতো ঝাঁকড়া চুল। হাত দুটি এত লম্বা যে ঝুলিয়ে দিলে হাঁটু স্পর্শ করে। মোটা ভুরুর তলায় নীল-ধূসর চোখের দৃষ্টি উদ্ধত।

অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে লোকটি ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে মহাত্মাদের মূর্তিগুলোর নিচে দামী মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল। ড্রায়ামোভের মানুষদের কাছে এই মূর্তিগুলো অত্যন্ত শ্রদ্ধার জিনিস। কিন্তু লোকটি সকলের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে গণ্যমান্য লোকদের সারিতে এসে ক্রুসের বেদীর কাছে এগিয়ে গেল।

প্রার্থনা অনুষ্ঠান শেষ হলে ড্রায়ামোভের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গির্জার প্রবেশ-পথে জমায়েত হল বহিরাগত সম্পর্কে পরস্পরের মত বিনিময় করতে। কেউ বলল, লোকটি নিশ্চয়ই গরু-ভেড়া কেনাবেচা করে আবার কারো মতে লোকটি কোনো জায়গার কৃষকদের মোড়ল। কিন্তু স্থানীয় কৃষকদের মোড়ল যেভগী বাইমাকোভ যে অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ, স্বাস্থ্য খারাপ হলেও মনটি যার ভালো সে সামান্য কেশে নিয়ে শান্তস্বরে বলল, লোকটি বোধহয় কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তির ভৃত্য অথবা শিকারী কিংবা বড়লোকদের ভাঁড়।

বস্ত্রব্যবসায়ী পমিয়ালোভ মুখ খুলল। লোকটির মুখে অসংখ্য মেচেতার দাগ। তার কুৎসিত চেহারায় যেন মনেরই প্রতিফলন ঘটেছে। লোকেরা তার নাম দিয়েছে 'বিপত্নীক আরশোলা'। সে বলল, দেখলে না লোকটার

* রাশিয়ায় কৃষক ক্রীতদাস প্রথার অবসান হয় ১৮৬১ সালে।

* এক উচ্চ পর্বতে পিতর যাকোব ও যোহনের সম্মুখে যীশু রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁর মুখ সূর্যের মতো দেদীপ্যমান ও বস্ত্র দীপ্তির ন্যায় শুভ্র হয়ে উঠেছিল। ৬ই আগস্ট উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়।

কেমন বড় বড় থাবা। আর হাঁটছে দ্যাখো এমন চালে যেন ওর সম্মানে কেল্লায় কেল্লায় ঘন্টা বেজে চলেছে।

লোকটির গায়ে ঘন নীল মোটা কাপড়ের ওভারকোট, পায়ে ভালো রাশিয়ান চামড়ার জুতো। সত্যিই সে রাস্তা দিয়ে এমন ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে যেন গোটা অঞ্চলটারই অধীশ্বর সে।

গির্জায় রুটি তৈরি করে যে তার নাম এদানস্কায়া। ঘণ্টা বেজে উঠতেই আগন্তুক সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য আবিষ্কারের ভার তার ওপর ছেড়ে দিয়ে সকলেই বাড়ির দিকে পা বাড়াল। সেদিন সন্ধ্যায় পমিয়ালোভের ফলের বাগানে চায়ের আসরে সবাই মিলিত হবে সে কথাও পাকা হয়ে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পর ড্রায়োমোভের অন্যান্য অধিবাসীরা সেই অপরিচিত লোকটিকে দেখতে পেল নদীর ওপারে সেই জায়গাটার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে যাকে তারা 'গরুর জিভ' বলে। এই অঞ্চলটা এক সময় রাটস্কি রাজাদের জমিদারী ছিল। দীর্ঘ এবং মাপা পদক্ষেপে বেলেমাটির অঞ্চল ও উইলো ঝোপ পেরিয়ে এসে সে এখন তাকিয়ে আছে ওকা নদী ও তারই পঙ্কিল শাখা ভাটারাস্কার দিকে। ড্রায়োমোভের লোকেরা খুবই সাবধানী তাই কারোরই সাহস হচ্ছে না যে চিৎকার করে লোকটিকে জিজ্ঞেস করে, সে কে? এবং কি করছে সে ওখানে দাঁড়িয়ে? তার বদলে তারা চৌকিদার যে একাধারে মাতাল ও ভাঁড় সেই মাস্কা স্টুপাকে পাঠালো লোকটির কাছে। নির্লজ্জ স্টুপা মেয়েদের উপস্থিতিতেই চৌকিদারের প্যান্ট খুলে ফেলল কিন্তু মাথায় তোবড়ানো টুপিটা রয়েই গেল। এইভাবেই সে পঙ্কিল ভাটারাস্কা পেরিয়ে ওপারে পৌঁছলো। মদে কাপা বিশাল ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে সে আগন্তুকের কাছে গিয়ে পৌঁছলো। নিজেকে সাহসী প্রমাণ করার জন্যে সে ইচ্ছে করেই চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, কি তার পরিচয়?

আগন্তুক যে কি বলল শোনা গেল না তবে স্টুপা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল। ফিরে এসে সে সবাইকে বলল, লোকটার চোখের দৃষ্টি ডাকাতের মতো ভয়ঙ্কর। সে আমাকে প্রশ্ন করল, তুমি এত কুৎসিত দেখতে কেন?

এদানস্কায়া যে একাধারে গির্জায় রুটি তৈরি করে, ভাগ্য গণনাও করতে পারে এবং জ্ঞানী বলেও যার খ্যাতি আছে সে তার ঝুলে পড়া থুতনি দুলিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় পমিয়ালোভের ফলের বাগানে উপস্থিত হয়ে শহরের গণ্যমান্য লোকেদের কাছে তার তদন্তের তথ্য পেশ করল।

চোখ বড় বড় করে সে বলল, লোকটির নাম ইলিয়া আর তার পদবী হচ্ছে আর্টামনোভ। সে এখানে ব্যবসা করবে বলে এসেছে তবে কি ধরনের

ব্যবসা করবে সে খবর আমি বের করতে পারিনি। ভোর্গোরোড ধরে সে এসেছিল আবার ওই রাস্তা দিয়েই বেলা তিনটের পর আবার সে ফিরে গিয়েছে।

এই সামান্য তথ্য থেকে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আগন্তুক সম্পর্কে কিছুই জানতে পারল না। ব্যাপারটা বড়ই অস্বস্তিকর। ঠিক যেন গভীর রাতে কেউ জানলায় টোকা মেরে বিপদের নির্বাক ইঙ্গিত জানিয়ে উধাও হয়ে গেল।

এরপর তিন সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। এই ঘটনার স্মৃতি যখন শহরের লোকেদের মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে তখন একদিন আর্টামনোভ তার তিন ছেলেকে নিয়ে হাজির হলো বাইমাকোভের সামনে। কুড়ুলের ঘায়ের মতো আঘাত করলো তার কথাগুলো বাইমাকোভকে।

তার জীবনবৃত্তান্ত অতি সংক্ষিপ্ত এবং যুক্তিসঙ্গত। রাতিয়া নদীর ওপারে রাটস্কি রাজাদের জমিদারী কুর্স্ক-এ রাজকুমার জর্জের দেওয়ান ছিল সে। দাসত্ব মুক্তির পর মোটা অঙ্কের টাকা পাওয়ার পর সে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। এখন এই অঞ্চলে একটি কাপড়ের কল খোলাব মনস্থ করেছে সে। সে বিপত্নীক। তার বড় ছেলের নাম পিওতর। আর যার পিঠে কুঁজ রয়েছে তার নাম নিকিতা। আর তৃতীয়টি তার ভাগ্নে, তাকে সে দত্তক নিয়েছে। নাম তার আলেক্সি।

বাইমাকোভ চিন্তিত মুখে বলল, আমাদের কৃষকরা তো শণ বিশেষ বোনে না।

—বেশি বুনতে তাদের আমরা বাধ্য করবো।

গম্ভীর ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আর্টামনোভের। যখন কথা বলে মনে হয় যেন বিশাল এক ঢাক পিটোচ্ছে। বাইমাকোভ সারাজীবন চলেছে অতি সাবধানে, কথা বলে অত্যন্ত ধীরে, কোনো এক ভয়ঙ্কর অতিকায় দানবের জেগে ওঠার আশঙ্কায় সব সময়েই সে ভীত। সে করুণ চোখে পিটপিট করে তাকাল আর্টামনোভের ছেলেগুলোর দিকে। তারা দরজার সামনে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চেহারায় কারো সঙ্গে কারোর এতটুকু মিল নেই। বড়টির চওড়া কাঁধ, জোড়া ভুরু, ভালুকের মতো ছোট ছোট চোখ, সব মিলিয়ে সে দেখতে অনেকটা তার বাপের মতোই। নিকিতার চোখ দুটো অনেকটা মেয়েদের মতো। তার জামার রঙের মতোই ঘন নীল এবং দীর্ঘায়ত। আলেক্সির কোঁকড়া চুল, গোলাপী রঙের গাল, এবং বেশ হাসিখুশি

—এদের মধ্যে একজনকে তো আর্মিতে পাঠাতে হবে। বাইমাকোভ মন্তব্য করল।

—না, ওরা আমার কাছেই থাকবে, আমি ওদের ছাড়পত্র সংগ্রহ করে রেখেছি। এই কথা বলেই সে হাতের ইশারায় ওদের সরে যেতে বলল। একের পিছনে এক, এইভাবে সারিবদ্ধভাবে ওরা চলে যেতেই সে তার ভারি হাতখানা বাইমাকোভের হাঁটুর ওপর রেখে বলল, যেভসী মিট্রিচ আমি কিন্তু আপনার কাছে ঘটক হিসেবেও এসেছি। আমার ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিন।

বাইমাকোভ এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে ভয়ে কাঁপতে লাগল। আসন ছেড়ে সে লাফিয়ে উঠে হাত নেড়ে বলতে লাগল, হায় ঈশ্বর! এ তোমার কী ধরনের প্রস্তাব? জীবনে এই প্রথম আমি তোমাকে দেখলাম। তোমার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, তার কাছ থেকে এই প্রস্তাব! আমার একমাত্র কন্যা, তা ছাড়া তার এখনো বিয়ের বয়সও হয়নি। তুমি তো আমার মেয়েকে দেখোওনি, সে কেমন দেখতে তাও তুমি জানো না। কী করে এমন চিন্তা তোমার মাথায় এল?

কোঁকড়ানো দাড়ির ভেতর থেকে আর্টামনোভের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তারপর দৃঢ়স্বরে সে বলল, পুলিসের ক্যাপ্টেনের কাছে জিজ্ঞেস করলেই আমার সম্পর্কে জানতে পারবেন। আমার ভূতপূর্ব মনিব রাজকুমারের কাছে সে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। রাজকুমার ক্যাপ্টেনকে লিখিত নির্দেশ দিয়েছেন যেন সব কাজে তিনি আমাকে সাহায্য করেন। তাছাড়া আপনার মেয়েকে আমি দেখেছি। এই শহরের সব কিছুই আমার জানা। কেউ আমাকে দেখতে পাবে না, এইভাবে এই শহরে আমি চারবার এসেছি এবং ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েছি। আমার বড় ছেলেও এখানে আগে এসেছে এবং আপনার মেয়েকেও দেখেছে। সুতরাং অযথা বিচলিত হবেন না।

বাইমাকোভের মনে হল সে যেন ভালুকের দ্বারা আক্রান্ত। সেই মানসিকতা থেকেই সে অনুনয়ের সুরে বলল আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে।

—হ্যাঁ অপেক্ষা করতে পারি তবে খুব বেশি দিন নয়। আমার যা বয়েস তাতে বছরের পর বছর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। আর্টামনোভের কণ্ঠে প্রত্যয় ও কাঠিন্য সমস্বরে বেজে উঠল।

জানলায় মুখ বাড়িয়ে উঠোনে দাঁড়ানো ছেলেদের উদ্দেশ করে সে চিৎকার করে বলল, তোমরা এসে গৃহস্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাও।

ওরা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর বাইমাকোভ ভীতসন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে মহাত্মাদের মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনবার ক্রুশ চিহ্ন এঁকে নিয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, হে ঈশ্বর আমাদের দয়া করো, সর্বনাশ থেকে আমাদের বাঁচাও! কী ভয়ঙ্কর লোক এরা!

মেঝেতে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বাইমাকোভ বাগানে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে তার স্ত্রী ও মেয়ে লেবু গাছের তলায় বসে জ্যাম তৈরির জন্য ফল সিদ্ধ করছিল।

তার স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী স্ত্রী জিজ্ঞেস করল. উঠোনে যে ছেলেগুলো দাঁড়িয়েছিলো ওরা কারা?

বাইমাকোভ অন্যমনাভাবে উত্তর দিল, জানি না। নাতালিয়া কোথায়?

—ভাঁড়ার ঘরে চিনি আনতে গিয়েছে।

—চিনি আনতে···বিড়বিড় করতে করতে বিষণ্ণতায় ভেঙে পড়ল বাইমাকোভ। ঘাসের ওপরেই বসে পড়ল। তারপর আপন মনেই বলতে লাগল, সবাই ঠিকই ভেবেছিল···দাসদের মুক্তি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠবে।

ওর স্ত্রী স্বামীকে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে আতঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার, তোমার কি শরীর ভালো নেই?

—কী জানি, মনটা বড় ভেঙে গিয়েছে। মনে হচ্ছে ওই লোকটা সংসারে আমার স্থানটা দখল করতে এসেছে।

ওর স্ত্রী সান্ত্বনার সুরে বলল, তুমি অযথা দুশ্চিন্তা করো না। একথা তো ঠিক অনেকেই এখন গ্রাম ছেড়ে শহরে ভীড় করছে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাইমাকোভ বলল, হ্যাঁ ওরাও তাদের দলে। আমি এখন এর বেশি কিছু বলব না, সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে তলিয়ে ভাবতে দাও।

পঞ্চম দিনে বাইমাকোভ অসুস্থ হয়ে শয্যা নিল। দ্বাদশ দিনে চোখ বুজলো চিরদিনের মতো। তার অসুস্থতার সময়ে আটামনোভ দুবার দেখা করতে এসেছিল। প্রথমবারে দুজনের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। দ্বিতীয়বার যখন আটামনোভ দেখা করতে আসে তখন বাইমাকোভ তার স্ত্রীকে ডেকে পাঠায়।

স্ত্রীকে দেখিয়ে আটামনোভকে সে বলল, তুমি ওঁর সঙ্গে কথা বলো। জাগতিক ব্যাপারের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই, আমাকে এবার শান্তিতে বিদায় নিতে দাও।

—তাহলে এসো উলিয়ানা ইভানোভনা। আদেশের সুরে কথা কটি

বলে আর্টামনোভ ঘর থেকে বেরিয়ে এল, একবার ফিরে তাকিয়েও দেখল না শ্রীমতী বাইমাকোভ তাকে অনুসরণ করছে কি না।

স্ত্রীকে ইতস্ততঃ করতে দেখে বাইমাকোভ শান্ত উদাস স্বরে পরামর্শের ভঙ্গিতে বলল, যাও, উলিয়ানা, এই-ই বোধহয় আমাদের অদৃষ্টের অমোঘ বিধান।

উলিয়ানা বুদ্ধিমতী, চারিত্রিক দৃঢ়তাও যথেষ্ট। কোনো কাজই ভাবনা চিন্তা না করে করে না। সেও কিন্তু ঘন্টাখানেক পরে ফিরে এসে অশ্রুসজল চোখে স্বামীকে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ, এ আমাদের অদৃষ্টের লিখন। তুমি আমাদের মেয়েকে আশীর্বাদ করো।

সেদিন বিকেলে উলিয়ানা মেয়েকে ভালো জামাকাপড়ে সাজিয়ে স্বামীর শয্যার পার্শ্বে নিয়ে এল। আর্টামনোভ ছেলেকে ঠেলে এগিয়ে দিল। পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় পর্যন্ত না করে ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের হাত ধরলো। তারা নতমস্তকে নতজানু হয়ে বসলো। বাইমাকোভ তখন কষ্ট করে শ্বাস নিচ্ছে সেই অবস্থাতেই কম্পিত হস্তে সে রত্নখচিত পারিবারিক দেবমূর্তি ওদের মাথায় ছুঁইয়ে বলল, হে ঈশ্বর আমার একমাত্র সন্তানকে কখনো পরিত্যাগ করো না। তারপর আর্টামনোভকে কঠিন স্বরে বলল, মনে রেখো আমার সন্তানের ভালোমন্দের জন্যে ঈশ্বরের কাছে তুমি দায়ী থাকবে।

—আমি জানি। এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে সে মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, যাও। ভাবী পুত্রবধূকে একটিও স্নেহসূচক কথা সে বলল না, এমন কি পুত্র ও পুত্রবধূর দিকে একবার তাকিয়েও দেখল না। বাগ্‌বন্ধ দম্পতি চলে যেতেই আর্টামনোভ বাইমাকোভের বিছানায় এসে বসলো।

—আপনি কিছু ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। সাঁইত্রিশ বছর আমি রাজার অধীনে কাজ করেছি। মানুষ তো আর ভগবান নয়, তিনিও তা ছিলেন না, তাঁকে সন্তুষ্ট করা বেশ কঠিন কাজ ছিল, এসব সত্ত্বেও একবারের জন্যেও আমাকে শাস্তি পেতে হয়নি। আর উলিয়ানা, আপনাকেও বলি আপনি সসম্মানেই থাকবেন। আমার ছেলেদের আপনি হবেন মা। তাদেরও আমি নির্দেশ দেব যেন তারা আপনাকে সব সময় শ্রদ্ধা করে চলে।

বাইমাকোভের দু চোখ দিয়ে তখন অশ্রু ঝরছে, তার দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ঘরের এক কোণে রাখা দেবমূর্তির দিকে। উলিয়ানাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কাঁদছে। আর্টামনোভ তার বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, দেখুন যেভসী মিট্রিচ, আপনি শরীরের প্রতি যত্ন নেননি তাই সময়ের আগেই আপনাকে চলে যেতে হচ্ছে। আপনাকে কিন্তু আমার খুবই প্রয়োজন ছিল।

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সে সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আপনার সব খবরই আমি রাখি। আপনি সম্মানিত ব্যক্তি এবং যথেষ্ট বুদ্ধি ধরেন। আপনাকে আরো বছর পাঁচেক আমার প্রয়োজন ছিল। দুজনে মিলে আমরা ব্যবসাকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম। কী আর করা যাবে, সবই তাঁর ইচ্ছে।

উলিয়ানা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। সেই অবস্থাতেই সে ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, এখন থেকেই দাঁড়কাকের মতো মড়াকান্না শুরু করে দিয়েছ কেন, বুড়ো লোভী কোথাকার। এখনো হয়তো কিছু…!

উলিয়ানার কটূক্তিকে আর্টামনোভ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলো না। সে উঠে দাঁড়ালো এবং কোমর পর্যন্ত ঝুঁকে এমন ভাবে মাথা নিচু করলো যেন বাইমাকোভ শব ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর সে উলিয়ানার দিকে ফিরে বলল, আমার ওপর আস্থা রাখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি এখন চলি। আমাকে এখন যেতে হবে ওকা নদীর পাড়ে। বজরায় আমার সব জিনিসপত্র এসে গিয়েছে।

উলিয়ানা লোকটির ব্যবহারে মনে এতই আঘাত পেয়েছে যে আর্টামনোভ বেরিয়ে যেতেই সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

—গাঁইয়া চাষা কোথাকার! ভাবী পুত্রবধূকে বলার মতো একটা মিষ্টি কথাও লোকটার মুখে এল না।

বাইমাকোভ স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমাকে আর শঙ্কিত করে তুলো না। কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে সে আবার বলল, এই লোকটিকে আশ্রয় করে থেকো কারণ আমি বুঝতে পারছি ও আমাদের সকলের চাইতে বড় মাপের মানুষ।

যথেষ্ট সমারোহ এবং সম্মানের সঙ্গে বাইমাকোভের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। এখানকার পাঁচটি গির্জারই যাজকেরা অংশগ্রহণ করল। মৃতের স্ত্রী ও কন্যার ঠিক পিছনেই আর্টামনোভ ও তার ছেলেরা কফিনের অনুসরণ করছিল। স্থানীয় লোকেরা এটাকে ভালো মনে নিতে পারল না। সেই কুঁজো ছেলেটি যার নাম নিকিতা সে কয়েকজনের ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল: কেউ-ই লোকটার পরিচয় জানে না অথচ ছাখো শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

পমিয়ালোভকে বলতে শোনা গেল, যেভসী এবং উলিয়ানা দুজনেই খুব সাবধানী, আবেগের বশে এরা কখনো কোনো কাজ করে না। সুতরাং এই লোকটি যে এত গুরুত্ব পাচ্ছে তার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো গূঢ় কারণ আছে। নিশ্চয়ই লোকটি এদের কোনো প্রলোভন দেখিয়েছে নইলে সহজে এরা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হতো না। আমার তো মনে হয় দুর্নীতির কারবার। হ্যাঁ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে নীতিবিরুদ্ধ কোনো ব্যবসা এর সঙ্গে জড়িত। হতে পারে বিদেশী মুদ্রাসংক্রান্ত কিছু। আমাদের বাই-মাকোভ কিন্তু সৎ মানুষ ছিল, তাই না?

কথাগুলো শুনতে শুনতে নিকিতার মনে হচ্ছিল এক্ষুণি বুঝি তার কুঁজের ওপর কারো ঘুঁষি এসে পড়বে।

দশদিন পরে উলিয়ানা মেয়েকে নিয়ে একটি মঠে আশ্রয় নিল। যাবার সময়ে আর্টামনোভদের নিজেদের বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে গেল।

স্থানীয় লোকেরা লক্ষ্য করল আর্টামনোভ ও তার ছেলেরা প্রচণ্ড কাজের ঘূর্ণির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। ভোর থেকে শুরু করে অনেক রাত পর্যন্ত এদের কর্মব্যস্ততা। কখনো দ্রুত পায়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, কখনো গির্জার সামনে দিয়ে যেতে যেতে ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়িয়ে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে নিয়ে আবার গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে। বাপ হচ্ছে উগ্র প্রকৃতির, সব সময় হাঁকডাক করে মহল্লা মাতিয়ে রাখে। বড় ছেলে চুপচাপ, মনমরা। মনে হয় ভয়ে কিংবা লজ্জায় যেন মিয়নো। প্রাণবন্ত আলেক্সির ছেলেদের সাথে খিটিমিটি লাগলেও মেয়েদের সম্পর্কে বেশ আগ্রহী, সুযোগ পেলেই আড়-চোখে তাকিয়ে দেখে; আর নিকিতা। যে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে, নদী পার হয়ে 'বাকুর ভিভ'-এ গিয়ে উপস্থিত হয়। ছুতোর আর রাজমিস্ত্রীরা এখানে ইটের ব্যারাক তৈরি করে বাস করছে। ওকা নদীর তীরে ওরা দু ফুট চওড়া মোটা কাঠের মস্ত এক দোতলা বাড়ি তৈরি করছে। বাড়িটা দেখতে ঠিক জেলখানার মতো। বিকেলের দিকে ড্রায়ামোভের লোকেরা তরমুজ খেতে খেতে অথবা সূর্যমুখী ফুলের বিচি চিবোতে চিবোতে বাতারাকশার ধারে এসে বসতো। করাতের খস খস্, র‍্যাঁদার ঘষ্ ঘষ্ আর ধারালো কুড়ুলের ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্ শব্দ শুনতে শুনতে ওরা বিদ্রূপ করে বলতো, হায় রে এ মূর্খের প্রাসাদ টিকবে কদিন?

পমিয়ালোভ তো সব সময় নবাগতদের সম্পর্কে মুখরোচক ভবিষ্যদ্বাণী করে যেত। যেমন বন্যায় উৎকট বাড়িগুলো ভেসে যাবে কিংবা চারদি

ছড়ানো কাঠের চুকলির ওপর ছুতোরদের তামাকের ফুলকি পড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ইত্যাদি। আরেকজন পুরোহিত বলল, এসব হচ্ছে বালির বাঁধ। তা ছাড়া ফ্যাক্টরীর কুলিকামারিরা এলেই মাতলামি, চুরি আর ব্যভিচারের একশেষ হবে।

চবির তাল হোটেলওয়ালা লুকা বাগ্নি তার হেঁড়ে গলায় এদের সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, লোক বাড়লে তো ভালোই, খাওয়ানোর সুবিধে হবে। করুক না ওরা কাজ।

শহরের লোকেরা নিকিতাকে দেখে খুব মজা পেত। চৌকোণো একটা জায়গা থেকে গোড়াসুদ্ধ উইলো ঝাড়গুলো কেটে ফেলে সারাটা দিন সে ভাটারাস্কা থেকে পাঁক তুলে তার ওপর ঢালতো, তারপর ঘাসের চাপড়া কেটে ঠেলা গাড়িতে করে বয়ে নিয়ে ঢালতো বেলে মাটির ওপর।

লোকেরা বিদ্রূপ করে বলতো, লোকটা কী বোকা দ্যাখো। সব্জীর বাগান তৈরি করবে বালির ওপর। বালিতে সার ধরানো যায় নাকি?

সূর্যাস্তের সময়ে বাপের পিছনে পিছনে ছেলেরা যখন নদী পার হতো তখন সবুজাভ জলে তাদের ছায়া দেখে পমিয়ালোভ সব্বাইকে ডেকে বলতো, দ্যাখো দ্যাখো কুঁজওয়ালা লোকটার ছায়াটা কী মজার। অন্যেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো সত্যিই কুঁজের ছায়াটা কেমন অদ্ভুতভাবে কাঁপছে।

একদিন প্রচুর বৃষ্টিপাতের পর নদীর জল ফেঁপে উঠল, সেদিন হঠাৎ নিকিতার পা আটকে গেল শেকড়-বাকড়ে। পা ছাড়াতে গিয়ে সে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে হঠাৎ জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে তীরে দাঁড়ানো লোকগুলো মজা পেয়ে হাসিতে ফেটে পড়লো। শুধু একটি তের বছরের মেয়ে দুঃখে অভিভূত হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, আহা, লোকটা ডুবে গেল যে। একজন তার মাথায় গাঁট্টা মেরে ধমক দিয়ে বলল, আজে-বাজে ব্যাপার নিয়ে চেঁচাবি না আর কোনোদিন।

আলেক্সি ঝাঁপ দিয়ে নিকিতাকে ধরে ফেললো তারপর তাকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। ভিজে জবজবে, কাদায় মাখামাখি হয়ে দুজনে যখন জনতার সামনে এসে দাঁড়ালো তখন তারা বাধ্য হয়ে এদের পথ করে দিল। একজন ত্রস্ত হয়ে নাক কুঁচকে বলল, নোংরা জানোয়ার কোথাকার।

বড় ছেলে পিওতর বাপকে শুনিয়ে বলল, এখানকার লোকেরা আমাদের দেখতে পারে না।

বাপ গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করল, ওদের সময় দিতে হবে। তারপর নিকিতার

দিকে ফিরে ধমকের সুরে বলল, দেখে শুনে চলতে পারো না নির্বোধ কোথাকার ? এভাবে আর কখনো লোক হাসাবে না। লোকে আমাদের দেখে টিটকিরি দেবে, এভাবে চললে আমরা এখানে টিকতে পারবো না, বুঝলে গোবরগণেশ।

এইভাবেই চলছিল। কারো সঙ্গে আর্টামনোভদের বন্ধুত্ব হল না। এদের সম্পর্কে স্থানীয় লোকেরা খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করতো ওদের পাচিকা মারফৎ। মোটা এই বুড়ি কথা কম বলতো এবং যেটুকু বলতো তাও বিদেশীর মতো অস্পষ্ট। তবু এর কাছ থেকে যতটুকু খবর সংগ্রহ করা গিয়েছিল তা এই রকম ঃ

বাপ (ইলিয়া আর্টামনোভ) ও বড় ছেলে প্রায়ই চারপাশের গ্রামে ঘুরে ঘুরে চাষীদের শণ বুনতে উৎসাহিত করে আসে। একদিন বাড়ি ফেরার পথে কয়েকজন পলাতক সৈনিক ইলিয়াকে আক্রমণ করে। দু পাউণ্ড ওজনের একটি লোহার ডাণ্ডা ঝোলানো ছিল তার চামড়ার ব্যাগের সঙ্গে। তাই দিয়ে সে একজনকে সঙ্গে সঙ্গেই খতম করে দেয়, আরেকজনের মাথা ছাড় ফাটিয়ে আর তৃতীয়জন পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। পুলিসের ক্যাপ্টেন তার কাজের তারিফ করলেও ইলিন্স্কির তরুণ যাজক তাকে নরহত্যার পাপস্খলনের জন্যে চল্লিশ রাত্তির গির্জায় প্রার্থনা করার আদেশ দিল।

একদিন শরতের সন্ধ্যায় নিকিতা বাপ ও ভাইদের সাধুসন্তদের জীবন ও তাদের উপদেশাবলী পড়ে শোনাচ্ছিল। ইলিয়া ছেলেকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, এসব হচ্ছে উচ্চমার্গের জ্ঞানের কথা, আমাদের মতো মানুষদের পক্ষে ওই পর্যায়ে ওঠা সম্ভব নয়। আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের কাজ করে খেতে হয়। আমাদের পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে সহজ কাজ করার জন্যে, আমাদের চিন্তাধারাও সেইভাবেই গঠিত। স্বর্গত যুবরাজ য়ুরী প্রচুর পড়াশোনা করতেন। পড়ে পড়ে তাঁর এমনই অবস্থা হয়েছিল যে তিনি ঈশ্বরের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন, সর্বত্রই রাজদরবারে সম্মানিত হয়েছেন, দেশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁর খ্যাতি অনেকদূর গিয়েছিল। এ হেন মানুষ যখন কাপড়ের কল খুললেন তা চলল না। শুধু কাপড়ের কল কেন, যে কাজে তিনি হাত দিয়েছেন সেই কাজেই ব্যর্থ হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত কৃষকদের দেওয়া রুটি খেয়েই তিনি জীবন কাটিয়ে গেলেন।

কথা বলার সময় ইলিয়া আর্টামনোভ খুব স্পষ্ট করে উচ্চারণ করছিল এবং কথার ধ্বনিগুলো নিজেও মন দিয়ে শুনছিল। কিছুক্ষণ বিরতির পর

সে আবার বক্তৃতা শুরু করে :

'তোমাদের জীবন আরো কঠিন কারণ এখন তোমরা স্বাধীন, নিজেরাই নিজেদের রক্ষাকর্তা। তোমরা তো জানো আমি নিজের খুশিমতো জীবন যাপন করতে পারিনি। হুকুম মাফিক কাজ করে গেছি। অন্যায় দেখলেও প্রতিকার করার সাধ্য আমার ছিল না কারণ কাজটা হচ্ছে মনিবের। শুধু যে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করতে ভয় পেতাম তাই-ই নয়, এক-এক সময় মনিবের চিন্তাধারার সঙ্গে নিজের ধ্যানধারণা গুলিয়েও ফেলতাম। পিওতর তুমি মন দিয়ে শুনছো তো ?

—হ্যাঁ শুনছি।

—হ্যাঁ আমার কথা বোঝার চেষ্টা কর। শুধু বেঁচে থাকা আর বাঁচার মতো বাঁচার মধ্যে তফাৎ আছে। পরের ইচ্ছায় বেঁচে থাকা যায় তাতে কোনো দায়িত্ব থাকে না। যার কোন দায়িত্ব নেই তার জীবন খুবই সহজ সন্দেহ নেই কিন্তু এ জীবন অর্থহীন।

কখনো কখনো ইলিয়া ছেলেদের কাছে ঘন্টার পর ঘন্টা এইভাবে উপদেশ দিয়ে যেত আর মাঝেমাঝেই প্রশ্ন করতো তোমরা শুনছো তো ? উনুনের ধারে বসে পা দোলাতে দোলাতে সে নিজের দাড়ির জট ছাড়াতে থাকে আর কথার জাল বুনতে থাকে।

তোমরা জানো মহামান্য জার আমাদের মুক্তি দিয়েছেন কিন্তু কেন দিয়েছেন তা তোমাদের বোঝা দরকার। যথেষ্ট কারণ না থাকলে আমরা মাঠ থেকে একটা ভেড়াকেও ছেড়ে দিই না আর এক্ষেত্রে একটি নয় দুটি নয় হাজার হাজার মানুষকে মুক্তি দেওয়া। কারণ একটাই অর্থাৎ সম্রাট বুঝেছিলেন যে আমাদের মনিবদের কাছ থেকে আর কিছুই পাওয়া যাবে না, লাভের সবটাই তারা আত্মসাৎ করে ফেলে। দাস-মুক্তির অনেক আগেই রাজা গগি আমাকে বলেছিলেন, দাস-শ্রমিক ব্যবস্থায় এখন আর লাভ নেই। এখন দেখ নিজের ইচ্ছামতো শ্রমের ওপর মানুষের কত আস্থা। এখন আর সৈন্যদেরও একটানা পঁচিশ বছর চাকরি করতে হয় না। তারাও যুদ্ধবৃত্তি ছেড়ে অন্য কাজ করতে পারে। কে কত কাজ করতে পারে এখন যেন সেটাই দেখাবার পালা। রাজা-রাজড়াদের দিন চলে গিয়েছে, এখন আমরা সবাই রাজা নিজের নিজের রাজত্বে। তোমরা শুনছো তো ?

প্রায় তিন মাস মঠে কাটিয়ে উলিয়ানা মেয়ে নিয়ে ফিরে এল। সেই দিনই ইলিয়া ছেলের বিয়ের কথা তুললো। এবার তাহলে বিয়ের বন্দোবস্ত

করে ফেলি ?

উলিয়ানা দপ করে জ্বলে উঠলো। রাগে তার চোখ দুটি লাল হয়ে উঠল।

—একবার চিন্তা করে দেখুন তো আপনি কি বলছেন ? নাতালিয়ার বাবা মারা গেছেন ছ মাসও হয়নি আর আপনি কিনা···জানেন না এ কত বড় পাপ ?

—এতে পাপ-পুণ্যের কী আছে আমি বুঝতে পারছি না। ভদ্দরলোকেরা অনেক খারাপ কাজ করে থাকে এবং ভগবানও তা মেনে নেন। মোদ্দা কথা হচ্ছে নাতালিয়াকে আমার প্রয়োজন আর পিওতরের প্রয়োজন একজন গৃহিণীর। এখন বলুন আপনার কাছে টাকাপয়সা কি আছে ?

—পাঁচশোর বেশি আমি যৌতুক দিতে পারবো না।

—হ্যাঁ পাঁচশো তো দেবেনই, তার চেয়েও বেশি দেবেন।

টেবিলের দু দিকে দুজন মুখোমুখি বসেছিল। ইলিয়া টেবিলের ওপর কনুই দুটি রেখে তার চাপ দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে কথা বলছিল। আর উলিয়ানা বসেছিল ঋজুভাবে, বিরক্তিতে তার ভ্রূ কুঞ্চিত। বয়স তিরিশের বেশি হলেও দেখতে তাকে অনেক ছোট দেখায়। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ আর রক্তিম গাল থেকে আজ যেন লাবণ্যের স্নিগ্ধ দীপ্তি ছড়াচ্ছে।

ইলিয়া চেয়ার ছেড়ে উঠে টান টান হয়ে দাঁড়াল।

—উলিয়ানা ইভানোভনা আপনি অত্যন্ত সুন্দরী।

—আপনার আর কিছু বলার আছে? উলিয়ানার কণ্ঠস্বরে রাগ ও বিরক্তির ঝাঁঝ।

—না, আমার আর কিছু বলার নেই।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা দুটো টানতে টানতে ইলিয়া চলে গেল। উলিয়ানা তার দিকে তাকিয়ে রইল। সামনের আয়নায় এক পলকে নিজেকে দেখে নিয়ে মনের খেদে স্বগতোক্তি করল।

দাড়িওলা শয়তান! কী দরকার ছিল আমাদের ব্যাপারে ওর মাথা গলাবার ?

বিপদের গন্ধ পেয়ে উলিয়ানা কেমন যেন অস্থিরতা অনুভব করল। তাড়াতাড়ি সে মেয়ের খোঁজ করতে উঠে পড়ল। ওপরে উঠে নাতালিয়াকে দেখতে পেল না। তখন জানলা দিয়ে মুখ বাড়াতেই দেখতে পেল নাতালিয়া উঠোনে দাঁড়িয়ে আর তারই পাশে দাঁড়িয়ে পিওতর। তাড়াতাড়ি

নিচে নেমে এসে দরজার কাছ থেকে চিৎকার করে ডাকলো, নাতালিয়া ঘরে এসো।

পিওতর উলিয়ানাকে অভিবাদন জানাল।

—কোনো সুন্দর যুবকের উচিত নয় মায়ের অনুপস্থিতিতে এভাবে যুবতী মেয়ের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলা। এ জিনিস যেন ভবিষ্যতে না ঘটে।

পিওতর শান্তভাবে জবাব দিল, কিন্তু নাতালিয়া তো বাগদত্তা।

—তাতে কিছু যায় আসে না। এটাই আমাদের প্রথা। মুখে এ কথা বললেও উলিয়ানার মনে প্রশ্ন জাগে তার হঠাৎ কেন এত রাগ হলো। প্রেম করা তো তরুণ বয়সেরই ধর্ম। এ কী তবে ঈর্ষাকাতরতা? তাও নিজের মেয়ের ওপর। তবু কিন্তু তার রাগ পড়ল না। মেয়ের বিনুনি ধরে টেনে নিয়ে ঘরে এসে বলল, এভাবে ওর সঙ্গে আর কখনো একা একা কথা বলবে না। বিয়ে হবে তো হবে, যখন হবে তখন···মাঝে কত কী ঘটে যেতে পারে। কে বলতে পারে?

উলিয়ানার মনের অস্থিরতা যায় না। কী একটা অজানা আশঙ্কা তার মন কুরে কুরে খায়। কয়েকদিন পরেই সে ভাগ্য গোনাতে গেল বুড়ি এর্দানস্কায়ার কাছে। মহিলার থুতনি ঝুলে পড়েছে। এতই মোটা যে দেখে মনে হয় যেন একটা ঘন্টা। সে যাই হোক শহরের সব মহিলারাই বিপদে পড়লে তার কাছে ছুটে আসে তাদের ভবিষ্যত জানতে।

বুড়ি বলল, দেখ উলিয়ানা তোমার কথা বলতে আমাকে কোনো কসরত করতে হবে না। খোলা মনে তোমাকে আমি একটা কথা স্পষ্ট করে জানাই, —ওই লোকটিকে আশ্রয় কর। কপালের নিচে আমার যে দুটি চোখ আছে তা শুধুই দেখার জন্যে নয়। ওই দিয়ে আমি লোক চিনি। যেমন করে আমি তাস ভাঁজি তেমনি ও দুটি চোখ দিয়ে আমি মানুষ নেড়েচেড়ে দেখি। দেখছো না লোকটি একটি সফল মানুষ। যাতে হাত দেয় তাই-ই সোনা হয়ে ওঠে। এখানকার লোকেরা হিংসুটে তাই ওকে দেখতে পারে না। না ভাই, তোমাকে বলছি ওকে ভয় পাবার কিছু নেই। ও খেঁকশিয়াল নয়, ভালুক।

উলিয়ানাকে স্বীকার করতেই হলো, হ্যাঁ লোকটি ভালুকই। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বুড়ির কাছে স্বীকারোক্তি করল। হ্যাঁ ওকে আমি সত্যিই ভয় পাই। সেই যখন সে তার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের সম্বন্ধের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল তখন থেকেই। মনে হয়েছিল আকাশ থেকে বুঝি এক আগন্তুক টুপ করে খসে পড়ল আর সে এসেই জোর করে আমাকে সম্পর্কে গেঁথে

ফেলল। এরকম ঘটনা কি সচরাচর ঘটে? মনে পড়ছে সে দিনের কথা। তার সেই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার মুখের ওপর রেখে সে যখন কথা বলে যাচ্ছিল তখন তার প্রতিটি কথার উত্তরে আমি 'হ্যাঁ' বলতে বাধ্য হচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল সে যেন টুঁটি চেপে ধরে আমার ভিতর থেকে কথা টেনে বের করে নিচ্ছে।

—এতেই প্রমাণ হয় নিজের শক্তির ওপর ওর অগাধ আস্থা। বুড়ি মন্তব্য করল।

বুড়ির কথায় উলিয়ানার মন কিন্তু শান্ত হল না। বরং বুড়ির বাড়ির নানারকম বনৌষধির উগ্র গন্ধে তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

চলে আসার সময় বুড়ি তাকে বলল, মনে রেখো রূপকথার গল্পেই শুধু বোকারা সফল।

ইলিয়া সম্পর্কে বুড়ির এমন একতরফা প্রশংসায় উলিয়ানার সন্দেহ হয় কী জানি বুড়ি ঘুষ খায়নি তো। নোনা মাছের মতো শুকনো মাত্রিয়োনা কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলল।

গোটা শহরের মানুষ তোমার জন্যে দুঃখ করছে উলিয়ানা। ভাবতে ভয় লাগে তুমি এদের দেখে ভয় পাচ্ছ না। ওই যে একটি ছেলের পিঠে মস্ত কুঁজ, তুমি কি ভাবো এর কোনো মানে নেই। ওর বাপ-মা নিশ্চয়ই এমন কোনো পাপ কাজ করেছিল যে কারণে ছেলেটি বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়।

এইসব মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া হয় উলিয়ানার মনে। যখন-তখন সে মেয়ের গায়ে হাত তোলে যদিও সে ভালোরকমই জানে যে মেয়ের কোনো দোষ নেই।

একসময় শহরের ওপর নিঃশব্দে শীত নেমে এল। শুভ্র তুষারপাতে গোটা শহর ঢাকা পড়ে যায়। চিনির স্তূপের মতো তুষার জমে গির্জায়, বাড়ির ছাদে। নদীর জল বাঁধা পড়ে তুষারের শুভ্র বেড়িতে। জমে যাওয়া ওকা নদীর তীরে এই সময় শুরু হয়ে যায় মুষ্টিযুদ্ধের খেলা। ছুটির দিনে আলেক্সি লড়তে যায় কিন্তু রোজই হেরে বাড়ি ফেরে।

ইলিয়া একদিন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার আলেক্সি?

এখানকার মুষ্টিযোদ্ধারা মনে হয় আমাদের চাইতে চতুর।

আলেক্সি একটি তামার পয়সা কিংবা বরফের টুকরো দিয়ে শরীরের ক্ষত-স্থানগুলো ঘষতে থাকে কিন্তু মুখে সে কিছু বলে না শুধু তার বাজপাখির [illegible]

পিওতর বলল, আলেক্সি কিন্তু ভালোই লড়ে কিন্তু ওর প্রতিপক্ষের দলের লোকেরা ওকে জোর করে হারিয়ে দেয়।

ইলিয়া হাত দুটো মুঠো করে কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল, কেন ?

পিওতর বলল, ওরা ওকে পছন্দ করে না।

—শুধু ওকেই ?

—না, আমাদের সকলকেই।

হঠাৎই টেবিলের ওপর প্রচণ্ড ঘুষির শব্দ হল। ইলিয়ার ঘুষির এতই জোর যে বাতিদান থেকে মোমবাতি ছিটকে নিচে পড়ে যায়। অন্ধকারে শোনা যায় তার ক্রুদ্ধ গর্জন।

—সব সময় তুমি আমাকে কেবল ভালবাসার কথা শোনাও কেন ? তুমি কী বেশ্যা ? এ জাতীয় কথা আমি যেন আর দ্বিতীয়বার না শুনি।

নিকিতা বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে বলল, আলেক্সির ওদের সঙ্গে লড়তে না যাওয়াই ভালো।

আবার সেই ক্রুদ্ধ গর্জন। তার মানে ওরা ভাববে আর্টামনোভ ভয়ে পালিয়ে গেল। বিদ্রূপের হাসি হাসবে ওরা। চুপ করে থাক্ ক্লীব, নপুংসক কোথাকার !

কয়েকদিন পরে খাবার টেবিলে ইলিয়া নরম-গরম কণ্ঠস্বরে ছেলেদের বলল, তোমরা ভালুক শিকারে যেতে পার। অত্যন্ত উত্তেজনাকর খেলা ওটা, আমি যুবরাজ জর্জির সঙ্গে রিয়াজানের অরণ্যে যেতাম শিকার করতে এবং বর্শা দিয়ে ভালুক শিকার করতাম। কী দারুণ মজা পাওয়া যেত।

সপ্তাহখানেক পরে একদিন বাপের সঙ্গে অরণ্যে গিয়ে পিওতর ও আলেক্সি বিশাল এক বৃদ্ধ পুরুষ ভালুক হত্যা করে। উৎসাহিত হয়ে দুই ভাই বাপের সাহায্য ছাড়াই অরণ্যের আরো গভীরে চলে যায়। সেখানে তারা একটি স্ত্রী-ভালুককে জাগিয়ে তুলতেই সে আলেক্সির ফার কোট ছিঁড়ে দেয় এবং হাঁটু খামচে দেয়। যাই হোক শেষ পর্যন্ত তারা সফল হয় এবং তাকে মেরে ফেলে। শাবক দুটিকে তারা শহরে নিয়ে আসে কিন্তু মৃত ভালুকটিকে শিয়ালদের বনভোজনের জন্যে অরণ্যে ফেলে রেখে আসে।

এদিকে শহরের লোকেরা দেখা হলেই উলিয়ানাকে প্রশ্ন করে, কি গো তোমার আর্টামনোভ বন্ধুরা কেমন আছে ? উলিয়ানাও চটপট জবাব দেয়, তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই, তারা ভালোই আছে।

পমিয়ালোভ মন্তব্য করে, হ্যাঁ শীতকালে বুনো শুয়োরও পোষ মানে।

নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর উলিয়ানার আস্থা না থাকলেও কিছুদিন

ধরেই সে লক্ষ্য করছে আর্টামনোভদের সম্পর্কে বিদ্বেষভাব পোষণ করতে করতে সে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বিদ্বেষ পোষণ করার ব্যাপারে তার বিতৃষ্ণাই এসে গেছে বলা যেতে পারে। তার যেন চোখের দৃষ্টিই পাল্টে গেছে। এখন তার মনে হয় ওদের স্বভাব ধীর স্থির, বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব, নিজেদের কাজ নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকে, অন্যের ব্যাপারে মোটেই মাথা গলায় না। বদ খেয়ালও কিছু নেই।

নিজের মেয়ের সঙ্গে পিওতরের আচরণের ওপর কড়া নজর রাখতে রাখতে ছেলেটি সম্পর্কে তার সুদৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে সে অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ও বয়সের তুলনায় অত্যন্ত গুরুগম্ভীর। নাতালিয়াকে অন্ধকার কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে চুমু খাওয়া কিংবা এখানে-সেখানে হাত চালানো. অশ্লীল কথাবার্তা যা এখানকার তরুণদের ধর্ম পিওতরের আচরণে সে সব কিছু নেই। তবু একজন তরুণের এতটা শীতলতা দেখে উলিয়ানা আশঙ্কিত হয়। একদিকে ভাবী স্ত্রীর প্রতি তার ঔদাসীন্য অন্যদিকে তাকে আগলে রাখার প্রবণতাও কিছুটা জেলাসি উলিয়ানাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। সে মনে মনে ভাবে, ও কখনই সহৃদয় স্বামী হতে পারে না।

একদিন সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সে নিচের হলঘর থেকে ভেসে আসা মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

—তুমি কি আবার ভালুক শিকারে যাবে?

—হ্যাঁ যাবো তো আশা করছি। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?

—বিপদজনক কাজ, তাই জানতে চাইছিলাম। আলেক্সিকে তো খামচে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে।

—দোষটা তো আলেক্সিরই! ও বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তোমার কি আমার সম্পর্কে দুশ্চিন্তা হচ্ছে?

—তোমার কথা তো আমি কিছু বলিনি।

মায়ের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। মনে মনে সে বলল, কী মোটা মাথা ছেলেটার!

এদিকে ইলিয়া আর্টামনোভ প্রায়ই তাগাদা দেয় বিয়ের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করে ফেলতে, নয়তো তাকেই এগিয়ে আসতে হবে।

আর দেরি করা যে উচিত নয় সে কথা উলিয়ানাও বোঝে কারণ সে লক্ষ্য করেছে মেয়ের রাত্তিরে ভালো ঘুম হয় না। কামনা-বাসনার উদগ্রতাও সে আর চেপে রাখতে পারে না। ইস্টারের সময়ে উলিয়ানা আবার মেয়েকে

নিয়ে মঠে চলে গেল। মাসখানেক পরে ফিরে এসে দেখে তার বাগানের চেহারাই পাল্টে গিয়েছে। অবহেলায় যা আগাছায় ভরে গিয়েছিল সেই বাগান এখন কী সুদৃশ্যই না হয়ে উঠেছে। আগাছা ফেলে দেওয়া হয়েছে, পরগাছা ছাড়িয়ে ফেলা হয়েছে। বেড়া দেওয়া হয়েছে সুন্দর করে। সুদক্ষ হাতের ছাপ সর্বত্র। নদীর পথে যাবার সময়ে তার চোখে পড়ল কর্মরত নিকিতাকে। বন্যায় ভেঙে যাওয়া বেড়ার একটা জায়গা সে সারাচ্ছে। কুঁজের হাড় তার এমন উঁচিয়ে উঠেছে যে মাথাটা দেখাই যায় না। তার সুশ্রী চুলগুলো পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যায়। দেখলে করুণা জাগে মনে। চুলগুলো পাছে মুখের ওপর এসে পড়ে তাই বার্চগাছের কচি ছাল দিয়ে চুল বেঁধে রেখেছে। সবুজ পত্রপুঞ্জের মধ্যে নিষ্কাম কর্মযজ্ঞে নিবেদিতপ্রাণ নিকিতাকে মনে হচ্ছে এক বৃদ্ধ সাধুপুরুষ। কাজ করতে করতে মেয়েলি গলায় সে গাইছে গুনগুন করে ভক্তিমূলক গান।

'ঈশ্বর তোমার ভালো করুন'—উলিয়ানার কণ্ঠ থেকে স্বতোৎসারিত হয়ে উচ্চারিত হলো। সে নিজেও বিস্মিত হলো এতে।

গাঢ় গভীর নীল চোখের কোমল দৃষ্টি মেলে ধরে নিকিতা উলিয়ানাকে দেখল। তারপর স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, ঈশ্বর আপনার ভালো করুন।'

এই বাগান কি তুমি করেছ?

হ্যাঁ।

সুন্দর হয়েছে, তুমি বুঝি বাগান ভালোবাসো?

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসতে বসতে সে বলল, ন বছর বয়সে আমাকে রাজার মালীর সহকারী করে দেওয়া হয়েছিল, আর এখন আমার বয়েস উনিশ।

'দেখতে কুশ্রী হলেও স্বভাবটি মধুর,' উলিয়ানা মনে মনে বললে। সেদিন সন্ধ্যায় ওপরের ঘরে বসে উলিয়ানা মেয়ের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিল। ফুলের তোড়া হাতে নিকিতাকে তখন দরজার সামনে দেখা গেল। অতি সাধারণ পাণ্ডুর বিষণ্ণ মুখে এক ঝলক হাসি ফুটে উঠল। উলিয়ানার কাছে এগিয়ে বিনম্র ভঙ্গিতে সে বলল, দয়া করে এই তোড়াটা গ্রহণ করুন।

সুন্দর সবুজ ঘাস দিয়ে বাঁধা মনোরম ফুলগুলো লক্ষ্য করতে করতে উলিয়ানা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, এর মানে কী?

নিকিতা বলল, দেখুন যখন আমি রাজার বাগানে কাজ করতাম তখন আমার প্রতিদিনের কাজ ছিল রাজকুমারীকে ফুলের তোড়া উপহার দেওয়া।

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল উলিয়ানা। গর্বিত ভঙ্গিতে ঘাড় তুলে সে প্রশ্ন করল, বুঝলাম, কিন্তু আমি কি তোমার রাজকুমারীর মতো রূপসী ?

আপনিও কম রূপসী নন এবং আপনি নিজেও তা জানেন।

উলিয়ানার গাল আরো রক্তিম হয়ে উঠল। মনে মনে সে ভাবলে এসব কথা কি ওর বাপ ওকে শিখিয়ে দিয়েছে। যাই হোক নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, উপহারের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু নিকিতাকে সে চা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালো না। নিকিতা চলে যেতে সে মেয়েকে শুনিয়ে বলল, ছেলেটির চোখ দুটি বড় সুন্দর, বাপের মতো নয়। হয়তো মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, বুঝতে পারছি ওদের সঙ্গেই আমাদের থাকতে হবে। এটাই আমাদের নিয়তি।

আগামী শরতে তার স্বামীর মৃত্যুর পর এক বছর পূর্ণ হবে। তারপর মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন হলেই সে খুশি। কিন্তু এই নিয়ে ইলিয়াকে অনুনয় বিনয় না করে দৃঢ় সংকল্প নিয়েই সে তাকে বলল, বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিতে হবে এই ধারণাটা ছেড়ে দিয়ে আপনি যদি আমাদের পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী সব বন্দোবস্ত পাকা করার সময় দেন তাহলে যেমন আমাদের তেমনি আপনাদেরও উপকার হবে। সমাজের বনেদী লোকেরা তখন আপনাকে সাদরে গ্রহণ করবে, আপনাদের সম্পর্কে আগ্রহশীল হয়ে উঠবে।

ইলিয়া গর্বিত ভঙ্গিতে বলল, তারা তো আমার যথেষ্টই প্রচার করেছে।

ইলিয়ার ঔদ্ধত্যে ক্ষুণ্ণ হয়ে উলিয়ানা বলল, তারা কেউই আপনাদের পছন্দ করে না।

কাঁধের ঝাঁকুনি দিয়ে বাঁকা হাসি হেসে ইলিয়া বলল, পিওতরও সব সময় ঘ্যান ঘ্যান করে এই ভালোবাসার কথা নিয়ে। আমি আপনাকে বলছি কিছুদিনের মধ্যেই ওরা সবাই আমাকে ভয় করবে। ওসব নিয়ে আপনি কিচ্ছু ভাববেন না।

হাত দুটি শূন্যে তুলে মুঠো শক্ত করে সে বলল, আমি জানি আমার ইচ্ছানুযায়ী লোককে কীভাবে চালাতে হয়। ভালোবাসার পরোয়া আমি করি না। আপনাকেও…।

উলিয়ানা নির্বাক হয়ে গেল। মনে মনে শুধু বললে, জানোয়ার কোথাকার।

অবশেষে এল সেই শুভদিন। অতিথি সমাগমে ভরে উঠল উলিয়ানার ঘর। এদের মধ্যে নাতালিয়ার বান্ধবীরাই সংখ্যায় বেশি। এরা সবাই

অভিজাত পরিবারের মেয়ে। মহার্ঘ, বর্ণাঢ্য বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে এসেছে এরা। মখমলের গাউন, বাহারী ডিজাইন, রুশী মেয়েদের জাতীয় পোশাক সারাক্ষণ এদের অঙ্গে। পায়ে মরক্কো চামড়ার জুতো। কনের বেশে বান্ধবীদের মাঝে বসে আছে নাতালিয়া। বসনের ভারে তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসার মতো অবস্থা। সে পরেছে রূপোর জরির কাজ করা সারাফান। গলাবন্ধ সারাফানের জরি মোড়া বোতাম। কাঁধে ঝুলছে সোনার জরির কাজ করা নীল আর সাদা রিবন বসানো কোট। গলন্ত বরফের চাঙড়ের মতো সে বসে আছে। ঘেমে নেয়ে একশেষ। ঘন ঘন রুমাল দিয়ে কপাল মুছে নিচ্ছে। তারপর একসময় রীতি অনুযায়ী কবিতা আওড়ায়ঃ শ্যামল, তৃণভূমি ও নীল ফুলের ক্ষেতের ওপর দিয়ে বয়ে যায় বসন্তের নদী।' এলোমেলো শীতল ধারার ঝিরঝির শব্দ।

বান্ধবীরা নাতালিয়ার আবৃত্তির শেষ কলিটির সূত্র ধরে গান ধরে। গানের ভাবখানা এইঃ ওরা আমাকে বলে জল আনিতে, নগ্নপদে বিবসনা করে ওরা আমায় বলে জল আনিতে।

মেয়েদের ভিড়ে গা ঢাকা দিয়ে ছিল এতক্ষণ আলেক্সি। সশব্দে সে হেসে উঠলোঃ বেড়ে মজার গান তো! সোনার খাঁচায় মুরগীর ছানা ঢুকিয়ে দেবার মতো সোনার জরির কাজ করা পোশাকের মধ্যে কনেকে পুরে তোমরা কি না চেঁচাচ্ছ সে নগ্নপদ, বিবসনা।

কনের কাছেই বসেছিল নিকিতা। ঘন নীল রঙের তার নতুন কোট কুঁজের ওপর দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে জেগে উঠেছে। আয়ত নীল চোখ মেলে এমন অপলক দৃষ্টিতে সে নাতালিয়াকে দেখছে যেন চোখ ফেরালেই নাতালিয়া গলে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

দরজার একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল সেই বুড়ি বাস্কায়া। সে খনখনে গলায় বলে উঠল, তোমাদের গানে একটুও করুণ সুর নেই। কথায় বলে মেয়েদের বিয়ে মানে উঁচু পাথরের দেওয়ালের পিছনে চলে যাওয়া। এ দেওয়াল ভাঙাও যায় না, টপকানোও যায় না।

মেয়েরা বুড়িকে পাত্তা দিলো না। ঠেলতে ঠেলতে তাকে ওরা বাগানে বের করে দিলে। আলেক্সি কিন্তু নেশায় রঙীন ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে ফুলের বাগানে মৌমাছির মতো মেয়েদের মাঝেই রয়ে গেল।

বুড়ি মেয়েদের কাছে পাত্তা না পেয়ে সটান চলে গেল ওপরে উলিয়ানার কাছে। নালিশের ভঙ্গিতে তাকে বলল, তোমার মেয়ে দেখছি বড্ড বেশি উল্লসিত। এ তো ভালো নয়, রীতিও নয়। কথায় বলে আনন্দে যার শুরু

দুঃখে তার শেষ

উলিয়ানা তখন আলমারী থেকে কাপড়চোপড় বের করছে। মেঝেতে সিল্কের শাড়ি, কাশ্মীরী শাল, তোয়ালে, রংবেরঙের ফিতে ছড়িয়ে রয়েছে। উলিয়ানা চোখ তুলে বুড়ির দিকে তাকাতেই সে তার মন্তব্যের উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই আবার বলল, বিয়ের আগে কনের বাড়িতে বরের থাকা মোটেই ভালো দেখায় না। ওদের উচিত ছিল এখান থেকে চলে যাওয়া।

উলিয়ানা বলল, তুমি একথা আগে বলনি কেন?

আমি কেন বলতে যাব? সবাই তো বলে তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে।

বুড়ি চলে যেতেই উলিয়ানা নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, ভগবান তুমি আমায় রক্ষা করো, দেখো যেন পাগল না হয়ে যাই।

দরজায় আবার শব্দ হলো। এবারে নিকিতা। সে বলল, আমাকে নাতালিয়া পাঠালো। আপনার কি কিছু প্রয়োজন আছে?

না না বাছা, আমার কিছু প্রয়োজন নেই।

আপনাকে একটা খবর দিই। রান্নাঘরে মেয়েটি রস জ্বাল দিতে গিয়ে নিজের গায়েই ঢেলে ফেলেছে।

বেশ করেছে! খাসা মেয়ে! তোমার বউ হলে মানাবে ভালো।

আমাকে আবার কে বিয়ে করবে? কথা কটি বলেই নিকিতা চলে এল।

এদিকে বাগানে লাইম গাছের তলায় বিশাল টেবিলে পানের আসর বসেছে। সেখানে রয়েছে বরকর্তা ইলিয়া আর্টামনোভ, গ্যাব্রিলা বাক্সি, কনের ধর্মপিতা পমিয়ালোভ এবং আরো কয়েকজন। লাইম গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল পিওতর। তার তেলচুকচুকে মাথাটা মনে হচ্ছিল ইস্পাতের তৈরি। বড়দের কথাবার্তা সে মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

ইলিয়া বলল, আপনাদের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে আমাদের মিল নেই।

আমরাই যে রাশিয়ার আদিম অধিবাসী। পমিয়ালোভ দম্ভ করে বললে।

আমরাও কিছু বিদেশী নই।

আমাদের আচার-প্রথা অনেক প্রাচীন।

কিন্তু তোমাদের মধ্যে তো ফিনো-উগ্রিক জাতিও রয়েছে যাদের অনেক আচার ও প্রথা খৃষ্টধর্মের সঙ্গে মেলে না।

তর্ক বেশিদূর গড়াতে পারলো না কারণ একদল মেয়ে তখন হাসাহাসি করতে করতে বাগানে ঢুকে পড়েছে। ছড়া কেটে তারা বলল: ইলিয়া

আর্টামনোভ মহামান্যবর। এক পা বাড়ান, এক পা ভাঙে। দু পা বাড়ান দু পা ভাঙে। তিন পা বাড়ান, না না, এবার ভাঙে ঘাড়।

রাগে বিরক্তিতে ইলিয়া লাল হয়ে ওঠে। ছেলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, এটা এদের কী ধরনের রসিকতা?

পিওতর আর কী বলবে? হাসি হাসি মুখ করে সে চুপ করে থাকে। বার্কি বলল, এ সব আপনাকে সহ্য করতেই হবে। কনে চুরি করতে এসেছেন আপনি, এ ছাড়া আপনাকে আমরা আর কী ভাবে সম্বর্ধনা জানাতে পারি?

ইলিয়া রাগত স্বরে বলল, এ সব কিন্তু মোটেই রুচিসম্মত ব্যাপার নয়। আমাদের দেশের আচার-ব্যবহার তোমাদের তুলনায় অনেক ভদ্র ও সুরুচিসম্পন্ন।

বার্কি দেমাক দেখিয়ে বলল, ঠিক আছে ঠিক আছে, এবার মেয়েদের কিছু উপহার দাও দিকিনি।

কত দেব?

যা পারো।

ইলিয়া দুটি রূপোর রুবল্‌স দিতেই পমিয়ালোভ রাগতস্বরে বলল, বড়লোকিপনা দেখাচ্ছ বুঝি।

ইলিয়া রেগে গিয়ে বলল, তোমাদের খুশি করা দেখছি খুবই কঠিন।

বিয়ের প্রাথমিক পর্ব শেষ। অতিথিরা সবাই চলে গিয়েছে। বাড়ির প্রায় সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। জেগে আছে শুধু ইলিয়া পিওতর আর নিকিতা। তিনজনে বাগানে বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। ইলিয়া দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, এরা বড় অভদ্র। যাই হোক পিওতর তোমাকে তোমার শাশুড়ি যা বলেন শুনবে। কী আর বলবেন? মেয়েদের সামান্য কিছু অনুরোধ আর কি। তা মেনে চলার চেষ্টা করবে। আলেক্সি বোধহয় মেয়েদের পৌঁছে দিতে গেছে। মেয়েরা ওকে খুবই পছন্দ করে কিন্তু ছেলেরা ওকে মোটেই দেখতে পারে না। আমি লক্ষ্য করেছি বার্কির ছেলেটা ওর দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকায় যেন সব সময় ছুরি বাগিয়েই আছে, সুযোগ পেলেই বসিয়ে দেবে। আর নিকিতা, তুমি লোকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। আমি জানি চেষ্টা করলে তুমি পারবে। আর কখনো আমার যদি কোনো ত্রুটি দেখো তাহলে সেটা শুধরে দেবে।

তৃষ্ণা মেটাবার আশায় সে একটি কাঠের পাত্রে উঁকি মারে কিন্তু হতাশ হয়। একটি ফোঁটাও পড়ে নেই। লোকগুলো এক একটা মদের পিপে।

ঘোড়ার মতো গিলতে থাকে। পিওতরের দিকে ফিরে প্রশ্ন করে, কী ভাবছো তুমি এখন?

এখানকার জীবন খুব শান্ত ও নির্বিঘ্ন।

হ্যাঁ, দিবারাত্রি যদি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায় তার চাইতে সহজ জীবন আর কী হতে পারে?

বিয়েটাকে ওরা পিছিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

ধৈর্য ধরতেই হবে।

ধৈর্যের পরীক্ষা দেবার দিন অবশেষে পিওতরের কাছে এল। ভয়ংকর কঠিন সে পরীক্ষা। ঘরের এক কোণে আইকনের নিচে সে বসেছিল। তার ভ্রূ দুটি বিরক্তিতে ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছে। শত চেষ্টাতেও সে ভ্রূ দুটিকে স্বাভাবিক করে তুলতে পারছে না। বুঝতে পারছে সে, তাকে মোটেই ভালো দেখাচ্ছে না, বধূর কাছে তো নয়ই। কিন্তু কী করা যাবে? মনে হচ্ছে কেউ বুঝি তার ভ্রূ দুটিকে সেলাই করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে সে অতিথি অভ্যাগতদের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে অস্বস্তিতে কারণ তারা ক্রমাগতই ফুল ছুঁড়ে মারছে। ফুলগুলি ওর মাথায় লেগে নাতালিয়ার ঘোমটায় গিয়ে পড়ছে। তাকেও আজ খুবই ক্লান্ত শ্রান্ত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। শিশুর মতো ভয়ে সে মাঝে মাঝেই থরথর করে কেঁপে উঠছে।

সমবেত জনতার মাঝখান থেকে দাবী উঠল: বধূকে কুড়িবার চুমু খাও*।

পিওতর মাথা না হেলিয়েই ভালুকের মতো ঘুরে গিয়ে নাতালিয়ার ঘোমটা সরিয়ে তার শুকনো ঠোঁট কোনমতে ওর চিবুকে ছোঁয়াল। শাটিনের কাপড়ের মতো শীতল স্পর্শ সে অনুভব করল। বউয়ের জন্যে তার দুঃখই হল কারণ সে বড় লাজুক।

অর্ধোন্মত্ত জনতা চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাল। ও চুমু খেতেই জানে না।

একজন আদেশের সুরে বলল, আরে ওর ঠোঁটে চুমু খাও।

পানোন্মত্তা এক মহিলা বলল, ওকে চুমু খেয়ে দেখিয়ে দেব নাকি কেমন করে···

বার্স্কি আদেশের সুরে চিৎকার করে বলল, চুমু খাও বলছি!

---

*রাশিয়ার প্রথা অনুযায়ী কনে পক্ষের অতিথিরা যদি দাবি করে তবে বরকে সকলের সামনে বধূকে চুম্বন করতেই হয়

পিওতর দাঁতে দাঁত চেপে নাতালিয়ার ভিজে ঠোঁটে এবার চুমু খেল। নাতালিয়ার ঠোঁট থরথর করে কেঁপে উঠল। তার শুভ্র শরীর যেন মুহূর্তেই গলে গেল সূর্যালোকের পরশে মেঘ যেমন গলে যায়। পিওতর অনুভব করছে তার শরীর মদ্যপানে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। তার চোখের সামনে সব কিছুই ঘুরছে। কখনো মনে হচ্ছে তার চোখের সামনে যেন নানা রঙের স্তূপ জমে উঠেছে। কখনো মনে হচ্ছে রক্তিম বুদবুদ ভেসে বেড়াচ্ছে। ভয় পাচ্ছে সে, নিশ্চয়ই তার স্ত্রীও বুঝতে পারছে সব। বাবার ওপর তার খুব রাগ হচ্ছিল। এ সবের জন্যে তিনিই তো দায়ী। সে বাপের দিকে নালিশের ভঙ্গিতে তাকাল। কিন্তু বাপের এসব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় নেই এখন। খুশির মেজাজে সে এখন হৈচৈ করছে আর উলিয়ানার রাগত মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে।

আসুন উলিয়ানা, মধুর মদ্যপান করে আমরা পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করি।

আপনার মদ আপনারই মতো মধুর।

উলিয়ানা যখন তার শুভ্র সুডৌল হাতখানি বাড়িয়ে দিল তখন রত্নখচিত তার হাতের সোনার ব্রেসলেট রোদ্দুরে ঝিকমিক করে উঠল। আর মুক্তোর হার তার সুউন্নত বক্ষের ওপর আলোয় আলোয় ঝলমল করে উঠল। উলিয়ানাও ইতিমধ্যে যথেষ্ট পান করে ফেলেছে। চোখে তার ক্লান্ত হাসির রেখা, ঠোঁট ঈষৎ খোলা। ইলিয়া আর্টামনোভের গেলাসের সঙ্গে নিজের গেলাস ছুঁইয়ে সে ঈষৎ অবনত হয়ে তাকে অভিবাদন জানায়।

ইলিয়া তার ঝাঁকড়া চুলভর্তি মাথা ঝাঁকিয়ে উলিয়ানার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে, আহা কী মধুর আপনার ভঙ্গিমা, রাজরাণীরাও হার মানবে।

পিওতর অনুভব করছে তার বাবার আচার-আচরণ মোটেই স্বাভাবিক হচ্ছে না। তাছাড়া সবাই যে ভাবে হৈ-হুল্লোড় করছে তাতে মোটেই বিয়ের আসর মনে হচ্ছে না। এমন সময় তার কানে এল কে যেন বলছে, দেখছো শয়তানটা কী ভাবে উলিয়ানার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বলে দিচ্ছি আর একটি বিয়ে লাগলো বলে। তফাত শুধু এ বিয়েতে পুরুত লাগবে না।

কয়েকটা মুহূর্ত কথাগুলো পিওতরের কানে ঢাকের আওয়াজের মতো কর্কশ শব্দে বাজতে লাগল। ঠিক সেই সময়ে নাতালিয়ার হাঁটু কিংবা কনুইয়ের স্পর্শে তার গোটা শরীরে কামনার স্রোত বয়ে গেল যেন। তার

এতক্ষণের বিরক্তি কোথায় যেন ডুবে গেল। নাতালিয়ার দিকে চোখ না ফেরাবার চেষ্টা করল সে অনেক, ঘাড় শক্ত করে রইল কিন্তু চোখ তার শাসন মানলো না। দৃষ্টি ঘুরেফিরে পার্শ্ববর্তিনীর দিকে চলে যাচ্ছেই।

ফিসফিস করে সে নাতালিয়াকে প্রশ্ন করল, এসব কখন শেষ হবে বলো তো?

নাতালিয়াও ফিসফিস করে জবাব দিল, কী জানি।

আমার খুব খারাপ লাগছে।

আমারও।

পিওতর স্ত্রীর উত্তর শুনে খুশি হল। যাই হোক তার সঙ্গে একমত সে।

ওদিকে আলেক্সি বাগানের পান ভোজনে বেশ মেতে উঠেছে। নিকিতা একজন রোগাটে পুরুতের পাশে বসে আছে। রাস্তায় উঠোনে শহরের সব লোক এসে জমা হয়েছে। বেশ ভিড় জমেছে। ঘন ঘন তারা জায়গা বদল করছে, উঁকিঝুঁকি মারছে, সবারই কৌতূহল ঘরের মধ্যে কি হচ্ছে দেখার। ফলে ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি। জনতার মধ্যে একজনকে নিকিতার বেশ মনে ধরল। সে হচ্ছে দিনমজুর টিখন ভায়ালোভ। লোকটির গালের হাড় দুটি উঁচু, মাথায় ঘন লালচে চুল। সে যখন চোখ পিটপিট করে তাকায় তখন তার চোখের পাতা একটুও নড়ে না। মুখখানা তার ছোট, মোটা গোঁফের আড়ালে থাকায় তার ঠোঁটের কম্পন দেখাই যায় না। কান দুটো বিশ্রীভাবে মাথার সঙ্গে জোড়া। নিকিতার মনে হল তারও কুঁজ আছে। বুক চিতিয়ে সে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। তার ঘাড় প্রায় নেই বললেই চলে, মনে হয় বুক থেকে যেন সোজা মাথাটি উঠে এসেছে। তাকে কেউ ধাক্কা দিলে সে চেঁচায় না, গালাগালি করে না কিন্তু কাঁধের সামান্য ঝাঁকুনিতে কিংবা কনুইয়ের ধাক্কায় সে একসঙ্গে বেশ কয়েকজনকে ফেলে দিতে পারে।

টিখন হঠাৎই এক ঘুঙুর লাগানো ঢোলক বাজাতে শুরু করল। কেউ একজন শিস দিতে শুরু করল। এই না দেখে বার্স্কার ছেলে স্তিয়েপাশা নাচতে শুরু করে দিল, সঙ্গে গান। তার বাপ এসে ছেলেকে উসকে দিয়ে বলল, আরে মুরগীর ছানাগুলোকে একবার দেখিয়ে দে তুই আরো কী পারিস।

খোঁচা খেয়ে ইলিয়ানা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বলল, আরে আমরা মোরগ-ছানা নই রে, আমরা হচ্ছি জোয়ান···। তারপর হাঁক পাড়ল, আলেক্সি!

আলেক্সি এতক্ষণ ভায়ালোভের নাচিয়েকে দেখছিল। বাপের ডাক শুনে

সে কিছুটা পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। তারপর মেয়েদের মতো সুর ভাঁজতে ভাঁজতে দ্রুতবেগে নাচতে শুরু করে দিল।

জনতার মন্তব্য ভেসে এল, আরে লোকটা গান জানে না। মন্তব্য শুনে ইলিয়া ক্ষেপে গিয়ে বলল, আলেক্সি, তোকে আমি খুন করে ফেলবো।

সুতরাং আলেক্সি গান ধরলো নাচের সঙ্গে। বাক্স্য়াকে মন্তব্য করতে শোনা গেল, কী যে নাচে ইলিয়ার ছেলে। নাচের মধ্যে কোনো ছন্দই নেই। এই না শুনে ইলিয়া তার সামনে গিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ল। কারণ তার ছেলে ততক্ষণে জিতে গিয়েছে। বাক্স্যার ছেলেকে দেখা যাচ্ছে টলতে টলতে পিছিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎই ইলিয়া এক কাণ্ড করে বসল। উলিয়ানার একটি হাত শক্ত করে ধরে আদেশের সুরে বলল, এসো আমার সঙ্গে নাচবে এসো।

উলিয়ানার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। মুক্ত হাতখানা ওপরের দিকে তুলে সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল নিজেকে মুক্ত করে নিতে। না পেরে সে রাগ দেখিয়ে বলল, আপনি বুঝছেন না কেন যে আমার পক্ষে নাচা মানায় না। এ আপনি কি করছেন?

উপস্থিত জনতার মধ্যে নিঃসীম স্তব্ধতা নেমে এল। পমিয়ালোভের মুখে বাঁকা হাসির রেখা। সে একবার আড়চোখে বাক্স্যাকে কিছু ইঙ্গিত করল।

উলিয়ানা চলে এসো। কে কি মনে করবে তাতে কিছু এসে যায় না। যদি এতে পাপ হয় তো সে পাপ হবে আমার।

ইলিয়াকে এখন অনেক সুস্থির মনে হচ্ছে। কেউ একজন উলিয়ানাকে তার দিকে ঠেলে দিল। উলিয়ানার চালচলনে ধরা পড়ছে সে যথেষ্ট পান করেছে। প্রথম দিকে সে কিছুটা খোঁড়াচ্ছিল তারপর নিজেকে সে টান টান সোজা করে নিল তারপর মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে নাচের জন্যে নির্দিষ্ট বৃত্তাকার জায়গাটিতে গিয়ে পৌঁছলো।

বাঁধভাঙা বিস্ময়ে পিওতরের মুখ থেকে বেরিয়ে এল: হায় ভগবান, এ কী কাণ্ড। ভদ্রমহিলার স্বামী মারা গেছেন এক বছরও হয়নি আর তিনি, কিনা পানোন্মত্তা হয়ে পরপুরুষের সঙ্গে নাচছেন!

পিওতর অনুভব করল নাতালিয়াও মায়ের আচরণে দুঃখ পেয়েছে। তবু কিন্তু সে বলল, বাবার এ কাজ করা ঠিক হয়নি।

মায়েরও উচিত হয়নি। নাতালিয়াও অনুযোগের সুরে বলল।

দর্শকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ঘরের মধ্যেকার ওই দৃশ্যের ওপর। সূর্যের শেষ

রক্তিম আলো দর্শকদের মাথা স্পর্শ করে ঘরের মধ্যের যুগল নাচিয়েকেও রাঙিয়ে তুলেছে। বাগানে উঠোনে এবং রাস্তায় লোক প্রাণ খুলে হাসছে। ঘরের গুমোট আবহাওয়ায়, ছেলেমেয়েদের ভিড়ের মাঝখানে ওই দুজন উন্মত্ত আবেগে নেচেই চলেছে। ছেলেমেয়েরা এমন মনোযোগ দিয়ে নাচ দেখছে এবং অখণ্ড নীরবতা রক্ষা করে চলেছে, যেন অসাধারণ কিছু ঘটছে তাদের চোখের সামনে। বয়স্কদের মধ্যে যারা একটু সুস্থ প্রকৃতির তারা ঘর ছেড়ে বাগানে চলে গেল।

একসময় ইলিয়া আর্টামনোভ মেঝেতে পা ঠুকে নাচ থামিয়ে দিল। ক্লান্ত হলেও খুশি উপচে পড়ছে তার মুখে। উলিয়ানার চোখে চোখ রেখে বলল, সাবাস উলিয়ানা ইভানোভনা, তুমি চমৎকার নাচো, হারিয়ে দিয়েছ আমাকে।

উলিয়ানা দেওয়ালে পিঠ রেখে শ্বাস নিতে নিতে জনতার দিকে ফিরে বলল, আশা করি আপনারা আমাদের দোষ বড় করে দেখবেন না। ঘর ছেড়ে সে ওপরে গিয়ে পাখা দিয়ে হাওয়া খেতে লাগল। তার জায়গায় অভিভাবকত্ব করতে এল বুড়ি বাক্সায়া।

বর কনেকে এবার আলাদা করে দাও—আদেশ দিল বাক্সায়া। বরযাত্রীদের বলল, তোমরা ওর হাত ধরে নিয়ে এস। ইলিয়া কিন্তু সবাইকে ঠেলে সরিয়ে ছেলের কাছে এসে তার কাঁধের ওপর হাত রেখে বলল, এস আমরা কোলাকুলি করি। এইবার যাও, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

বাক্সায়ার পিছনে পিছনে পিওতর ঘরে ঢুকে দেখে সেখানে রাজ-শয্যার ব্যবস্থা প্রস্তুত। বাক্সায়া ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারে তার মোটা শরীরটা নিয়ে বসে পড়ল।

পিওতর, যা বলি মন দিয়ে শোনো, ভুলে যেও না যেন। তোমাকে আমি দুটি হাফ রুবল দিচ্ছি, এ দুটি তুমি তোমার জুতোর মধ্যে লুকিয়ে রাখো। নাতালিয়া এসে তোমার জুতো খুলে দিতে চাইলে তুমি অনুমতি দেবে না। পরপর তিনবার প্রার্থনা জানালে তুমি অনুমতি দেবে এবং তাকে উপহার হিসেবে ওই রুবল দুটি দিয়ে বলবে, ওগো আমার দাসী, আমার চিরজীবনের বাঁদি এই নাও তোমার উপহার।

তারপর পোশাক পাল্টে স্ত্রীর দিকে পিছন ফিরে শুয়ে থাকবে। সে এসে যখন তোমার সঙ্গে রাত কাটাতে চাইবে তখন তিনবার তুমি কোনো উত্তর দেবে না, চতুর্থবার অনুমতি চাইবার পর তুমি হাত বাড়িয়ে দেবে এবং তারপর···। বুঝলে তো? আর একটা কথা, স্ত্রীর ফোঁপানি ও চোখের

জলকে যেন বিশ্বাস করো না। উপদেশগুলোকে বারকয়েক উচ্চারণ করে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল, রেখে গেল কিছু মদের গন্ধ।

বিছানাটা বড় গরম তাই শুয়ে থাকতে ভালো লাগল না। সে উঠে গিয়ে জানলা খুলে দিল। বাগান থেকে তখন মত্ত কণ্ঠের উল্লাসের ধ্বনি ভেসে আসছে। আর নীল সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে গাছের ফাঁকে ফাঁকে অতিথিদের কালো কালো ছায়া দেখা যাচ্ছে। সেন্ট নিকোলাস গির্জার চূড়োয় একটি তামার আঙুল আকাশের দিকে তোলা। ক্রুশখানা গিল্টি করার জন্যে খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাড়িগুলোর ছাদের ওপারে ওকা নদীর বিষণ্ণ রূপোলি ধারার ওপর ক্ষীণায়মান চাঁদের আলো। আরো দূরে সীমাহীন অরণ্য কালো তুষারের স্তূপের মতো দেখাচ্ছে। এইসব দৃশ্য তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে ফেলে আসা সুদূরের সুন্দর এক দেশ। সোনালী শস্যে ভরা সেখানকার আদিগন্ত মাঠ তার স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, পিওতর আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে। ভেজানো দরজা খুলে যায়। রেশমী শাড়ির খস্‌খস্‌, জুতোর ক্যাঁচ ক্যাঁচ আর ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। দরজা আবার বন্ধ হয়ে যায়। পিওতর সাবধানে মাথা তুলে দেখে দরজার সামনে আবছা আলোয় শুভ্র এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে। ছন্দোময় ভঙ্গিমায় সে হাত নেড়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকছে। সে মনে মনে বলে, বুঝেছি ও প্রার্থনা করছে। কিন্তু আমি তো প্রার্থনা করলাম না। প্রার্থনা করার ইচ্ছে এখন আর তার নেই। কোমল কণ্ঠস্বরে সে তাকে বললে, নাতালিয়া তুমি কিন্তু ভয় পেও না যদিও আমি এতক্ষণ ভয়ে কাঠ হয়ে ছিলাম। তার মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে কাছে টেনে এনে সে বলল, তোমাকে কিন্তু আমার জুতো খুলে দিতে হবে না। যত্তো সব বাজে আচার।

নাতালিয়া ধীর পায়ে জানলার কাছে গিয়ে বলল, লোকেরা এখনো ফুর্তি করছে।

পিওতর বলল, হ্যাঁ।

যদিও দুজনেই খুব ক্লান্ত তবু তাদের মন চাইছে ঘনিষ্ঠ হতে। কিন্তু কোন্ এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। অর্থহীন সংলাপ দিয়ে তারা সেই ফাঁক ভরিয়ে রাখছে। এমনিভাবেই কখন ভোর হয়ে এল। দরজায় কার হাতের টোকার শব্দ শোনা গেল। নাতালিয়া দরজা খুলতে এগিয়ে গেলে পিওতর বলল, বার্ক্সায়াকে ঢুকতে দিও না কিন্তু। দরজা খুলতে খুলতে নাতালিয়া বলল, মা এসেছেন।

পিওতর বিছানার এক ধারে বসে পা দোলাতে লাগল। নিজের ওপর সে আজ খুবই অখুশি। মনে মনে সে ভাবছিল, আমি বড়ই দুর্বল, সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারলাম না। ও নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছে। আমাকে এখন অপেক্ষা করে থাকতে হবে সেই···।

মা তোমাকে ডাকছেন।

যেতে যেতেই পিওতর শাশুড়ীর গজগজানি শুনতে পেল। পিওতরের কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে উলিয়ানা রাগতস্বরে বলল, পিওতর তুমি ভেবেছ কি? তুমি কি লোকের কাছে আমাদের মাথা হেঁট করে দিতে চাও? দেখছো না কত বেলা হয়ে গেছে।

পিওতরের মুখের চেহারা দেখে এবং তার নীরবতায় মায়ের মন কী যেন বুঝে ফেলে। কণ্ঠস্বর নরম করে সে বলে, আমাকে ভয় পেয়ো না লক্ষীটি, কী হয়েছে খুলে বল।

আমি নাতালিয়ার জন্যে সত্যিই দুঃখিত। আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

বুঝেছি। তুমি এখনই ঘরে যাও এবং স্বামীর যা করণীয় তাই করো গিয়ে। আর সেন্ট ক্রিস্টোফারের কাছে প্রার্থনা জানিও। না না, যাবার আগে আমার চুম্বন নিয়ে যাও।

উলিয়ানা পিওতরের গলা দু হাতে জড়িয়ে তার গালে তার মধুর রসসিক্ত ঠোঁটে চুমু খেল। মদের উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শ পেল পিওতর। প্রতিচুম্বন করার সুযোগ না পেয়ে সে শূন্যেই ফিরিয়ে দিল সশব্দ চুম্বন। তারপর ফিরে এল সে নিজের ঘরে। ভেতর থেকে তালা বন্ধ করে স্ত্রীর কাছাকাছি এসে এবার সে প্রত্যয়ের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল। নাতালিয়াও বিনম্র ভঙ্গিতে ধরা দিল তার বাহুবেষ্টনীতে। তারপর কম্পমান কণ্ঠে বলল, মা কিছুটা মাতাল হয়েছেন।

পিওতর আশা করেছিল নাতালিয়া অন্য কিছু বলবে।

নাতালিয়াকে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে বেঁধে বিছানার দিকে যেতে যেতে পিওতর আবেগজড়ানো গলায় বলল, নাতালিয়া ভয় পেও না কিন্তু। আমি হয়তো দেখতে ভালো নই কিন্তু মানুষ খারাপ নই।

পিওতরের বুকের আরো কাছাকাছি এসে নাতালিয়া ফিসফিসিয়ে বলল, ওগো আমি যে আর দাঁড়াতে পারছি না।

দ্রায়ামোভের লোকেরা পান ভোজনে খুবই আসক্ত। তাই বিয়ের

উৎসব চললো পাঁচদিন পর্যন্ত। এই পাঁচদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তারা রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াল, এর ওর বাড়ি ভোজ খেল এবং মদ খেয়ে মাতামাতি করল।

ইলিয়াও খুব দিলদরিয়া মেজাজে ছিল এই ক'দিন। মেলা থেকে কিনে ফিতে ও আরো টুকিটাকি জিনিস দিলে মেয়েদের, ছেলেদের দিলে তাদের পছন্দমতো জিনিস কেনার জন্যে টাকা। আর তাদের অভিভাবকদের প্রচুর মদ খাওয়ালে। তারপর প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরে, কাঁধে হাত রেখে বলল, ওহে ভালোমানুষেরা কী মনে হচ্ছে আমরা বেঁচে আছি তো?

সত্যিই এই ক'দিন সে দারুণ মাতামাতি করল। প্রচুর মদ খেল। ভাবখানা এই যে যেন ভিতরের আগুন নেভাচ্ছে। তবু কিন্তু মাতাল হল না সে। তবে বেশ রোগা হয়ে গেল। ছেলেরা লক্ষ্য করল তাদের বাবা উলিয়ানাকে এড়িয়ে চলে কিন্তু একটা ক্ষুব্ধ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। নিজের শক্তির ওপর তার অগাধ আস্থা এবং এই নিয়ে তার অহঙ্কারও কম নয়। সৈন্যদের সঙ্গে সে প্রায়ই দড়ি টানাটানির খেলায় যোগ দিত এবং একবার তিনজন রাজমিস্ত্রীকে হারিয়ে দিয়েছিল কুস্তিতে। একদিন দিনমজুর টিখন ভায়ালোভ এসে তাকে আহ্বান জানাল কুস্তি লড়ার জন্যে। তার প্রস্তাব করার ধরন দেখে ইলিয়া মজুরটির মজবুত দেহের গড়ন পর্যবেক্ষণ করে বলল, কি হে, সত্যিই তোমার গায়ে জোর আছে না শুধুই তড়পানি?

টিখন বললে, তা আমি জানি না।

লড়াইয়ের জন্যে দুজনেই এগিয়ে এল। প্রথম তো দূরত্ব রক্ষা করে তারা নিজেদের কোমরের বেল্টে হাত রেখে কিছুক্ষণ লাফালাফি করল। দুজনের মধ্যে ইলিয়াই লম্বা, যদিও তুলনামূলকভাবে কিছুটা কৃশ কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ সুগঠিত দেহ। সে টিখনের কাঁধের ওপর দিয়ে সমবেত মহিলাদের দিকে তাকিয়ে কিছুটা নির্লজ্জভাবে চোখ পিট পিট করে তাকাচ্ছিল। টিখন তখন তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুঁটিয়ে দেখছিল এবং কি ভাবে তাকে হঠাৎ তুলে মাথার ওপর দিয়ে ফেলে দেওয়া যায় সেই মতলব ভাঁজছিল। তার মতলব বুঝতে পেরে সে বলল, তুমি অত ক্ষিপ্র নও বন্ধু, অত ক্ষিপ্র নও। পরমুহূর্তেই অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ইলিয়া জায়গা বদলে টিখনকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। টিখন অনেকক্ষণ মাটিতেই পড়ে রইল। পায়ে তার খুবই আঘাত লেগেছে। সে অবস্থাতেই দেঁতো হাসি হেসে বলল, হ্যাঁ শক্তিমান লোক সন্দেহ নেই।

সমবেত জনতা বলল, তাইতো দেখছি।

টিখন আবার বলল, শক্তিমান লোক বটে।

ইলিয়া তার একটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নাও এবারে উঠে পড়। ইলিয়ার সাহায্য নিয়ে উঠতে অস্বীকার করল টিখন। নিজের চেষ্টাতেই ওঠার চেষ্টা করল সে কিন্তু পারল না। নিকিতা কাছে এগিয়ে এসে সহৃদয় কণ্ঠে বলল, খুব লেগেছে কি? আমি সাহায্য করবো?

মৃদু হেসে টিখন বলল, তোমার বাবার চেয়ে গায়ের জোর আমার বেশি কিন্তু আমি তেমন চতুর নই। মনে হচ্ছে পায়ের হাড় ভেঙে গেছে।

যাই হোক নিকিতার হাত ধরে সে উঠে দাঁড়াল। এবং বন্ধুর মতো তার কাঁধে হাত রেখে এগিয়ে গেল। হাঁটার সময়ে সে বার বার মাটিতে পা ঠুকছিল। ভাবছিল এতেই বোধহয় তার পায়ের ব্যথা সেরে যাবে।

এদিকে নবদম্পতি যদিও ক্লান্ত ও শ্রান্ত তবু রীতি অনুযায়ী তাদের নিজেদের দেখাবার জন্যে পথপরিক্রমায় বেরোতে হল। বিশৃঙ্খল জনতা অধিকাংশই মাতাল, তাদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে ওদের পথপরিক্রমা করতে হল। অনেকের সঙ্গেই অনিচ্ছায় তাদের মদ্যপান করতে হল, অশ্লীল ঠাট্টা ইয়ার্কি শুনতে হল। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল পরস্পরের দিকে না তাকাতে এবং যথাসম্ভব নীরবতা রক্ষা করে চলতে।

ওদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বাক্সায়া বলল, বাঃ ইলিয়া ছেলেকে সুন্দর শিক্ষা দিয়েছে। আর উলিয়ানা দ্যাখো তোমার মেয়েকেও আমি কেমন শিক্ষা দিয়েছি। জামাইটি কিন্তু তুমি খাসা পেয়েছ।

ঘরে ফিরে পিওতর ও নাতালিয়া সংস্কারভিত্তিক যাবতীয় নিয়মকানুনকে মন থেকে মুছে ফেলল। যে ভাবে রাস্তার জামাকাপড় খুলে ফেলে ঠিক সেইভাবেই। বিছানায় শুয়ে তারা সারাদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা

'এখানকার 'লোকেরা খুব বেশি মদ খায়। কৃষকদের পক্ষে এত মদ খাওয়া কী করে সম্ভব বুঝে উঠতে পারি না।

তোমরাও তো মদ কম খাও না অথচ তোমাদের দেখে তো কৃষক মনে হয় না!

আমরা বড়লোকদের ভৃত্য ছিলাম। দীর্ঘকাল ওইভাবে চলতে চলতে আমরাও কিছুটা তাদের মতো হয়ে গেছি।

এক সময় পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে ঘনিষ্ঠ হয়ে তারা জানলার

কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। নির্বাক হয়ে তারা শুধু বাগান থেকে ভেসে আসা মধুর ঘ্রাণে বিভোর হয়ে থাকে।

তুমি এত কম কথা বল কেন? খুবই শান্ত স্বরে নাতালিয়া প্রশ্ন করল।

পিওতরও শান্তভাবেই জবাব দিল, অতি সাধারণ কথা বলতে আমার ভালো লাগে না।

নিজের অক্ষমতায় নাতালিয়া দুঃখ পেল। তার স্বামী অসাধারণ কথা বলতে ভালবাসে তার মানে শুনতেও তিনি চান অসাধারণ কথাবার্তা। কিন্তু সে তো তেমন ভাবে কথা বলতে পারে না।

একদিন জানলার ধারে দুজনে চুপচাপ বসে ছিল। তারকাখচিত আকাশ থেকে স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়ছে বাগানে। এমন সময় স্নান-বাড়ির কাছাকাছি বাগান থেকে তারা কার যেন অশান্ত পদধ্বনি শুনতে পেল। কেউ যেন র‍্যাশবেরির ঝোপঝাড় মাড়িয়ে ছুটে পালাচ্ছে। তারপরেই তারা শুনতে পেল নারীকণ্ঠের চাপা ক্রুদ্ধস্বর।

শয়তান, তোমার এত সাহস!

আতঙ্কে লাফিয়ে উঠল নাতালিয়া।

এ তো মায়ের গলা।

পিওতর তাড়াতাড়ি জানলার সামনে দাঁড়িয়ে তার চওড়া পিঠ দিয়ে স্ত্রীকে সম্পূর্ণ আড়াল করে দিল। অদ্ভুত এক দৃশ্য তার সামনে। তার বাবা শাশুড়ীর হাত দুটো শক্ত করে চেপে ধরে স্নানঘরের দেওয়ালে চেপে ধরেছেন এবং চেষ্টা করছেন তাঁকে মাটিতে শুইয়ে ফেলার। শাশুড়ী চেষ্টা করছেন প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করতে।

ছেড়ে দাও আমাকে নইলে আমি চেঁচাব।

পরমুহূর্তেই সেই ক্রুদ্ধা নারীর কণ্ঠস্বর কেমন আশ্চর্য বদলে গেল

লক্ষ্মীটি আমায় ছেড়ে দাও। দয়া করে ছেড়ে দাও।

পিওতর জানলা বন্ধ করে দিয়ে স্ত্রীকে কাছে টেনে নিল।

নাতালিয়া স্বামীর বাহুবন্ধনে বন্দী হয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

কে লোকটা?

আমার বাবা। তুমি কি বুঝতে পারোনি? পিওতরের নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর।

কী অন্যায়! লজ্জায় ভয়ে নাতালিয়া ডুকরে কেঁদে উঠল।

স্ত্রীকে শয্যার দিকে নিয়ে যেতে যেতে পিওতর বলল, অভিভাবকদের বিচার করার যোগ্য বোধহয় আমরা নই।

কত বড় পাপ বলো তো!

আমাদের পাপ তো নয়।

পিওত্তরের মনে পড়ে গেল তার বাবা প্রায়ই বলতেন, ভদ্রলোকেরা এর চাইতে অনেক গর্হিত কাজ করে।

চোখের জল মুছতে মুছতে নাতালিয়া বলল, যখন ওরা নাচছিল তখনই আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম উনি যদি মায়ের ওপর জোর খাটান?

উত্তেজনার ফলে নাতালিয়া একসময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পিওত্তর নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জানলা খুলে দিয়ে বাগানে উদাস দৃষ্টি মেলে দিল। না, বাগানে এখন আর কেউ নেই। শুধুই দীর্ঘশ্বাসের মতো বাতাসের শব্দ ভেসে আসছে। কখনো অন্ধকারে গাছ-গাছালির হিস্ হিস্ শব্দ। কিছুক্ষণ পরে জানলা খোলা রেখেই সে স্ত্রীর পাশে এসে শুয়ে পড়ল। চোখে তার ঘুম নেই। চোখ বুজে সে শুধু ভাবছিল এর পর আর কী ঘটতে পারে। আক্ষেপে তার বুক ভরে যায়। হায়, এর চেয়ে যদি সে বউকে নিয়ে কোনো ক্ষেতে খামারে জীবন কাটাতে পারতো! অনেক শান্তি উচ্চাশামুক্ত সেই জীবনে।

ঘুম ভেঙে গেল নাতালিয়ার। মায়ের জন্যে উৎকণ্ঠা তার নিদ্রাকে গাঢ় হতে দেয়নি। নগ্নপদে শুধুমাত্র সেমিজ গায়ে স্বামীর অজান্তে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মায়ের ঘরের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল। ঘরের দরজা আধ-খোলা। রাতে কিন্তু মায়ের ঘরের দরজা বন্ধই থাকে। বেশ ভয় পেয়ে গেল সে। উঁকি মেরে সে দেখল মায়ের বিছানায় সাদা চাদরে ঢাকা একতাল মাংসপিণ্ড। বালিশের ওপর কালো চুল অবিন্যস্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে।

মা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। শরীর ও মনের ওপর যে ঝড় আজ বয়ে গেছে! ভাবলে নাতালিয়া।

কিছু একটা করা দরকার। মর্মাহত মায়ের জন্যে কিছু সান্ত্বনা। নিঃশব্দ চরণে সে চলে এল বাগানে। শীত শীত করছিল তার বাগানে এসে। পায়ের তলায় শিশির-ভেজা ঘাস। সূর্য যদিও কিছুক্ষণ আগে উঠেছে তবু আজ তার আলো এত তীব্র যে নাতালিয়ার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। শিশিরভেজা একটি চোরকাঁটার পাতা তুলে নিয়ে সে প্রথমে এক গালে পরে অন্য গালে ছোঁয়ায়। মুখ তার বেশ স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। হঠাৎ তার শ্বশুরের কথা মনে

পড়ে যায়। কি ভাবে তিনি চাপড় মেরে হেসে বলেন, কেমন আছ? বেশ ফুর্তিতে আছ তো? এই তো চাই। জীবনটাকে ভালোভাবে উপভোগ করে যাও।

যখনই দেখা হয় সব সময় তিনি এই একই কথা বলেন। তবে ওঁর পিঠে চাপড় মারার ভঙ্গিটা নাতালিয়ার মোটেই পছন্দ নয়। ওভাবে লোকে ঘোড়ার পিঠেই চাপড় মারে। শ্বশুর সম্পর্কে কোনো ভালো বিশেষণ সে খুঁজে পায় না। যা তার মনে পড়ে এককথায় তা হচ্ছে 'দুর্বৃত্ত'।

কোনো এক বৃক্ষের ঊর্ধ্বশাখায় চ্যাফিস্‌চ পাখিরা গান ধরেছে, সিসকিন পাখিরা কিচিরমিচির শব্দ করে কী যেন বলছে, দূরে অনেক দূরে শহরের প্রান্তসীমায় এক রাখাল বালক বাঁশি বাজাচ্ছে আর ভাটারাস্কার তীরে যেখানে কারখানা গড়ে উঠছে সেখান থেকে বহু মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর বাতাসে ভর করে ভেসে আসছে। কিছু একটা মট করে ভাঙতেই নাতালিয়া চমকে উঠল। মুখ তুলে সে ওপরের দিকে তাকাল। মাথার ওপর আপেল গাছের ডালে কে যেন পাখি ধরার ফাঁদ ঝুলিয়ে রেখেছে। তাতেই ধরা পড়েছে একটি সিসকিন পাখি। বেচারা মুক্তির জন্যে কী আপ্রাণ চেষ্টাই না করছে।

কে পাখি ধরার ফাঁদ পেতেছে? নিকিতা কি? কোথায় যেন একটা ডাল ভাঙার শব্দও শোনা গেল। কিন্তু নাতালিয়ার চোখে পড়ল না কেউ।

ধীরে ধীরে এবার সে বাড়ির পথে পা বাড়াল। মায়ের ঘরে একবার উঁকি মারতে গিয়ে দেখল মা জেগে আছেন। চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন তিনি। নাতালিয়াকে দেখতে পেয়েই উলিয়ানা বিস্ময়ে বলে উঠল: একি তুমি এখন, এই সময়ে? কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

এমনিই। তোমাকে দেখতে এলাম।

নাতালিয়ার চোখে পড়ল বিছানার পাশে টেবিলের ওপর প্রায় শূন্য একটি মদের বোতল। টেবিলক্লথের ওপর মদের দাগ আর মেঝেতে পড়ে থাকা মদের বোতলের ছিপিও নাতালিয়ার নজরে পড়ল। এক লহমায় মাকে সে দেখে নিল। অমন সুন্দর চোখের নিচে কালশিটের দাগ। অতিরিক্ত কান্নার ফলে মায়ের চোখ ফুলে গেছে। নাতালিয়ার কিন্তু তা মনে হল না। মায়ের চোখের দৃষ্টিতে আজ যেন কেমন গভীর আত্মমগ্নতা। মায়ের পক্ষে স্বাভাবিক তার উদ্ধত দৃষ্টি যেন আজ সুদূরে সঞ্চরমাণ উদাস।

খানিকটা কৈফিয়তের সুরে বললেন, মশার কামড়ে আজ ঘুমোতে পারিনি। ভাবছি আজ থেকে গোলাঘরে শুতে যাবো। কিন্তু তুমি এই

সাত সকালে ঘর থেকে বেরিয়েছ কেন? তাও খালি পায়ে বাগানে ঘুরে এলে। শিশির পড়েছে, তোমার শেমিজও দেখছি ভিজে গেছে। ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে।

মায়ের কথার মধ্যে আজ যেন স্নেহের সুর ঠিকমতো বাজছে না। কথা বলে নিজের চিন্তার সূত্র বোধহয় ছিন্ন করতে চাইছেন না। ক্রমে নাতালিয়ার উদ্বেগ রূপান্তরিত হল হিংস্র নারীসুলভ কৌতূহলে। কৈফিয়তের সুরে সে বলল, তোমাকে স্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

তুমি হঠাৎ আমার কথা চিন্তা করছিলে কেন? কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে মা প্রশ্ন করলেন।

কারণ এই প্রথম আমাকে ছাড়া তুমি একা ঘুমোচ্ছ, তাই।

নাতালিয়ার মনে হল এক ঝলক রক্ত উঠে মায়ের মুখখানা আরক্তিম হয়ে উঠল।

চোখ বুজেই তিনি মেয়েকে আদেশ করলেন, যাও এখন ঘরে যাও। তোমার স্বামী জেগে আছেন। শুনতে পাচ্ছ না তাঁর পায়ের শব্দ?

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে নাতালিয়ার চিন্তার স্রোত বৈরি রূপ ধারণ করল। তাহলে ভদ্রলোক মায়ের সঙ্গে রাত কাটিয়েছেন। ওই বোতল থেকে তিনিই মদ্যপান করেছেন। মায়ের গলার চাকচাক দাগগুলো পোকার কামড়ে হয়নি, হয়েছে তারই চুম্বনে। কাল রাত্তিরে যিনি এক সময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন আজ রাতে তিনি গোলাঘরে শুতে যাবেন! মুশকিল হল এসব কথা পিওতরকে বলা যাবে না।

নাতালিয়া ঘরে ঢুকতেই পিওতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল, কোথায় গিয়েছিলে?

বাগানে, তারপর মাকে দেখতে।

কেমন আছেন তিনি?

ভালোই।

বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠলো পিওতরের মুখে।

তাহলে সবই ঠিকঠাক আছে। দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে ভাবলো, তাহলে মুখ্যু বুড়িটা ঠিকই বলেছিল। মেয়েদের চোখের জলকে বিশ্বাস করো না।

কথা ঘোরাবার জন্যে সে প্রশ্ন করল, নিকিতাকে দেখলে?

না তো।

ওই তো সে বাগানে পাখি ধরে বেড়াচ্ছে।

নাতালিয়া আঁতকে উঠল। ও মা আমি শুধু শেমিজ পরে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম. আচ্ছা ও যদি সারা রাত জেগে পাখি ধরে তাহলে ও ঘুমোয় কখন?

পিওতর মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করল তাতে কিছু বোঝা গেল না। নাতালিয়া বলল, কুঁজ থাকলে কি হবে, ছেলেটার মনটা ভালো অন্ততঃ আলেক্সির চেয়ে ভালো।

একেকদিন বিয়ার খেতে খেতে ইলিয়া আর্টামনোভ গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে ওকা নদীর ঘোলা জলধারার দিকে তাকিয়ে থাকে। কখনো তার দৃষ্টি চলে যায় বাঁ দিকে একটা জায়গার ওপর যেখানে ভাটারাস্কা নদী চিত্রিত সবুজ সাপের মতো এঁকেবেঁকে জ্বালানি কাঠের বনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সেখানে সোনালী সৈকতে কাঠের কুচি আর চাঁছ তেলের মতো চকচকে দেখায় আর ইটের রঙ হয়ে ওঠে উজ্জ্বল লাল। ওখানেই পদদলিত উইলো ঝোপের মধ্যে চামড়ার রঙের কারখানাটাকে মনে হয় ঢাকনা বিহীন শবাধার। গুদাম ঘরের লোহার ছাদে এখনও রঙ লাগানো হয়নি বলে রোদ্দুরে বেশি চকচক করছে। আলেক্সি একবার মন্তব্য করেছিল যে দূর থেকে গুদামঘরটিকে মনে হয় প্রাচীন কালের প্রার্থনার সঙ্গীতযন্ত্রের মতো। আলেক্সি আজকাল ওইখানেই থাকে। চড়া মেজাজের জন্যে শহরের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তার মোটেই বনে না। আলেক্সির কথা মনে হতেই বাপের মনে দুই ছেলের মধ্যে তুলনা এসে যায়। পিওতর আলেক্সির তুলনায় ধীরস্থির তবে মোটা বুদ্ধির জন্যে সে বুঝতে পারে না আত্মপ্রত্যয় থাকলে মানুষ কী না করতে পারে।

ইলিয়ার মুখের ওপর ছায়া এসে পড়ে। ঘন ভুরুর তলা দিয়ে শহরের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে সে ভাবে, বড়ই মেকী লোকগুলো। কাজ করার সত্যি কোনো ইচ্ছে নেই, উদ্যোগ উদ্দীপনা তো মোটেই নেই।

রাত যখন গভীর হয়, শহরটা যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন ইলিয়া নদীর পাড় ধরে এর ওর বাড়ির পিছন দিয়ে নিঃশব্দ চরণে উলিয়ানার গোলাঘরে এসে উপস্থিত হয়। উষ্ণ আবহাওয়ায় মশাদের গুনগুনানি শুনে মনে হয় তরমুজ আপেল প্রভৃতি ফলের সুগন্ধ বুঝি তারাই ছড়াচ্ছে। ধূসর মেঘের ওপর দিয়ে চাঁদ ভেসে বেড়াচ্ছে আর তারই ছায়া পড়েছে নদীর জলে। এমন পরিবেশের মধ্য দিয়েই একসময় ইলিয়া পৌঁছে যায় সেই গোলাঘরে। ঘরের এক কোণ থেকে সতর্ক ফিসফিসানির স্বর শোনা যায়: কেউ দেখে

ফেলেনি তো ?

জামাকাপড় খুলতে খুলতে সে বলে, লুকিয়ে কোন কাজ করতে আমার ঘেন্না হয়। আমি কি ছেলেমানুষ ?

তাহলে মনের মানুষ চেও না।

না চাইতে পারলেই আমি খুশি হতাম, কিন্তু কি করবো ভগবান জুটিয়ে দিলেন যে।

নাস্তিকপ্রবর, ঈশ্বরের নাম উল্লেখ তোমার মুখে মানায় না, বিশেষ করে আমরা দুজনেই যখন অধর্ম করে চলেছি।

ঠিক আছে ওসব কথা পরে ভাবা যাবে। জানো উলিয়ানা, এখানকার লোকগুলো···

অনেক শুনেছি, ও নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিও না। শৃঙ্গার-কামনায় অধীরা উলিয়ানা তাকে আদরে আদরে সিক্ত শান্ত করে তোলে। দীর্ঘ সময় ধরে চলে এই আদরপর্ব। উত্তেজনা নিথর হয়ে এলে শহরের লোকদের সম্পর্কে খুঁটিনাটি সব খবর দিয়ে ইলিয়াকে উপদেশ দেয় কাদের সম্পর্কে সতর্ক হয়ে চলতে হবে, কে শয়তান, কে সাধু আর টাকাপয়সা কার কত আছে।

যেমন ধরো তোমার অনেক জ্বালানি কাঠ দরকার হবে জানতে পেরে ওরা কাছাকাছি বনগুলো কেনার চেষ্টা করছে। পরে তোমার কাছ থেকে চড়া দাম হাঁকবে।

ওরা বড় দেরি করে ফেলেছে। রাজামশাই অনেক আগেই ওগুলো আমার কাছে বিক্রী করে দিয়েছেন।

ওদের চারধারে এমনই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার যে একজন আরেকজনের চোখও পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না। ওরা কথাও বলছে যথাসম্ভব নিঃশব্দ ফিস-ফিসানিতে।

ইলিয়া অনুভব করে রাত্রে এই মহিলাটির সাহচর্য তাকে দেহে মনে আরো শক্তিমান করে তোলে। দিনের বেলায় কিন্তু মহিলাটির অন্য রূপ। ধীর, স্থির বুদ্ধিমতী গৃহিণী। শহরের লোক তার বুদ্ধিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে বিশেষ করে লেখাপড়া জানে বলে সমীহ করে।

একদিন সোহাগ উপভোগ করতে করতে ইলিয়া বললে, তোমার ভাবনা আমি বুঝতে পারি উলিয়ানা। আমরা ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিলাম কিন্তু তার আগে আমাদেরই বিয়ে করা উচিত ছিল।

তোমার ছেলেরা কিন্তু খুবই ভালো। যদি কোনোদিন আমাদের দেখেও ফেলে আমি জানি ওরা আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না। ভয় হয় যদি

শহরের লোক···

শিউরে ওঠে উলিয়ানা।

ইলিয়া বলে, ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না।

একদিন কৌতূহল দমন করতে না পেরে উলিয়ানা প্রশ্ন করে: একটা সত্যি কথা বলবে? তুমি একজনকে খুন করেছিলে তাই না? আচ্ছা তুমি তাকে স্বপ্ন দেখ না?

আনমনাভাবে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে ইলিয়া উত্তর দেয়: না, আমার ঘুম খুব গাঢ়, স্বপ্ন আমি দেখি না। তাছাড়া স্বপ্ন দেখবো কি করে? কি রকম দেখতে লোকটা তাই-ই জানি না। তিনজন লোক আমাকে পিছন থেকে আক্রমণ করেছিল তখন আমি লোহার ডাণ্ডা দিয়ে পর পর দুজনকে মারতেই তৃতীয়জন পালিয়ে যায়।

আহতকণ্ঠে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলে, নির্বোধেরা এসে তোমাকে আঘাত করবে আর তোমাকে কি না জবাবদিহি করতে হবে ভগবানের কাছে।

অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে, ইলিয়া কোনো কথা বলেনি।

ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

না।

তাহলে এইবার যাও। ভোর হতে আর দেরি নেই।

রাত্রিশেষের তরল অন্ধকারে সে বেরিয়ে আসে। নিজের জমির ওপর দিয়ে সে হাঁটতে থাকে। আরো কিছুদূর এগিয়ে কাঠের কুচির ওপর হাঁটতে হাঁটতে তার মন বলল, আলেক্সিকে আর একটু স্বাধীনতা দিলে ভালো হয় এতে ওর উচ্ছ্বাসের ফেনাটুকু শুকিয়ে যাবে। ছেলেটা একটু বেয়াড়া প্রকৃতির ঠিকই তবে মনটা ভালো।

বালির ঢিবির ওপর শুয়ে পড়ে ইলিয়া। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে সে। একসময় সবুজ রঙের আকাশে প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে সূর্য তার রশ্মি ময়ূরপুচ্ছের পালক সরিয়ে ফেলার মতো নিজেকে মুক্ত করতে করতে একটি স্বর্ণগোলক হয়ে দীপ্তি ছড়ায়।

কারখানার মজুররা জেগে উঠে দেখে ইলিয়া আর্টামনোভের লম্বা দেহটা মাটিতে পড়ে রয়েছে।

একজন আরেকজনকে দেখিয়ে বলে, ছাখো ছাখো।

চারদিকে পিঁপড়ের সারির মতো দলে দলে মানুষ হেঁটে যাচ্ছে, তাদের হৈ-হুল্লোড় কোনো কিছুই ইলিয়ার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না।

আকাশের দিকে তার মুখ, করাত চলার মতো তার নাক ডাকার শব্দ।

সাদা সার্ট আর নীল পাজামা পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে আলেক্সি। কাঠের কুচির ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে শব্দে পাছে বাপের ঘুম ভেঙে যায় তাই সে খুব সাবধানে তাকে গোল হয়ে ঘুরে পার হয়ে যায়। তারপর স্নান করতে চলে যায় এমন ভাবে যেন বাতাসে ভেসে চলেছে। আলো ফোটার অনেক আগেই নিকিতা বনে চলে গিয়েছে। রোজই সেখান থেকে সে দু গাড়ি বোঝাই পচা পাতার সার নিয়ে এসে যেখানে বাগান তৈরি হবে স্থির হয়েছে সেখানে ঢালে। এর মধ্যেই সে বার্চ, বার্ডচেরি, ম্যাপল্‌স গাছ রোপণ করে ফেলেছে। ছুটির দিনে টিখন ভায়ালোভ ওকে সাহায্য করে।

পিওতর কারখানা তৈরির কাজ দেখতে আসে। কাঠে করাতের দাঁত বসাবার আওয়াজ তার সঙ্গে র‍্যাদার ঘস ঘস, কুড়ুলের ঝপাঝপ শব্দ— প্রচণ্ড গতিতে কাজ চলেছে। শ্রমিকেরা গান গাইতে গাইতে কাজ করে। এক তরুণের গান শোনা গেল ঃ

বুড়ো জাখারি এসেছিল মেরীর কাছে
ঘুষি পাকিয়ে, হ্যাঁ বুড়ো জাখারি এসেছিল মেরীর কাছে···

পিওতর টিখনের দিকে ফিরে বলল, অশ্লীল গান।

গান গানই তার আবার শ্লীল অশ্লীল কি ?

কেন ?

গানেই ওদের প্রাণ, কথায় নয়।

পিওতর ভাবলে মজুরটাকে বোঝা ভার। তার মনে পড়ে গেল একটি ঘটনা। বাবা ওকে সুপারিন্টেনডেন্ট করে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু ও হাত-জোড় করে বলেছিল, না না, লোক খাটানো কাজ আমার দ্বারা হবে না। আমাকে মজুর হিসেবেই থাকতে দিন।

হেমন্ত এল, পরিবেশ স্যাঁতসেঁতে, ঠাণ্ডা। বাগানে, অরণ্যে সর্বত্রই মরচে ধরা লালের ছোপ লেগেছে। প্রতিদিন সকালে ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে আসছে শণ। পিওতরকেই এখন কাঁচামাল কিনতে হচ্ছে সবদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে। কারণ লোকগুলো খুবই ধূর্ত। কেউ হয়তো শণ ভিজিয়ে নিয়ে এসেছে ওজন বাড়াবার জন্যে, কারোর খারাপ জিনিস ভালোর দরে বেচার তাল। গুরুভার দায়িত্ব চাপায় পিওতরের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। আলেক্সির কাছে তো কোনো সাহায্যই পাওয়া যায় না। তার ধৈর্য বড় কম, সামান্য কারণেই চাষীদের সঙ্গে ঝগড়া লেগে যায়। বাবা তার ওপর দায়িত্ব

চাপিয়ে মস্কো গিয়েছেন, শাশুড়ীও তার সঙ্গে গিয়েছেন তীর্থ করার বাহানায়।

চা খাবার সময় কিংবা রাতে খাবার টেবিলে বসে আলেক্সি এখানকার লোকদের সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকে। আমি লোকগুলোকে দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

রোজ রোজ এই এক কথা শুনে পিওত্র বিরক্ত হয়। রেগে গিয়ে বলে, অহংসর্বস্ব লোকের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত তুমি। নিজের অহংকারে সকলকে তুমি উদ্বাস্ত করে তোল।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বলে, অহংকার করার মতো কিছু আছে বলেই করি। দুর্বিনীত দৃষ্টিতে সে ভাইদের ও ভাজের দিকে তাকায়। নাতালিয়া খুবই কম কথা বলে এবং তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। আলেক্সির মধ্যে এমন কিছু আছে যাকে সে ভয় পায়।

স্বামী ও আলেক্সি খেয়েদেয়ে কাজে বেরিয়ে গেলে নাতালিয়া তার সেলাই নিয়ে নিকিতার আশ্রমসদৃশ ঘরে চলে যায়। সেখানে জানলার ধারে বসে একটা ইজিচেয়ারে গিয়ে সে বসে। এখানে বসেই নিকিতা করণিকের কাজ করে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হিসেব লেখে। কিন্তু নাতালিয়া এলেই সে কাজ বন্ধ করে দিয়ে গল্প করতে লেগে যায়। রাজকুমার রাজকুমারীদের গল্প, এমনকি তাদের বাগানের ফুল ফোটা পর্যন্ত তার গল্পের বিষয়। তার মেয়েলী কণ্ঠস্বরে রয়েছে সহৃদয় অকৃত্রিমতা। নিঃসঙ্গ নাতালিয়া মাথা নিচু করে সেলাই করতে করতে কী যেন ভাবে। নিকিতার নীল চোখের দৃষ্টি কখনো কখনো নাতালিয়ার সুন্দর মুখখানি স্পর্শ করে জানলায় গিয়ে ঠেকে। ঘণ্টাখানেক কিংবা ঘণ্টা দুই তারা দুজনে কেউ কারো চোখের দিকে না তাকিয়ে এইভাবে গল্প করে যায়। যদিও খুব সতর্কভাবে চুরি করে সে মাঝে ভ্রাতৃজায়ার মুখের ওপর তার নীল চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। এই সব সময়ে সে যেন তার দৃষ্টির স্নিগ্ধ উত্তাপ দিয়ে তাকে সোহাগ করে। কুকুরের মতো বড় তার কান দুটি তখন লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। কদাচিৎ যখন চোখাচোখি হয়ে যায় নাতালিয়া তখন নিকিতার দৃষ্টির প্রতিদান দেয় রহস্যময় হাসিতে, দৃষ্টির মহৎ অনুকম্পায়। নিকিতার মনে হয় তার ভিতরের উত্তেজনা ধরা পড়ে গিয়েছে ভাজের কাছে। কখনো কখনো নিকিতার মনে হয় ওই হাসি এক আহত প্রাণেরই প্রকাশ। অপরাধবোধে সে তখন চোখ নামিয়ে নেয়।

বাইরে তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি। বৃষ্টির ছাঁটে গ্রীষ্মের উত্তাপ ডুবে যাচ্ছে। আলেক্সির চেঁচামেচি শোনা গেল বাইরে। ঝড়ের বেগে সে ঘরে এসে ঢুকল। তার জামাকাপড় ভেজা, টুপিটা মাথার পিছন দিকে ঝুলে পড়েছে। তবু তাকে বসন্তের দূত মনে হয়। হাসতে হাসতে সে বর্ণনা করতে থাকে কিভাবে কাঠ কাটতে গিয়ে টিখন হাতের একটি আঙুল কেটে ফেলেছে। আমার তো মনে হয় ও ইচ্ছে করেই আঙুল কেটে ফেলেছে। ওর যে বড় ভয় পাছে ওকে সৈন্যদলে যোগ দিতে হয়। আমি কিন্তু শুধু এখান থেকে চলে যাবার জন্যেই সৈনিক হতে রাজি।

বাচ্চা ভালুকের মতো আলেক্সি গজর গজর করতে থাকে। তারপর হঠাৎই বড় ভাইয়ের কাছে হাত পেতে বলে, আমাকে পনেরোটি কোপেকস্ দাও তো। শহরে যাবো।

কেন?

তা জেনে তোমার কি লাভ? তারপর সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সে বেরিয়ে যায়।

নাতালিয়া বলল, ও গোল্লায় যাচ্ছে। আমার বন্ধুরা ওলগোস্কা ওলোর্ভা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে ওকে প্রায়ই ঘুরতে দেখে। মেয়েটার বয়েস মাত্র চোদ্দ, মা নেই, বাপ মাতাল।

নাতালিয়াকে একথা বলতে দেখে নিকিতার ভালো লাগল না। সে লক্ষ্য করল নাতালিয়ার কণ্ঠস্বরে যেন ঈর্ষার ঝাঁঝ। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। পাইন এবং আরো অনেক গাছ যা তারই সৃষ্টি, দেখতে দেখতে সে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

পিওতর বউকে বলে, চা খাবার সময় হয়েছে।

না তো এখনো সময় হয়নি।

আমি বলছি সময় হয়েছে। চিৎকার করে ওঠে পিওতর। তারপর বউ চলে যেতেই সে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বাবা সব কাজ আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন। সারাটা দিন আমি চরকির মতো ঘুরে বেড়াই, কি যে করছি সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই। এর ওপর কাজে কোথাও সামান্য খুঁত দেখলেই বাবা আমাকে একহাত নেবেন।

সতর্ক ভঙ্গিতে নিকিতা আলেক্সি ও ওলোর্ভার ব্যাপারটা বড় ভাইয়ের গোচরে আনতে চায়। পিওতর রেগে গিয়ে বলে, ছাখো মেয়েদের সম্পর্কে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। নিজের বউকেই আমার দেখার সময় নেই, তাকে দেখি শুধু ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে। দিনের বেলায় আমি পেঁচার

মতো অন্ধ হয়ে থাকি। আর তোমার মাথায় যতো সব আজেবাজে চিন্তা। ফ্যাক্টরী চালানোর উপযুক্ত মোটেই আমরা নই। এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল স্টেপস্-এ গিয়ে চাষবাস করা। এখানে শুধু কথা আর কথা।

তাজা ঝকমকে হয়ে ইলিয়া ফিরে এল। সে দাড়ি ছেঁটেছে, তার কাঁধ হয়েছে আরও চওড়া, চোখের দৃষ্টিতে প্রাণোচ্ছলতা উপচে পড়ছে। সব মিলিয়ে তাকে দেখাচ্ছে যেন সদ্য ধার দেওয়া চকচকে লাঙ্গলের মতো।

সোফায় ভদ্রলোকের মতো গা এলিয়ে দিয়ে সে বক্তৃতার ঢঙে বলতে থাকে, আমাদের ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সৈনিকের মতো নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতায়। আমাদের সামনে প্রচুর কাজ, শুধু তোমরা নও, তোমাদের ছেলে ও নাতিদেরও করে যেতে হবে। আগামী তিনশো বছরেও কাজ শেষ হবে না। আর্টামনোভ পরিবারকে প্রমাণ করতে হবে তারা শ্রমশিল্পের অলঙ্কারস্বরূপ।

ছেলের বউকে এক নজরে দেখে নিয়ে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে, বাঃ বেশ তো বড়োসড়ো হয়ে উঠেছ। যদি ছেলে হয় তাহলে তোমাকে আমি একটা ভালো উপহার দেব।

সেদিন রাত্তিরে শুতে যাবার সময় নাতালিয়া স্বামীকে বলল, মন ভালো থাকলে বাবা কিন্তু চমৎকার মানুষ।

পিওতর তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, হ্যাঁ উপহার দেবেন যখন বলেছেন তখন তোমার কাছে তো উনি ভালো লোক হবেনই

দু তিন সপ্তাহ পরেই ইলিয়া আর্টামনোভের মুখ আবার থমথমে, গম্ভীর হয়ে ওঠে। একদিন নাতালিয়া নিকিতার কাছে জানতে চায়, বাবা সব সময় রেগে থাকেন কেন? নিকিতা বলে, কি জানি, বাবাকে বোঝা মুশকিল।

সেদিন বিকেলে চায়ের আসরে আলেক্সি দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, বাবা, আমাকে আপনি সৈন্যদলে ঢুকিয়ে দিন।

ইলিয়া রাগে কেঁপে কেঁপে বলল, কেন, কেন?

আমি এখানে থাকতে চাই না।

তবে চলে যাও। কিন্তু আলেক্সি দরজা পর্যন্ত পৌঁছতেই ইলিয়া চিৎকার করে ডাকল তাকে। থামো আলেক্সি! ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থেকে একসময় বলল, তোমাকেই ভাবতাম আমার সবচেয়ে

ভালো হাতিয়ার।

আমি এই জায়গার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছি না।

মিথ্যে কথা। এইটেই তোমার জায়গা। তোমার মা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন আমার ইচ্ছেমতো মানুষ করবো বলে।

আলেক্সি যেন পরাধীন তেমন ভাব করে দাঁড়িয়ে রইল। ইলিয়া তার কাঁধে সস্নেহ হাত রেখে বলল, তোমার সঙ্গে এমন নরম ব্যবহার করা বোধহয় আমার ঠিক হয়নি। আমার বাবা সব সময় আমার সঙ্গে ঘুষি পাকিয়ে কথা বলতেন। আচ্ছা এবার যাও। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার ডেকে বলল, তোমাকে অনেক বড় হতে হবে, বুঝেছ। ভবিষ্যতে যেন আর এমন ঘ্যান-ঘ্যানানি আমাকে শুনতে না হয়। আচ্ছা এবার তুমি যেতে পারো।

অনেকক্ষণ একা সে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে। ধূসর রঙের তুষার জমেছে বাগানে। জানলার বাইরে একসময় ভূগর্ভের মতো অন্ধকার ঘনিয়ে এল। সেখান থেকে সরে এসে সে শহরের দিকে পা বাড়াল। কাজ সেরে যখন সে ফিরল তখন উলিয়ানার উঠোনের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই সে জানলায় টোকা মারলো। উলিয়ানা দরজা খুলে দিল।

এত দেরি করলে কেন? উলিয়ানার কণ্ঠস্বরে চাপা অসন্তোষ।

উলিয়ানার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কোটটা খুলে ফেলে ঘরে ঢুকে সে টুপিটা ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর টেবিলে কনুই রেখে বসে শক্ত মুঠোয় নিজের দাড়ি চেপে ধরে উত্তেজিত ভাবে আলেক্সির কথা বলতে থাকে।

ও আমাদের রক্তের নয়। আমার বোনের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তার ফলেই ওর জন্ম। ছেলেটার মধ্যে এখন তারই লক্ষণ ফুটে বেরোচ্ছে।

উলিয়ানা উঠে দেখে এল দরজা ঠিকমতো বন্ধ করা হয়েছে কি না। তারপর ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল। অন্ধকার ঘরের এক কোণে আইকনের রূপোর পাদপীঠের নিচে একটি ক্ষীণ নীল বাতি শুধু জ্বলতে লাগল।

তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে দিয়ে দাও, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

হ্যাঁ তাই-ই দিতে হবে। তবে সমস্যা তো শুধু আলেক্সিকে নিয়েই নয়। পিওতরটারও তো কোনো কাজেই উৎসাহ নেই। সে কাজ করে বটে কিন্তু কাজটা যেন তার নিজের নয়। উৎসাহ নেই, উদ্দীপনা নেই। দাসমনোবৃত্তি এখনো সে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। যেন মালিকের কাজ করে যাচ্ছে তেমন

ভাব। নিকিতার সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। সে একে তো বিকলাঙ্গ তার ওপর বাগান ছাড়া তার মাথায় আর দ্বিতীয় চিন্তা নেই। আমি আশা করেছিলাম আলেক্সি আমার ব্যবসার উন্নতির জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

উলিয়ানা তাকে শান্ত করে তোলার চেষ্টা করতে থাকে। তুমি বড় তাড়াতাড়ি অধীর হয়ে পড়। একবার চাকা ঘুরতে দাও দেখবে তখন সবাই কাদার মতো নরম হয়ে গেছে।

উষ্ণ নিস্তব্ধ ঘরের নীলাভ ছায়ায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে তারা মাঝরাত্তির পর্যন্ত গল্প করল। ছেলেদের সম্পর্কে ক্ষোভ জানাতে গিয়ে শহরের লোকদের সম্পর্কে ইলিয়া তার বিরক্তি প্রকাশ করল। বলল, বড় ছোট মন ওদের।

ওরা তোমাকে পছন্দ করে না কারণ তুমি সফল মানুষ। আমরা মেয়েরা কিন্তু সফল পুরুষ মানুষ পছন্দ করি।

উলিয়ানা জানে অশান্ত পুরুষের মন কি ভাবে শান্ত করতে হয়।

ইলিয়া বলল, মস্কোতে দেখে এলাম ব্যবসা কী দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে। বাড়িতে লাগা আগুনের মতো।

একসময় সে উঠে দাঁড়ায়, তারপর উলিয়ানাকে জড়িয়ে ধরে বলে, উলিয়ানা তুমি যদি পুরুষমানুষ হতে!

উলিয়ানা তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতেই ইলিয়া তাকে কঠিন আলিঙ্গনে বেঁধে উত্তপ্ত চুম্বন এঁকে দেয় তার মুখে।

কয়েকদিন পরে এর্দানস্কায়া একটি শ্লেজ গাড়িতে করে আহত অজ্ঞান অবস্থায় আলেক্সিকে বাড়ি নিয়ে এল। সারা গায়ে আঘাতের দাগ, রক্তাক্ত, কাপড়চোপড় ছিন্নভিন্ন। কেউ তাকে বেদম প্রহার করেছে। অনেকক্ষণ ধরে নিকিতা ও নাতালিয়া ভড্‌কা দিয়ে তার সারা গা মালিশ করে দিল। আলেক্সি শুধু মাঝে মাঝে গোঙরায় কিন্তু মুখে তার একটিও কথা নেই। এদিকে আহত বুনো জানোয়ারের মতো ইলিয়া দাঁতে দাঁত চেপে ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অস্থির ভাবে পায়চারি করে চলেছে। কখনো জামার আস্তিন গোটাচ্ছে কখনো নামিয়ে দিচ্ছে।

আলেক্সির জ্ঞান ফিরতেই ইলিয়া তার মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, কে তোমার এই অবস্থা করেছে তার নাম বলো আমাকে।

কিন্তু আলেক্সি কথার জবাব দেবে কি, সে খানিকটা রক্তবমি করে গোঙাতে গোঙাতে শুধু বলল, আমায় শেষ করে দিন, আমি আর পারছি না।

এই দশা দেখে নাতালিয়া চিৎকার করে কেঁদে উঠল। ইলিয়া ধমকে

উঠল, এই, কান্নাকাটি করবে না, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। ইলিয়া ছেলেদের জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কি মনে হয় বাঁচবে ও ?

আটদিনের মাথায় আলেক্সি মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠল। আততায়ীর নাম বলতে সে রাজি নয়। এর্দানস্কায়া বলেছিল বাক্সায়ার ছেলে আরো দুজন সঙ্গী নিয়ে ওকে মেরেছে। আলেক্সি কিন্তু বলল, সে কারোকে দেখতে পায়নি। পিছন থেকে কেউ কোট ফেলে দিয়ে তার মুখ ঢেকে দিয়ে আঘাত করেছিল তাই সে আততায়ীদের দেখতে পায়নি। ইলিয়া বলল, যদি তুমি আমাকে নামগুলো জানাতে তাহলে আমি তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতাম। জানি না কেন তুমি গোপন করছো।

ইলিয়া আগের চেয়ে আরো বেশি করে কাজ করা শুরু করে দিল। ছেলেদের কাজে উৎসাহ দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। ছেলেদের উপদেশ দিল ঃ সব কাজ নিজে করবে আর কোনো কাজই হীন মনে করবে না। শুধু উপদেশ দেওয়া নয়, বন্য পশুর মতো তার এমন তীক্ষ্ণ বোধ যে কোথায় বাধা তাও যেমন সে সহজে বুঝতে পারে; সহজ উপায়ে কিভাবে সেই বাধা অতিক্রম করা যায় তাও সে বুঝতে পারে।

দু'দিন দু'রাত্তির নিদারুণ যন্ত্রণাভোগের পর নাতালিয়া একটি কন্যা সন্তান প্রসব করল। ইলিয়া হতাশ হয়ে বলল, মেয়ে কোন কাজে লাগবে ?

উলিয়ানা বলল, ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই করেন, তাঁকে ধন্যবাদ দাও।

ইলিয়া একজোড়া রুবি বসানো কানের দুল ও পাঁচটি রুবল্ নাতালিয়ার বুকের ওপর রেখে বলল, ছেলে না হলেও এগুলো তোমাকে উপহার দিলাম। তারপর ছেলের পিঠে হাত রেখে বলল, তুমি খুশি হয়েছ তো ? তুমি যখন হয়েছিলে আমি কিন্তু খুবই খুশি হয়েছিলাম।

পিওতর তাকিয়ে ছিল তার স্ত্রীর মুখের দিকে। রক্তহীন, ফ্যাকাশে যন্ত্রণায় বিকৃত সে মুখ। প্রায় চেনাই যায় না তাকে। প্রায় দু'দিন দু'রাত সে স্ত্রীর কান্না শুনেছে। প্রথমে সে খুব ভয় পেয়েছিল তারপর অতিষ্ঠ হয়ে ভুলে থাকার জন্যে সে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল কিন্তু তাতেও মুক্তি নেই কারণ ওই কান্নার ধ্বনি মস্তিষ্কের মধ্যেই প্রতিধ্বনিত হয়ে তাকে বিপর্যস্ত করে তুলল।

মেয়েটি কিন্তু বাঁচল না। জন্মাবার সময়ে বেশ ভারী ও মোটা হয়েছিল কিন্তু পাঁচ মাস বয়সে একদিন ধোঁয়ায় দম আটকে মারা গেল।

কবরস্থানে ইলিয়া ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, এতে কি এসে যায়? আবার ওর সন্তান হবে। আর এবার থেকে আমাদের কবরও এখানেই হবে তার মানে এখানেই আমাদের নোঙর ফেলা হল। যখন সব কিছুকে তোমার নিজের বলে ভাবতে পারবে, মাটির নিচের, মাটির ওপরের জিনিস যখন তোমার হবে তখনই বুঝবে একটা জায়গায় তোমরা স্থিতু হলে, সেই জায়গাটার ওপর তোমাদের অধিকার জন্মাল।

কবরস্থান থেকে ফেরার সময়ে আলেক্সি বলল, আমাদের একটা নিজস্ব কবরস্থান থাকা উচিত। মরার পরেও এদের মধ্যে থাকা অপমানকর।

ইলিয়া মৃদু হেসে বলল, হবে হবে সব হবে, একটু সবুর কর। আমাদের নিজস্ব গির্জা, কবরস্থান, হাসপাতাল, স্কুল, সবই হবে।

গুমোট গ্রীষ্মের শুরুতেই ওকা নদীর ওপারের জঙ্গলে আগুন লাগলো। দিনের বেলায় ঝাঁঝাল ধোঁয়ার মেঘ সোজা উঠে যায় আকাশের দিকে আর রাতে দীপ্তিহীন চাঁদের চেহারাটা কেমন লালচে দেখায় আর তারাগুলোকে মনে হয় তামার পেরেকের মাথার মতো। বিক্ষুব্ধ আকাশের ছায়া পড়ে নদীর জলে। নদীকে তখন আর নদী মনে হয় না, ঘন ধোঁয়ার স্রোত বলেই মনে হয়।

গরমটা খুব বেশি পড়ায় আর্টামনোভ পরিবারের লোকেরা রাতে খাওয়ার পর বাগানে ম্যাপেল গাছের নিচে বসে চা খেতো। সেদিন নাতালিয়া বডিসের ওপরকার বোতামগুলো খুলে দিয়ে সকলকে চা পারিবেশন করছিল। নাতালিয়ার বুকের চামড়ার মাখনের মতো রঙ দৃশ্যমান হয়ে উঠছিল। নিকিতা মাথা নিচু করে কাঠি দিয়ে ফাঁদ তৈরি করছিল। পিওতর তার কানের লতিতে হাত দিয়ে কিছু ভেবে চলেছে।

পিওতর একসময় ধীরে ধীরে বলল, মানুষকে চটিয়ে দিলে ফল ভালো হয় না, অথচ বাবা ঠিক সেই কাজটিই করে চলেছেন। অন্য ভাইয়েরা কোনো মন্তব্য করল না। আলেক্সি খুশখুশ করে কাশছিল। গলা উঁচু করে সে শহরের দিকে তাকিয়ে আছে যেন কিছু প্রত্যাশা করছে। এমন সময় বার কয়েক ঘন্টা বেজে উঠল শহরে। আলেক্সি চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, বোধহয় আগুন লেগেছে কোথাও।

নিকিতা বলল, মোটেই আগুন লাগার সঙ্কেত নয়, ওটা সময় জানাবার ঘন্টাধ্বনি।

আলেক্সি নীরবে উঠে চলে গেল। সে চলে যেতেই নিকিতা মন্তব্য করল,

ওর একটা আগুন-আতঙ্ক হয়েছে। কিছু ঘটলেই ভাবে আগুন লেগেছে।

নাতালিয়া বলল, ও আজকাল বড় বদমেজাজী হয়ে গেছে অথচ আগে কত হাসিখুশি ছিল।

পিওতর ভাই এবং বউ দুজনকেই তিরস্কার করল। ওর সম্পর্কে তোমরা দুজনেই অন্যায় করছো। দয়া দেখিয়ে ওকে অপমান করছো। তারপর বউকে বলল, চলো অনেক রাত হয়েছে শুতে যাই।

ওরা চলে গেল আর নিকিতা তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। যখন তারা দৃষ্টির সীমার বাইরে চলে গেল তখন সে নিজেও উঠে পড়ল এবং বাগানের মধ্যে গ্রীষ্মাবাসের সিঁড়িতে গিয়ে বসে পড়লো। গ্রীষ্মাবাসটি তৈরি হয়েছে একটি তৃণাচ্ছাদিত উঁচু ঢিবির ওপর। বেড়ার সামনে দাঁড়িয়ে দূরে শহরের সারি সারি বাড়ি, গির্জা, ঘড়িঘর আর আগুন লাগলে সতর্ক করে দেবার রক্ষিস্তম্ভ সবই দেখা যায়। একগাদা খড়ের ওপর ঘুমোবার জন্যে নিকিতা শুয়ে পড়ল।

ঢোলকের ওপর টান টান করে লাগানো চামড়ার মতো রাত্রির স্তব্ধতাও পৃথিবীর সঙ্গে যেন সেইভাবেই লেপ্টে আছে। ফলে সামান্যতম শব্দও অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। বালির ওপর দিয়ে কেউ হেঁটে গেলেও শব্দ এসে শ্রুতিকে আঘাত করে। রাতের এই শব্দহীন মুহূর্তগুলোই নিকিতার জীবনের পরম সম্পদ। আনন্দের উৎস। নৈঃশব্দের রসঘন মুহূর্তেই নিবিষ্ট হয়ে সে নাতালিয়ার চিন্তা করতে পারে। মুক্ত বিহঙ্গের মতো তার কল্পনা তখন নিঃসীম আকাশে উড়ে যায়। তার পক্ষে অনুকূল এমন সব কল্পনার গভীরে সে ডুবে যায়। হঠাৎই দৈবের আনুকূল্যে প্রচুর ধনরত্নের মালিক হয়ে যায় সে। সবই সে পিওতরকে দান করে দেয়। বিনিময়ে পিওতর নাতালিয়াকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দান করে দেয় তাকে। এমনও হয় হঠাৎ এক দস্যুদলের দ্বারা আর্টামনোভ পরিবারের সকলেই আক্রান্ত হয়। নিকিতা অসীম সাহসিকতায় এবং পরাক্রমে দস্যুদলকে পরাস্ত করে সবাইকে নিশ্চিন্ত করে। তখন তার বাবা এবং ভাইয়েরা খুশি হয়ে পুরস্কার স্বরূপ নাতালিয়াকে তার কাছে অর্পণ করে। কিংবা মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে পরিবারের সকলেই মারা গেল, বেঁচে রইল শুধু দুজন—নিকিতা আর নাতালিয়া। তখন নাতালিয়াকে সে দেখিয়ে দেয় তার সুখ নিহিত রয়েছে এই নিকিতারই বুকে।

মাঝরাতের পর নিকিতা দেখল শহরের বাড়িগুলোর মাথার ওপর নিশ্চল মেঘের ওপর আর একখানা মেঘ আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। একটু পরেই

ওই মেঘ আলোকিত হয়ে উঠল লাল শিখার রূপ নিয়ে। আগুন লেগেছে বুঝতেই সে বাইরে বেরিয়ে এল। আলেক্সির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। আলেক্সি গোলাঘরের ছাদের ওপর উঠে এসেছে। চেঁচিয়ে বলল সে, আগুন!

তুমি কি আগে থেকেই জানতে নাকি যে আগুন লাগবে? আগের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় নিকিতা এ প্রশ্ন করল।

আলেক্সি বলল, তা কেন, এই সময়ে আগুন তো লেগেই থাকে।

নিকিতা বলল, আমাদের উচিত তাঁতিদের জাগিয়ে দেওয়া।

টিখন ওদের অনেক আগেই জাগিয়ে দিয়েছে, দেখছো না ওরা সবাই হৈ হৈ করে নদীর দিকে ছুটছে। ওখানে না দাঁড়িয়ে থেকে ওপরে উঠে এস।

নিকিতা অনুগতের মতো ছাদে উঠে আলেক্সির পাশে দাঁড়িয়ে বলল, নাতালিয়া না ভয় পেয়ে যায়।

তুমি কি পিওতরকে ভয় পাও, পাছে সে তোমার পিঠে আর একটি কুঁজ লাগিয়ে দেয়?

না, তা কেন?

তবে ওর বউয়ের মুখের দিকে অমন হাঁ করে তাকিয়ে থেক না।

অনেকক্ষণ নিকিতা কথা বলতে পারল না। তার মনে হচ্ছিল সে বুঝি ছাদ থেকে গড়িয়ে পড়বে। তারপর আমতা আমতা করে বলল, তুমি কি বলতে চাইছিলে? তুমি যদি ভেবে থাক···

ঠিক আছে, ঠিক আছে ও নিয়ে আর কিছু বলতে হবে না। শুধু বলছি কারোকে ভয় পেও না।

আলেক্সি আগুনের লকলকে শিখার দিকে তাকিয়েছিল। উত্তেজিত হয়ে বলল, বাক্সির বাড়ি পুড়ে যাচ্ছে। ওদের উঠোনে কুড়িটা আলকাতরার ব্যারেল রয়েছে তাই অমন দাউ দাউ করে জ্বলছে। পাশে বড় বাগান থাকায় প্রতিবেশীদের বাড়িতে আগুন ছড়াবে না বলেই মনে হয়। তবে অগ্নিকাণ্ড বেশ বড় ধরনের তাতে সন্দেহ নেই।

নিকিতা মনে মনে ভাবছিল সে এবার মঠে চলে যাবে। এখানে আর ভাল লাগছে না তার।

ঘুম-ঘুম চোখে পিওতরের হাঁকডাক ও টিখনের উত্তর দেওয়া শোনা যাচ্ছিল। নাতালিয়া জানলার সামনে দু হাত আড়াআড়ি রেখে দাঁড়িয়েছিল। নিকিতা ছাদেই বসে রইল। আগুন না নেভা পর্যন্ত। এক সময় জ্বলন্ত

কাঠগুলো সোনার মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল। তারপর সে নিচে নেমে এসে উঠোনের দরজা খুলে বেরোতেই বাপের সঙ্গে লাগল তার ধাক্কা। ইলিয়ার কোট ছেঁড়া, মাথায় টুপি নেই, ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছে সে। রুক্ষস্বরে নিকিতাকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ তুমি? পরক্ষণেই খোলা ছাদে আলেক্সিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার মেজাজ দপ করে জ্বলে উঠল। চিৎকার করে বলল সে, নিচে নেমে এস শীগগির! নিজের শরীরে ওপর লক্ষ্য নেই, মূর্খ কোথাকার!

আলেক্সিকে নিয়ে ইলিয়া নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। নিকিতা বারান্দায় বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে সে বাবার উত্তেজিত চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

—তুমি কি নিজের সর্বনাশ করে আমারও মাথা হেঁট করে দিতে চাও?

আলেক্সি মিনমিনে সুরে বলল, আপনিই আমাকে এই পথে ঠেলে দিয়েছেন।

চুপ করো। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে লোকটার মুখ চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেল।

পরের দিন চায়ের টেবিলে ইলিয়া বাক্সির বাড়ি পুড়ে যাওয়ার ঘটনার কারণ জানাল। কাজটা করেছে মাতাল ঘড়ি সারানোর কারিগর। তাকে অবশ্য যথেষ্ট মারা হয়েছে হয়তো মরেই যাবে। বাক্সির ছেলে ওকে শোষণ করে করে দেউলিয়া করে দিয়েছে সেই রাগেই···। নোংরা ব্যাপার সব!

আলেক্সি তাড়াতাড়ি দুধ খেয়ে নিয়ে সরে পড়ল। নিকিতার মনে হল তার হাত দুটো ভীষণ ভাবে কাঁপছে। হাত দুটোকে সে দুই হাঁটুর মাঝখানে রেখে শক্ত করে চেপে ধরল। ইলিয়া বলল, তুমি ওরকম করছো কেন?

শরীরটা ভালো নেই।

তোমাদের সকলেরই শরীর খারাপ। শরীর ভালো শুধু আমার।

রাগ করে চা না খেয়েই ইলিয়া বেরিয়ে গেল।

আর্টামনোভদের ব্যবসার ব্যাপ্তিতে আকৃষ্ট হয়ে কারখানার আশেপাশে গড়ে উঠল বিশাল বসতি। কারখানা থেকে কিছুটা দূরে ছোট ছোট হিদার গাছে ঢাকা পাহাড়ের গায়ে বিস্তীর্ণ জমিতে অসংখ্য খুপরি গজিয়ে উঠল। দূর থেকে দেখলে মনে হয় অনেকগুলো মৌমাছির চাক যেন জড়ো হয়েছে এক জায়গায়। অবিবাহিত এবং পরিবারহীন মজুরদের জন্যে ইলিয়া লম্বা ব্যারাক করে দিয়েছে। ব্যারাকের এক দিকের ছাদ ঢালু, জানলাগুলো

ছোট ছোট, তিনটে চিমনি উঠে গিয়েছে আকাশে। ব্যারাকটা দেখতে ঠিক আস্তাবলের মতো। মজুররা তাই ব্যারাকটার নাম দিয়েছে 'অশ্বপ্রাসাদ'।

ইলিয়া আর্টামনোভের হাঁকডাক এবং অহংবোধ বাড়লেও ধনীদের মতো চালচালিয়াতি তার হয়নি। মজুরদের সঙ্গে তার ব্যবহার অত্যন্ত সহজ, সরল ও হার্দ্য। তাদের উৎসবে, ক্রিয়াকর্মে সে তাদের ধর্মপিতার মতো সাহায্য করে, ছুটির দিনে বুড়ো তাঁতিদের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে গল্প করে, তাদের উপদেশ দেয়, উপদেশ গ্রহণ করে। বুড়ো চাষীরা মালিকের ব্যবহারে, চাষবাস সম্পর্কে তার জ্ঞান দেখে এতই খুশি যে তারা বলাবলি করত, এই মানুষের উন্নতি হবে না তো কার উন্নতি হবে?

ইলিয়া ছেলেদের বোঝাত, ছ্যাখো গ্রামের এইসব কৃষক মজুররা শহরের লোকের তুলনায় অনেক বুদ্ধিমান, অনেক সৎ। শহরের লোকেরা শরীরে-মনে দুর্বল, লোভী এবং ভীতু। বড় ধরনের স্থায়ী কিছু তারা গড়ে তুলতে পারে না। যা করে সবই অকিঞ্চিৎকর এবং ক্ষণস্থায়ী। কৃষকরা কিন্তু নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধির গণ্ডির বাইরে কখনই যায় না। ওরা তিনটি জিনিস বোঝে—রুটি, ঈশ্বর আর জার। সত্যিই ওরা বড় সরল, ওদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিশো। পিওতর, তুমি ওদের সঙ্গে কাজের কথা ছাড়া আর কিছুই বল না, তাও অত্যন্ত নিষ্প্রাণ ভাবে। এতে কোনো কাজ হয় না। কাজের বাইরের কিছু তুচ্ছ কথা, কিছু রঙ্গরসিকতা যদি করতে তাহলে ওরা এতদিনে তোমার অনেক কাছের মানুষ হয়ে উঠতো। মনে রেখো, সরস ব্যক্তিত্ব অনেক সুবোধ্য।

স্বভাব অনুযায়ী নিজের কান টানতে সে বলল, রঙ্গরসিকতা আমার আসে না।

তোমাকে শিখতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। রসিকতার কথা বলতে লাগে এক মিনিট কিন্তু তার রেশ থেকে যায় কয়েক ঘন্টা। আলেক্সি তো লোকের সঙ্গে মিশতেই চায় না, সে শুধু দোষ খুঁজে বেড়ায় আর বকাবকি করে।

আলেক্সি রুক্ষভাবে বলে, ওরা সবাই জোচ্চোর, অলস।

ওদের সম্পর্কে তুমি অনেক কিছু জানো, তাই না? রাগে চিৎকার করেই সে বলল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আলেক্সি সম্পর্কে একটা কথা মনে পড়ে যেতেই তার হাসি পেল। পাছে তার হাসিমুখ ছেলেদের চোখে পড়ে তাই সে এক হাত দিয়ে মুখ ঢেকে দাড়ি চুলকোতে লাগল। তার মনে পড়ে গেল কবরস্থান নিয়ে শহরের লোকদের সঙ্গে বিরোধের সময় কী নির্ভীক বুদ্ধিমত্তার দরুন আলেক্সি তার মোকাবিলা করেছিল। ড্রায়ামোভের ভগ্ন-

লোকেরা তাদের কবরস্থানে মজুরদের কবরস্থ করায় আপত্তি জানিয়ে ছিল। ইলিয়াকে তখন বেশ কিছুটা জমি কিনে নিজেদের কবরস্থান তৈরি করতে হয়েছিল।

টিখন ভারিক্কী চালে মন্তব্য করেছিল, কবরস্থান মানে হচ্ছে বিশ্রামের স্থান। সত্যিকার বিশ্রামের স্থান কিন্তু মানুষের ঘরবাড়ি। আমরা কখনই কোনো জিনিসের যথার্থ নাম দিই না।

নিকিতা লক্ষ্য করতো টিখনের কাজের ধরনটি বড়ই নিপুণ। হঠাৎ গুরুগম্ভীর কথা বলার চাইতে পরিশ্রমেই তার বুদ্ধি খোলে বেশি। বাবার মতোই সেও সহজে বুঝে যায় কোথায় আঘাত করলে সহজেই কাজটা হয়ে যাবে। সেই দুর্বল স্থানটিতে আঘাত করে সে সহজেই জিতে যায়। তবে বাবার সঙ্গে টিখনের তফাতও আছে। বাবা করেন উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে, অন্যদিকে টিখন কাজ করে অন্যকে অনুগ্রহ করার জন্যে। সে জানে অনেক বড় ধরনের কাজ করার যোগ্য সে। যখন কথা বলে তার মধ্যেও থাকে অন্যের প্রতি অনুগ্রহ ও ঔদাসীন্য। অথচ ওর কথা বলার ভঙ্গিটি কিন্তু সুন্দর।

টিখনের কথা শুনে নিকিতা কিছুটা ভয় পায়, বিরক্ত হয় আবার অনুগ্রহও অনুভব করে। তুমি অনেক কিছু জানো,—নিকিতা বলল টিখনকে।

টিখন নির্লিপ্ত স্বরে বলল, শেখার জন্যেই তো বেঁচে আছি। আমি জানি এতে কারো কোনো ক্ষতি নেই কারণ আমার জ্ঞান আমি নিজের মধ্যেই আবদ্ধ রাখি। কৃপণের মতো আমার জ্ঞানের ধন আমি সিন্দুকে তালা দিয়ে রেখেছি। কারোকে দেখতে দিই না। অতএব তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।

টিখনের লোকচরিত্র অনুধাবন করার ক্ষমতা দেখে নিকিতা অবাক হয়ে যায়। সে তার পাখির মতো চোখ দিয়ে পিট পিট করে তাকিয়েই লোকের একেবারে ভিতরের কথা টেনে বার করে আনে। নিকিতার এক-একবার মনে হয় লোকটা যদি তার হাতের আঙুল না কেটে জিভটা কেটে ফেলতো তাহলে ভালো হতো। টিখন সম্পর্কে যেমন তার কৌতূহল তেমনি ভয়। পিওতর, আলেক্সি ও তার বাবা টিখনকে বোকা ভাবে কিন্তু নিকিতার ধারণা তা নয়।

একদিন বন থেকে দুজনে কাঠ কেটে ফিরছিল। হঠাৎ-ই টিখন বলল, তুমি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছো কেন? তুমি ওঁকে বলে তো দেখতে পারো।

উনি হয়তো দয়া করলেও করতে পারেন। মনে তো হয় ওঁর মনে বেশ দয়ামায়া আছে।

নিকিতা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হচ্ছিল হৃদযন্ত্রের কম্পন বুঝি তার স্তব্ধ হয়ে গেছে। পা দুটো যেন পাথর হয়ে গিয়েছে, চলার ক্ষমতা আর নেই। অনেক চেষ্টা করে তোতলাতে তোতলাতে সে বলল, কি বলব তাকে আমি ?

টিখন তার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল। নিকিতা বন থেকে তুলে আনা বার্চের চারা গাছটা কাঁধ থেকে ফেলে দিল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল গালের হাড় উঁচু ওই লোকটার মুখে ঘুষি মেরে ফাটিয়ে দেয় কিন্তু টিখন অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে। সে আবার তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল, যদি উনি দয়ালু নাও হন তবু ঘণ্টাখানেকের জন্যে ভান তো করতে পারেন। মেয়েদের কৌতূহল অনেক বেশি। প্রত্যেকেই ওরা জানতে চায় অন্য পুরুষমানুষটি কেমন। চিনির চাইতে মিষ্টি কি না। আমরা পুরুষেরা বেশি কিছু চাই না। তুমি শুধু শুধুই শুকিয়ে যাচ্ছ। চেষ্টা করে একবার বলেই দেখ না। হয়তো উনি রাজি হয়ে যেতে পারেন।

নিকিতার মনে হল বন্ধুসুলভ করুণাতেই টিখন তাকে এই পরামর্শ দিল। তার কেউ বন্ধু হতে পারে এ ধারণা তার ছিল না। একদিকে এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতায় সে যেমন অভিভূত হয়ে গেল তেমনি লজ্জায় তার গাল গোলাপের মতো রাঙা হয়ে উঠল। তার মনে হল টিখন তার মনের একেবারে মূল থেকে সব কথা টেনে বার করে তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দিয়েছে।

নিকিতা বলল, তুমি বড় আজেবাজে কথা বলো।

টিখন নিকিতার কাঁধে বন্ধুত্বের হাত রেখে বলল, আমাকে শুধু শুধু ভয় পেয়ো না। আমি সত্যিই তোমার জন্যে দুঃখিত। তুমি একজন খাঁটি সুন্দর মানুষ। আর্টামনোভ পরিবারের সবাই অত্যন্ত স্বার্থপর, ভয়াবহ। তুমিই শুধু ব্যতিক্রম। কুঁজ থাকলে কি হবে তোমার মন অনেক ভালো।

নিকিতার ভয় এতক্ষণে দুঃখে পরিণত হয়েছে। তার চোখের সামনে এখন অনেক কিছুই যেন সাঁতরে বেড়াচ্ছে। মাতালের মতো টলায়মান অবস্থা এখন তার। ইচ্ছে হচ্ছে এখানেই শুয়ে পড়ে কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম নেয়। কাতর কণ্ঠে সে টিখনকে বলল, ভবিষ্যতে আর এ নিয়ে কোনো কথা বলো না।

আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি আমার জ্ঞান আমি সিন্দুকে বন্ধ

করে রেখেছি।

ভুলে যাও বন্ধু। ব্যাপারটা আর কারো কাছে যেন প্রকাশ না পায়। না, ভদ্রমহিলাকে আমি কিছুই বলব না, আর বলার আছেই বা কী?

বাড়ি ফেরার পথে দুজনের মধ্যে আর কোনো কথাবার্তা হলো না। সেদিনের পর থেকে নিকিতার একটা ভাবান্তর স্পষ্ট লক্ষ্য করা গেল। খুবই কম কথা বলে সে আজকাল। তার এই পরিবর্তন নাতালিয়ার দৃষ্টি এড়াল না। সে একদিন প্রশ্ন করে বসলো, তোমাকে আজকাল খুবই বিষাদগ্রস্ত দেখায়।

অনেক কাজ আমার। বলেই নিঃশব্দে বিদায় নেয়।

নিকিতার নির্লিপ্ত ব্যবহারে নাতালিয়া অপমানিত বোধ করে। শ্বশুর-কুলের এই একজনই তার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। এই প্রথম নয়, কিছুদিন ধরেই নাতালিয়া লক্ষ্য করছে নিকিতা আর তার প্রতি সদয় নেই। তার জীবনযাত্রার ধারা এতই একঘেয়ে যে বিরক্তি ধরে গেছে তার। চার বছরের মধ্যে সে দুটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে এবং আবার সন্তানসম্ভবা হয়েছে। তার ওপর শ্বশুরের ক্ষুব্ধ মন্তব্যে তার অশান্তি শতগুণে বেড়ে যায়।

—তোমার খালি খালি মেয়ে হয় কেন? এদের কোন্ কাজে লাগবে আমার? দ্বিতীয় কন্যার জন্মের সময়ে শ্বশুর এই মন্তব্য করেছিল এবং তিনি উপহার দিতেও ভুলে গিয়েছিলেন।

ছেলেকে ইলিয়া একদিন বলেছিল, নাতনীতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমার প্রয়োজন নাতির। নাতনীদের জামাইরা অর্থাৎ বাইরের লোকেরা এসে আমার ব্যবসায় ভাগ বসাবে এ আমি চাই না।

শ্বশুরের কথাতে সে বুঝেছে মেয়ে হবার জন্যে তাকেই একমাত্র দায়ী করা হচ্ছে। সে এও বুঝেছে স্বামীও তার প্রতি সন্তুষ্ট নয়। শয্যায় স্বামীর পাশে শুয়ে সে জানলা দিয়ে দূরের আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা জানাত, হে ভগবান আমায় একটি ছেলে দাও।

তবু এক এক সময় তার ইচ্ছে হয় যে স্বামী শ্বশুরকে শুনিয়ে বলে, আমি ইচ্ছে করেই এ কাজ করছি। তোমাদের শত্রুতা করার জন্যেই তো বার বার মেয়ের জন্ম দিচ্ছি।

এক এক সময় তার মনে হয় অপ্রত্যাশিত আশ্চর্য রকম কোনো কাজ সে করে ফেলবে যাতে সকলেই তার প্রতি সদয় হয়ে উঠবে অথবা এমন ভয়ঙ্কর কিছু করবে যাতে সকলে তাকে ভয় করবে কিন্তু ভালো কিংবা খারাপ কোনো কাজের কথাই সে ভেবে উঠতে পারে না

ভোরে উঠেই সে রান্নাঘরে চলে যায় প্রাতরাশ তৈরির জন্যে পাচককে সাহায্য করতে। এরই মাঝে একবার সে ওপরে উঠে যায় শিশুকে দুধ খাওয়াতে। তারপর প্রাতরাশ সাজিয়ে শ্বশুর স্বামী ও দেওরদের পরিবেশন করে। তারপর সে কিছুক্ষণ সেলাই করে, প্রত্যেকের ছেঁড়া জামাকাপড় রিপু করে অথবা জোড়াতালি লাগায়। দুপুরে খাওয়ার পর বিকেলের চা খাওয়ার আগে পর্যন্ত বাগানে বসে থাকে শিশুদের নিয়ে।

সামান্যক্ষণের জন্যে নিকিতা দেখা দেয়। এই একজন, যাকে এক সময় তার প্রতি সদয় মনে হতো। কিন্তু আজকাল তাকে বসতে বললে অপরাধী-অপরাধী মুখ করে বলে, অনেক কাজ পড়ে আছে, একটুও বসার সময় নেই। ক্ষমা করো আমায়।

আজকাল তার ধারণা হয়েছে এই কুঁজওলা লোকটা কোনোদিনই তার প্রতি সদয় ছিল না। সহৃদয়তার ভান করে আসলে সে পিওতরের গোয়েন্দার কাজ করে, তার ওপর নজর রাখে। শুধু তার ওপর নয় একই সঙ্গে আলেক্সি ও তার প্রতি। আলেক্সিকে সত্যিই সে ভয় পায় কারণ সে তাকে আকৃষ্ট করে। সুপুরুষ দেওরটি সত্যিই যদি তাকে কোনোদিন কামনা করে তবে প্রতিরোধ করতে সে পারবে না। কিন্তু আলেক্সি তার দিকে ভালো করে তাকায়ই না, বেশ বিরূপতাও বোঝা যায়। এতেও দুঃখ পায় সে।

বিকেল পাঁচটায় তাদের চা খাওয়া হয়, রাত আটটায় রাতের খাওয়া। তারপর সে বাচ্চাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। শোওয়ার আগে অনেকক্ষণ প্রার্থনা জানায়—ভগবান আজই যেন আমার গর্ভে পুত্র সন্তানের বীজ রোপণ হয়। কামনায় অধীর তার স্বামী বলে, হয়েছে হয়েছে এবার শোবে এস। তখন মাঝপথেই প্রার্থনা থামিয়ে সে স্বামীর পাশে এসে শুয়ে পড়ে।

গভীর রাতে কোনো কোনো দিন বাচ্চাদের কান্নায় তার ঘুম ভেঙে যায়। তাদের ঘুম পাড়িয়ে সে জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়। বাগানের দিকে, আকাশের দিকে তাকিয়ে শব্দহীন রাতের নিস্তব্ধ পরিবেশে চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে যায়। তার নিজের সম্পর্কে, শ্বশুর স্বামী এবং আরো অনেক কিছু যা আজ সারাদিনে ঘটেছে সেই সব নিয়ে চিন্তা করে।

প্রথমে তার মনে পড়ে নিকিতার কাছে শোনা রক্তহিম করা সেই সব গল্প যেমন তাতারদের হাতে বন্দিনী নারীদের দুর্দশার কাহিনী। সুখী মানুষের গল্পও নিকিতা অনেক শুনিয়েছিল কিন্তু আজ তার সেইসব গল্পই বেশি করে মনে পড়ছে যাতে মনে দুঃখের সুর বেজে ওঠে।

মাঝে-মধ্যে যাওয়া-আসার পথে কিংবা ঘরের মধ্যে শ্বশুরের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। তিনি তখন নির্লজ্জভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ওর বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত জরিপ করে মুখ দিয়ে এমন বিরক্তিসূচক শব্দ করেন যে ঘেন্নায় তার গা রি রি করে ওঠে। স্বামীর ব্যবহারও নিষ্প্রাণ ও নিরস। মাঝে মাঝে তার কুশ্রী মুখে এমন ভ্রূকুটি করে যে নাতালিয়ার তার পাশে গিয়ে শুতেই ভয় লাগে।

মাঝে মাঝে মা তাকে দেখতে আসে। মায়ের চোখে খুশির ঝলক ও তার স্বাধীন জীবনযাত্রা দেখে নাতালিয়ার হিংসে হয়। মায়ের প্রতি ঈর্ষা আরো কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে যখন সে দেখে তার চাষাড়ে স্বভাবের শ্বশুর প্রণয়িনীর দিকে কামার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসিঠাট্টায় মশগুল হয়ে ওঠে। মা তখন কোমর দুলিয়ে নির্লজ্জ ভঙ্গিতে প্রণয়ীকে তার রূপ দেখায়, ছলা-কলায় মনোহারিণী হয়ে ওঠার কতই না প্রয়াস তার। মায়ের সঙ্গে ইলিয়া আর্টামনোভের অবৈধ সম্পর্কের কথা শহরের লোক অনেক আগেই জেনে গিয়েছে, তারা মাকে শুধু নিন্দেমন্দই করত না, এড়িয়েও চলতো। অভিজাত পরিবারের মেয়েদের অনেকেই নাতালিয়ার বন্ধু ছিল, তাদের এ বাড়িতে আসা বন্ধ হয়ে গেল। চরিত্রহীনার মেয়ে, কোথাকার এক অপরিচিত লোকের ছেলের বউ ও গোমরামুখো অহঙ্কারী একটা লোকের বউ সে—এই তার পরিচয়। ফলে কুমারী জীবনে তার জীবনে যেসব ছোট ছোট সুখ, ছোট ছোট আনন্দ ছিল তাও তার জীবন থেকে হারিয়ে গেল।

তার মা আগে অকপট সহজ মানুষ ছিল আর এখন তিনি এমন ধূর্ত হয়ে উঠেছেন যে দেখে তার মন খারাপ হয়ে যায়। পিওতরকে যে উনি ভয় পান সেই সত্য ঢাকার জন্যে উলিয়ানা তার ব্যবসা-বুদ্ধির তারিফ করেন। আলেক্সির অবজ্ঞার দৃষ্টিকে নিশ্চয় আরো বেশি ভয় পান তাই তাকে দামী জিনিস উপহার দিয়ে খুশি করার চেষ্টা করেন। নিকিতাকে এক সময় তিনি পছন্দ করতেন কিন্তু এখন তার দিকে এমনভাবে তাকান যেন সে আর্টামনোভ পরিবারের কর্মচারী। মেয়েকে সাবধান করে বলেন, ওকে মোটেই প্রশ্রয় দিবি না, কুঁজোরা খুব ধূর্ত হয়।

মায়ের আচরণ সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন তিনি নাতালিয়ার দাম্পত্য-জীবনের গোপনীয় ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন করেন। এমন কি কেন তার ছেলে হচ্ছে না তা নিয়েও নির্লজ্জ সব প্রশ্ন। মায়ের কাছে স্বামীর রূঢ়তা নিয়ে অভিযোগ করতে গেলে তিনি বলেন, পুরুষেরা হচ্ছে মৌমাছি, আমরা হচ্ছি ওদের কাছে ফুল। আমাদের কাছে ওরা আসে মধু আহরণ করতে। একথা মনে রেখে

ধৈর্য ধরিস। পুরুষদের হাতেই তো সব। ওরা গির্জা গড়ে, কারখানা বানায়, একটা পোড়ো জমির ওপর তোমার শ্বশুর কী বিরাট কর্মকাণ্ড গড়ে তুলেছেন দেখলে তো নিজের চোখেই।

একদিন পিওতর বলল, তোমার মা খুব চালাক মেয়েমানুষ। বাবাকে কেমন বশ করে রেখেছেন। উনি কাছে থাকলে বাবাও আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন।

বাগানে কিংবা জানলার ধারে বসে সেলাই করার সময় এক একদিন নিকিতা ও টিখনের কথাবার্তা তার কানে ভেসে আসে। ঝোপের ওদিকে স্নানঘরের কাছে কাজ করতে করতে ওরা নানা বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ কথা বলে। নাতালিয়ার তখন মনে হয় প্রত্যেকেই কেমন নিশ্চয়তার সঙ্গে কথা বলে। প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো বিষয়ে জ্ঞান আছে। সোজা সরল শব্দ ঠিক ঠিক জায়গায় বসাতে পারলেই একটি বাক্য সুস্পষ্ট সত্যের সংজ্ঞায় প্রতিভাত হয়ে ওঠে। প্রতিটি মানুষই নিজের মতো করে কথা বলে, অন্য কারো মতো নয়। কথা দিয়ে তারা নিজেদের সাজায়। কথাকে খেলনার মতো করে খেলা করে তারা। কিন্তু খেলবার মতো কোনো কথা নাতালিয়ার নেই। তাই সে নিজের মনের কথা সাজিয়ে বের করে আনতে পারে না। ভাবনাগুলো হেমন্তের কুয়াশার মতো সব সময়েই তার নাগাল এড়িয়ে যায়। এইসব ভেবেই ক্ষোভে দুঃখে সে বলে ওঠে, আমি বোকা, আমি কিছু জানি না, কিছু বুঝি না।

'ভালুকটা যাদুকর, কোথায় মধু আছে ঠিক টের পায়'—টিখনের মন্তব্য কানে ভেসে আসতেই তার মনে হয়, বাঃ ঠিক বলেছে তো!

ভালুক প্রসঙ্গে তার মনে পড়ে আলেক্সি কী নির্মমভাবে তার সাধের পোষা ভালুকটিকে মেরে ফেলেছিল। আলেক্সিই ওকে ভড্‌কা খেতে শিখিয়েছিল। একদিন বেশি পরিমাণ খেয়ে ভালুকটা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। টিখনকে দিলে আঁচড়ে, নিকিতার উরুতে বসিয়ে দিল এক থাবা এবং মোরোজোব নামে এক মজুরকে মাটিতে ফেলে দিয়ে প্রায় শেষ করেই ফেলেছিল। আলেক্সি ধারালো কুড়ুল দিয়ে প্রথমে তার এক থাবায় পরে আর এক থাবায় আঘাত করল। ভালুকটা যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠে ছিটকে পড়তেই আলেক্সি তার ঘাড়ে মারল আর এক ঘা। ভালুকটার জন্যে সেদিন নাতালিয়ার খুবই দুঃখ হয়েছিল কিন্তু তার চেয়েও বেশি দুঃখ হয়েছিল তার অমন উৎফুল্ল, চালাক-চতুর, বীর দেওরটি তাকে একেবারেই আমল না দিয়ে একটি অপদার্থ মেয়েমানুষের পিছনে ঘুরছে।

ইলিয়া আর্টামনোভ বোধহয় বুঝতে পেরেছিল তার দিন ঘনিয়ে এসেছে। সেই কারণেই সম্ভবত অতি দ্রুত, দুরন্ত তৎপরতায় সে তার কারখানার ব্যাপক সম্প্রসারণে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সেন্ট নিকোলাসের উৎসবের কয়েক-দিন আগে তার দ্বিতীয় কারখানার জন্যে আর একটি স্টীম বয়লার এসে পৌঁছলো। বিরাট এক বজরায় করে বয়লারটাকে আনা হয়েছে। সেটি ভিড়েছে ওকা নদীর বালুকাময় তীরে এমন একটা জায়গায় যেখানে ভাটারাস্কার কর্দমাক্ত জল মন্থর গতিতে এসে ওকায় মিশেছে। এখন সব-চেয়ে মুশকিল কাজ হলো প্রায় সাড়ে তিনশো গজ বালির ওপর দিয়ে ওই বয়লারটাকে কারখানা পর্যন্ত টেনে আনা।

সেন্ট নিকোলাসের উৎসবের দিনে ইলিয়া মস্ত এক ভোজের আয়োজন করলো। নিমন্ত্রিত হয়ে এল কারখানার মজুরেরা। খাদ্যের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ভড্‌কা ও বীয়ার পরিবেশন করা হলো। কয়েকজন তরুণী উঠোনে টেবিল সাজিয়েছিল সুন্দর করে। ফার ও বার্চগাছের ডালাপালা দিয়ে ও নানা রঙের ফুলের স্তবক দিয়ে তারা টেবিল সাজিয়েছিল। মেয়েরা রঙ-বেরঙের পোশাক পরে এত সুন্দরভাবে সেজেছিল যে তাদেরও ফুল বলেই মনে হচ্ছিল। গৃহকর্তা বসেছেন বুড়ো তাঁতিদের ও তাদের পরিবারবর্গের সঙ্গে। রঙ্গরসিকতায় সবাইকে মাতিয়ে রেখেছিলেন তিনি। নিজেও তিনি প্রচুর পান করেছেন।

'বন্ধুগণ, আমরা তাহলে ভালভাবেই বেঁচে আছি, কি বল তোমরা? দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল ইলিয়া। সবাই যে তাকে তারিফ করছে এ সম্পর্কে সে বেশ সচেতন। সূর্যকরোজ্জ্বল বসন্তে পাইন ও বার্চ গাছ যেমন সোনার প্রদীপ তুলে ধরে আকাশের দিকে, সুগন্ধে ভরিয়ে দেয় বাতাস, ইলিয়ার উচ্ছলতাও আজ তেমনি বাঁধ ভেঙেছে। উৎসবের মেজাজ মানুষকে কিভাবে ভাসিয়ে দেয় ইলিয়া আর্টামনোভ যেন তারই দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে আজ খেটে খাওয়া মানুষদের কাছে।

বোরিস মরোজোভ নামে এক বৃদ্ধ তাঁতি তার শীর্ণ হাত দুটি দুলিয়ে উদ্দাম নৃত্যে মেতে উঠল। মনিবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তার মুখ দিয়ে বন্যার বেগে বেরিয়ে আসতে লাগলো।

ইলিয়া ভাসিলিয়েভ, আপনি একজন সত্যিকার খাঁটি মানুষ, আপনি দীর্ঘজীবী হোন। আপনি এমন এক মনিব যিনি কাজকে ভালবাসেন, কর্মীদেরও ভালবাসেন। আঘাত দেন না কারুকে। আমাদেরই ঝাড়ের গাছ আপনি। সাফল্য আপনার ধর্মপত্নী, উপপত্নী নয়। উপপত্নীরা ধ্বংসের

পথে নিয়ে যায় তারপর পরিত্যাগ করে। আপনার সব শক্তি নিয়ে এগিয়ে যান, ঈশ্বর আপনার সহায়।

ইলিয়া আর্টামনোভ এতই অভিভূত হয়ে গেল যে বৃদ্ধকে কোলে তুলে নিয়ে আবেগভরে তাকে চুমু খেয়ে ফেললো। —অনেক ধন্যবাদ জানাই তোমায়, তোমাকে আমি কারখানার সুপারিন্টেন্ডেন্ট করে দেব।

সমবেত অতিথিরা সরব হাসিতে ফেটে পড়লো। সেই বুড়ো তখনো হাত নেড়ে বলে যাচ্ছে, আপনি সকলের চাইতে আলাদা, আপনি কাজ করেন নিজের পদ্ধতিতে।

উলিয়ানা নির্লজ্জের মতো সকলের সামনেই আনন্দাশ্রু মুছতে লাগলো।

নাতালিয়া মায়ের কাছে এসে বলল, বাবা লোককে কী আনন্দই না দিতে পারেন!

মানুষকে আনন্দ দেবার জন্যেই ঈশ্বর এমন একজন মানুষকে পাঠিয়েছেন। উলিয়ানার কণ্ঠে খুশী আর গর্ব ঝরে পড়ছে।

ইলিয়া ছেলেদের ডেকে বলল, দেখো তোমরা কর্মীদের সঙ্গে এই ভাবেই ব্যবহার করবে। পিওতর, তোমাকেই বিশেষ করে বলছি।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে টেবিল সরিয়ে নিয়ে যাবার পর মেয়েরা ধরলো গান আর পুরুষেরা মেতে উঠলো কুস্তি আর দড়ি টানাটানির শক্তি প্রকাশের খেলায়। ইলিয়া সকলের সঙ্গেই যোগ দিল, কখনো নাচে, কখনো গানে, কখনো কুস্তিতে। ভোর পর্যন্ত চললো উৎসবের রেশ। সকাল হতেই ইলিয়া সব মজুরদের নিয়ে চললো নদীর ধারে বয়লার টেনে আনতে। দড়িদড়া রোলার কাঁধে নিয়ে হৈ হৈ করে তারা চললো ইলিয়ার নেতৃত্বে।

মুণ্ডহীন ষাঁড়ের মতো দেখতে, লালচে ভোঁতা দানবটাকে বজরা থেকে তীরে নামানো হলো। বালির ওপর পাটাতন পেতে রোলারগুলোকে সকলে মিলে সাজিয়ে দিল। তারপর বয়লারটাকে দড়ি বেঁধে তার ওপর টেনে আনলো সবাই সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। বয়লারটা গড়িয়ে চললো। নিকিতার মনে হয় দানবটার চোয়াল দুটো যেন লোকগুলোর শক্তি ও উৎফুল্ল উৎসাহের দিকে বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তার বাবা যদিও মদ্যপানে মাতাল হয়ে আছে তবুও তিনি সকলের সঙ্গে কাজে হাত লাগিয়েছেন। বয়লারটাকে টেনে আনার কাজে তিনি পূর্ণোদ্যমে কাজে লেগে গিয়েছেন। পরিশ্রান্ত কণ্ঠে তিনি মাঝেমাঝেই চিৎকার করছেন, অত জোরে নয় ভাই, অত জোরে নয়। হাতের তালু দিয়ে বয়লারের লাল রঙের দিকে চাপড় মেরে

তিনি বলছেন, চলো হে বয়লার, চলো।

কারখানা থেকে আর মাত্র একশো কুড়ি গজ বাকি এমন সময় বয়লারটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে ধীরে ধীরে সামনের রোলার থেকে গড়িয়ে বালিতে পড়লো মুখ থুবড়ে। নিকিতা দেখল একটা ধুলোর ঝড় উড়ে গিয়ে পড়ল তার বাবার পায়ের ওপর। রাগে সবাই ছুটে গেল বয়লারটার নিচে রোলার বসিয়ে দেবার চেষ্টায়। কিন্তু তারা ইতিমধ্যেই ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বয়লারটা সেই যে বালিতে মাথা গুঁজেছে তার আর ওঠার নাম নেই। লোকেরা যতই চেষ্টা করে তাকে তুলতে যায় সে যেন ততই মাটির গভীরে আশ্রয় নিতে চায়। মজুরদের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ইলিয়া সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছে, ভাইসব, আবার সবাই হাত লাগাও। হেঁইও!

অনিচ্ছায় বয়লারটা কিছুটা নড়েচড়ে মাটির আরো গভীরে ডুবে গেল। নিকিতা দেখল, মজুরদের ভীড়ের ভিতর থেকে তার বাবা কী রকম অদ্ভুত ভাবে যেন হেঁটে আসছেন। তার মুখের চেহারাও কেমন বিকৃত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে এক হাত দিয়ে গলাটা টিপে ধরছেন, অন্য হাত নাড়িয়ে অন্ধের মতো হাতড়ে এগিয়ে আসছেন। পিছনে সেই বুড়ো কান্নামেশানো চিৎকার করে বলছে, খানিকটা মাটি খেয়ে নাও।

নিকিতা ছুটে গেল বাবার কাছে। ইলিয়া তখন মাঝে মাঝে হিক্কা তুলছে আর থুথু ফেলছে। থুথুর মধ্যে রক্ত। নিস্তেজ গলায় সে শুধু বলল, রক্ত! তার মুখের রঙ বিবর্ণ, ভয়ে চোখ মাঝেমাঝে বুজে আসছে, আবার খুলছে, চোয়াল দুটো কাঁপছে, বিশাল চেহারাটা ভয়ে যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে।

আপনি কি আঘাত পেয়েছেন? নিকিতা জানতে চাইল।

মনে হচ্ছে গলার কোনো শিরা ছিঁড়ে গিয়েছে।

আবার খানিকটা রক্ত বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। বিভ্রান্ত হয়ে সে বলল, আবার রক্ত। উলিয়ানা কোথায়, তাকে ডাকো।

নিকিতা খবর দেবার জন্যে বাড়ির দিকে ছুটে যেতে চাইলো কিন্তু ইলিয়া জোরে তার কাঁধ চেপে ধরলো। তারপর নিকিতার কাধে ভর দিয়ে বালির ওপর দিয়ে পা টেনে টেনে চলতে লাগলো। বাড়ির কাছাকাছি হতেই বিভ্রান্ত স্বরে আবার বলে উঠল, এ আমার কী হলো? উলিয়ানা নাতালিয়ার সঙ্গে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, ইলিয়ার দিকে চোখ পড়তেই তার মুখ একবার ডান দিকে আর একবার বাঁ দিকে চাকার মতো ঘুরে একেবারে রক্তহীন হয়ে গেল।

কান্নার স্বরে সে বলে উঠল, শীগগির বরফ নিয়ে এস।

নিকিতা টিখনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, বরফ মানে তো জল, বরফ কি আর রক্তের স্থান পূরণ করতে পারে ?

ইলিয়াকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। অদ্ভুত গলায় সে বলে যাচ্ছে, এর মানে আমি কোনো ভুল করেছি। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা! ছেলেদের কাছে আমার শেষ আদেশ, উলিয়ানাকে মায়ের মতো দেখবে। শুনতে পাচ্ছো তো তোমরা? ঈশ্বরের দোহাই, উলিয়ানা, তুমি ওদের মায়ের মতো আগলে রেখো। বাইরের লোকদের ঘরের বাইরে চলে যেতে বলো।

উলিয়ানা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, আর কথা বলো না। একটুকরো বরফ ইলিয়ার মুখে পুরে দিয়ে সে আবার বলল, এখানে বাইরের লোক কেউ নেই।

বরফ গিলে ফেলে ইলিয়া আবার বলল, তোমরা কেউ আমার পাপের বিচারক নও, উলিয়ানাও দায়ী নয়। নাতালিয়া, তোমার ওপর আমি অনেক সময় অবিচার করেছি। কিছু মনে করো না। পিওতর ও আলেক্সিকে বলছি ভাইয়ে ভাইয়ে কোনোদিন ঝগড়া কোরো না, বন্ধুর মতো থেকো। আর আলেক্সি যে মেয়েটিকে তুমি ভালোবাসো তাকে তুমি বিয়ে করতে পারো।

পিওতর ডুকরে কেঁদে উঠল, বাবা, আমাদের ছেড়ে যাবেন না।

আলেক্সি তার পিঠে হাত রেখে ফিসফিস করে বলল, ও কথা কেন বলছো, আমার মনে হয় না···

নিকিতা বাবার পায়ের কাছে দাঁড়িয়েছিল যদি বাবার তার কথা মনে পড়ে। মাথার ধারে বসেছিল উলিয়ানা। কখনো সে ইলিয়ার কোঁকড়া চুল আঁচড়ে দিচ্ছে কখনো কস থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত মুছিয়ে দিচ্ছে তোয়ালে দিয়ে।

নেতিয়ে পড়া জিভ নেড়ে ইলিয়া আবার কোনোমতে বলল, পিওতর, তোমার ওপর অনেক দায়িত্ব, ভাইয়ে ভাইয়ে বিদ্বেষ থাকলে ব্যবসা মার খাবে।

যীশুর মতো দাড়ি, ঝুলে পড়া থুতনি, এক পুরোহিত এসে হাজির হলো। তাকে ইলিয়া বলল, একটু অপেক্ষা করুন, ফাদার। উলিয়ানা নিকিতার কথা মনে করিয়ে দিতে ইলিয়া বলল, হ্যাঁ, কোথায় সে? নিকিতার সঙ্গে তোমরা ভালো ব্যবহার করো।

ইলিয়ার শেষ কথা, আমার নিজের জমিতে আমাকে কবর দিও।

বিকেলের দিকে রক্তক্ষরণের ফলে ইলিয়া আর্টামনোভের মৃত্যু ঘটলো। সূর্য তখনো পৃথিবীর ওপর তার অজস্র কিরণের আশীর্বাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে। মাথা উঁচু করে শুয়ে আছে সে। প্রশস্ত মণিবন্ধ পরস্পরের ওপর স্থির হয়ে পড়ে আছে বুকের ওপর। উদ্বিগ্নতার ছাপ রয়েছে তার মুখে। মনে হয় অর্ধোন্মুক্ত চোখের দৃষ্টি বুঝি মণিবন্ধের ওপর ন্যস্ত।

নিকিতার মনে হলো তার বাবার মৃত্যুতে বাড়ির লোকেরা শোকাভিভূত বা আতঙ্কগ্রস্তের চাইতে বিস্মিতই হয়েছে বেশি। একমাত্র ব্যতিক্রম উলিয়ানা। ইলিয়ার শয্যাপার্শ্বে একটি চেয়ারে পাথরের মতো সে বসে আছে। অশ্রুহীন, স্তব্ধ। চারপাশে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন। তার চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ ইলিয়া আর্টামনোভের নিথর নিস্পন্দ মুখের ওপর।

অন্যদিকে পিওতরের হাবভাবে কর্মব্যস্ততার লক্ষণই বেশি করে প্রকাশ পাচ্ছে। বিসদৃশ ভাবে চিৎকার করে অত্যন্ত বেশি কথা বলছে সে। বাপের মুখের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে বুকের কাছে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলো তারপর ঘর থেকে সতর্ক ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল। তারপর তাকে দেখা গেল প্রথমে বাগানে, পরে উঠোনে। মনে হয় সে যেন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আলেক্সিকে দেখা গেল সৎকারের বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত। সে ঘোড়ায় চড়ে শহরে যাচ্ছে, আসছে। কিভাবে শব-শোভাযাত্রা পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ চাইতে আসছে উলিয়ানার কাছে।

পিতার জীবিতকালে নিকিতা কোনোদিন ভেবে দেখেনি বাবাকে সে ভালবাসে কিনা। বাবাকে সে ভয়ই পেত তবে তার কর্মোদ্যোগের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তার প্রতি বাবার স্নেহ ছিল বলে মনে হয়নি কোনদিন। কুঁজো ছেলেটা আদৌ বেঁচে আছে কি না সে খোঁজটুকুও তিনি নিতেন না। তবু ভাইদের মধ্যে সে-ই একমাত্র বাবাকে গভীরভাবে ভালোবাসতো। দুঃখের গভীরতায় সে হঠাৎই সচেতন হয়ে উঠলো, নিঃশ্বাস নিতেও যেন তার কষ্ট হচ্ছে। অন্ধকার ঘরের এক কোণে সে অপেক্ষা করছিল কখন প্রার্থনার মন্ত্র পড়ার তার পালা আসবে। উষ্ণ অন্ধকার ঘরে মোমবাতিগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন জ্বলন্ত হলুদ ফুল।

প্রার্থনার একঘেয়ে স্বর ছাপিয়ে মর্মভেদী আকুতিময় এক প্রশ্ন এসে বাজলো নিকিতার কানে।

হায় ভগবান, এও কী সম্ভব? উনিও মারা যেতে পারেন।

উলিয়ানার কণ্ঠস্বর। কণ্ঠস্বরে দুঃখের সুর এমন গভীর হয়ে বেজে উঠেছিল যে নান্ তার প্রার্থনা থামিয়ে বলে উঠলেন, হ্যাঁ বোন, উনি সত্যিই মারা গিয়েছেন। সবই ভগবানের ইচ্ছে।

নিকিতা আর সহ্য করতে পারল না। নানের ব্যবহারেও সে ক্ষুব্ধ। নিঃশব্দে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল উঠোনে। সেখানে টিখনের সঙ্গে দেখা। উঠোনের দরজার কাছে বসে একখণ্ড বড় কাঠ থেকে চোঁচ ভেঙে নিয়ে টিখন সেগুলোকে বালির মধ্যে পুঁতে দিয়ে পা দিয়ে এমন চাপ দিচ্ছে যাতে সেগুলো সম্পূর্ণ তলিয়ে যাচ্ছে। নিকিতা পাশে বসে অনেকক্ষণ তার কাজ দেখল। টিখনের এই উদ্ভট কাজ দেখে তার মনে পড়ে গেল সেই অদ্ভুত জীব, বাউণ্ডুলে আন্তোনুস্কার কথা। কালোকুষ্ঠি, খোঁড়া, পেঁচার মতো গোল গোল তার চোখ। অদ্ভুত এক খেলায় সে মেতে থাকত। বালির ওপর গোল গোল দাগ কেটে ছোট ছোট ডালপালা দিয়ে খাঁচা বানিয়ে তার মাঝখানে বসিয়ে দিতো। পরক্ষণেই পা দিয়ে খাঁচাগুলোকে ভেঙে দিয়ে উল্লাসে সুর দিয়ে বলতো: জেগেছেন যীশু···জেগেছেন তিনি। আর? রথ খুইয়েছে চাকা একটি।

মাথা নিচু করে কাজ করতে করতে টিখন বলল, অদ্ভুত ব্যবসা তাই না? ব্যবসা রইলো, তিনি গেলেন চলে।

মজুরটা আবার কি বলে বসবে সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি উঠে এল তার পাশ থেকে এবং এখন কি যে করবে ভেবে না পেয়ে আবার বাবার ঘরেই ফিরে এল। এবার নানের পরিবর্তে সে নিজেই প্রার্থনা মন্ত্র পড়তে শুরু করে দিল। নাতালিয়া কখন ঘরে প্রবেশ করেছে, সে টের পায়নি। হঠাৎই তার শোকার্ত কণ্ঠস্বর নিকিতার কানে এল। নাতালিয়া কাছাকাছি এলেই তার মনে হয় হয়তো এখনই সে অসাধারণ কিছু একটা করে ফেলবে কিংবা ভয়ংকর কিছু। এমনকি প্রার্থনার এই মন্ত্রোচ্চারণের মুহূর্তেও সে হয়তো এমন কিছু বলে বসবে যা সে কোনোদিনই বলতে চায়নি। তাই নিজেকে সংযত রাখার জন্যে, কুঁজটা উঁচিয়ে নিচুস্বরে সে মন্ত্র পড়ে যেতে লাগলো। নবম অধ্যায় থেকে যখন সে পাঠ করছিল তখন তার কানে ভেসে এল বিলাপরতা দুই মহিলার কণ্ঠস্বর।

দেখো, ওর ক্রুশটা আমি তুলে নিয়েছি, পরবো আমি।

মা, আমিও যে বড় একা।

নিকিতা তার কণ্ঠস্বর আরো তুলে ধরলো যাতে ওদের কথাবার্তা কানে না আসে তবু কিন্তু তার শ্রুতি জেগেই রইল শোনার অপেক্ষায়।

"ঈশ্বর হয়তো ওঁর পাপ ক্ষমা করবেন না…"

"আমি এক পাখির বাসায় একা পড়ে আছি…"

ভয় ও হতাশার একটি বাণী পড়তে পড়তে নিকিতার মনে পড়ে গেল একটি প্রবাদ বচন :

ভালো না বাসার দুঃখ একটি, ভালোবাসার দুঃখ দুটি। পরমুহূর্তেই কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে সে ভাবলে নাতালিয়ার দুঃখ যেন তার সামনে সুখের আশা-প্রদীপ হয়ে জ্বলছে।

বিকেলে বার্স্কি শহরের মেয়র ইয়াকভ ঝেইতেকিনকে নিয়ে শোক জানাতে এল। তারা বলল, শুনলাম তোমরা নাকি নিজেদের কবরস্থানে বাবাকে কবর দেবে। এভাবে নিজেদের তোমরা আলাদা করে রাখছো কেন? মনে হয় তোমরা যেন আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো বাস করতে চাও না।

আলেক্সি দাঁতে দাঁত ঘষে ভাইকে ফিসফিস করে বলল, ওদের চলে যেতে বলো।

যখন তাদের বলা হলো ইলিয়ার ইচ্ছানুযায়ীই ছেলেরা এ কাজ করছে তখন তারা এ ব্যাপারে আর উচ্চবাচ্য না করে উলিয়ানার সঙ্গে কথা বলতে গেল। একটু পরেই অবশ্য বোঝা গেল তাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য শোক জ্ঞাপন করা নয়।

ওই দুজন যখন উলিয়ানার সঙ্গে কথা বলছিল তখন উলিয়ানা চিৎকার করে বলল, ছেলেরা শোনো, এই দুজন আমার সাহায্য চাইতে এসেছেন যাতে তোমরা কারখানাটা বেচে দাও। আমাকে টাকাও দেবে বলছে।

আলেক্সি দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে রুক্ষস্বরে বলল, আপনারা এখুনি বেরিয়ে যান। মাথা হেঁট করে তারা চলে যেতেই উলিয়ানা বলল, এরা ওঁর স্মৃতিটুকুও মুছে ফেলতে চায়।

আলেক্সি রাগে গরগর করতে করতে বলল, বরং শয়তানী করবো কিংবা মাথা খুঁড়ে মরবো তবু ওদের মতো হতে পারবো না।

পিওতর বলল, কেনা-বেচার সময়টা এরা বেছেছে ভালো।

নাতালিয়া নিকিতার কাছে এসে বলল, তুমি কিছু বলছ না যে?

নাতালিয়াই শুধু তার কথা মনে রেখেছে এই ভেবে সে অভিভূত হয়ে গেল, খুশিতে তার মুখের রেখা নমনীয় হয়ে উঠল। মৃদুস্বরে সে বলল, শুধু আমি কেন…? তুমি আর আমি…

নিকিতার মন্তব্য নাতালিয়া খেয়াল করলো না। সে অন্য কাজে

চলে গেল।

ইলিয়া আর্টামনোভের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শহরের সব গণ্যমান্য লোকেরাই যোগ দিল। পুলিসের বড়কর্তা পিওতরকে বলল, 'রাজা গর্গি রাটস্কি তোমার বাবার সম্পর্কে আমার কাছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। সত্যিই তিনি সেই প্রশংসার যোগ্য ছিলেন।

সূর্যকরোজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ একটি দিন। কোথাও হলুদ, কোথাও সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে নানা শ্রেণীর মানুষ। বিশাল শব-শোভাযাত্রা দুটো বালিয়াড়ির মধ্যে মন্থর গতিতে জনতা চলেছে তৃতীয় বালিয়াড়ির দিকে। সেখানে ইতিমধ্যেই কয়েক ডজন ক্রুশ নীল আকাশের নিচে, একটা পুরোনো পাইন গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের নিচে মুক্তোর মতো চকচক করছে বালি আর মাথার ওপর ধ্বনিত হচ্ছে পুরোহিতদের প্রার্থনার ভাবগম্ভীর স্বর। শোভাযাত্রার একদম শেষে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে সেই বাউণ্ডুলে আন্তোনুস্কা। বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সরু কাঠি দেখলেই কুড়িয়ে নিয়ে বুকের কাছে রাখছে আর ছড়া কাটছে:

জেগেছেন যীশু···জেগেছেন তিনি। আর? রথ খুইয়েছে চাকা একটি।

ধার্মিক লোকেরা এই ছড়া কাটার জন্যে ওকে অনেক মারধোর করেছে, নিষেধ করেছে এই ছড়া না বলতে কিন্তু ওকে দমানো যায়নি। শেষ পর্যন্ত পুলিসের বড়কর্তা ওকে ধমক দিয়ে থামালেন।

ঝরনার জল দুর্বার গতিতে যেমন পাহাড় বেয়ে নেমে আসে একটি বছর তেমনি ভাবে কেটে গেল। উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটেনি এই এক বছরে, শুধু উলিয়ানার চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে। আলেক্সির মধ্যেও লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। সে অনেক ভদ্র ও নরম হয়েছে যদিও অন্যদের চেয়ে তার চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য সে বজায় রেখেছে। ধারালো কথায় ও রঙ্গরসিকতায় সব্বাইকে সে যেমন মজিয়ে রাখতো তেমনি ব্যবসা পরিচালনায় তার বেপরোয়া ভাব দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়তো পিওতর। কারখানা নিয়ে সে যেন খেলা করছে, যেমন একসময় সে পোষা ভালুকটাকে নিয়ে খেলা করতো। ভালুকটাকে তো শেষ পর্যন্ত সে মেরেই ফেলেছিল। নানা রকম সৌখিন জিনিস কিনে সে ঘর ভরিয়ে ফেললো। গাল কামিয়ে সূক্ষ্মাগ্র কালো দাড়িটির যত্ন নিত। দামী পোশাক পরতো—সব মিলিয়ে ভদ্রলোক হয়ে ওঠার একটা সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে জেগে উঠেছিল। পিওতরের মনে হতো তার এই পিসতুতো ভাইটির মধ্যে দুর্বোধ্য রহস্যজনক কিছু একটা

আছে। তাই সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ভাইটির ওপর নজর রাখতো। সন্দেহ দেখতে দেখতে বেড়েই চললো।

লোকের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে পিওতর যেমন সতর্ক ও সাবধানী ব্যবসার ক্ষেত্রেও সে ঠিক তাই। ধীরেসুস্থে এগোয় সে। ব্যবসার কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে কেমন যেন ভীতিপ্রদ অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে যেতো। সেইসব মুহূর্তে কারখানাটিকে তার মনে হতো পাথরের তৈরি অথচ জীবন্ত। মাটির ওপর গুটিয়ে বসে ছায়া ফেলছে পাখির ডানার মতো। চিমনিটা যেন তার লেজ। জানলাগুলোকে দিনের বেলায় মনে হয় যেন বরফের তৈরি দাঁত কিন্তু শীতের বিকেলে মনে হয় বুঝি লোহায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে, তপ্ত লাল রঙের লোহা।

পিতার সমাধিস্থলে বর্ষপূর্তির প্রার্থনা অনুষ্ঠান শেষে আর্টামনোভ পরিবারের সবাই এসে সমবেত হলো আলেক্সির ছিমছাম ঘরে।

উত্তেজিত স্বরে সে ভাইদের শুনিয়ে বলল, বাবার শেষ আদেশ—বন্ধুর মতো যেন আমরা বসবাস করি। সুতরাং বন্দীর মতো মনে হলেও এখানে আমাদের সেইভাবেই চলতে হবে। তবে বন্ধুভাবাপন্ন হলেও আমরা নিজের নিজের মতো পথেই চলবো। ব্যবসাটা আমাদের সকলের কিন্তু জীবনটা আমাদের যার যার নিজের। ঠিক না?

পিওতর ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে বলল, বেশ, তারপর?

আলেক্সি আবার বলতে শুরু করল, তোমরা সবাই বোধহয় জানো যে, ওর্লোভা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে অনেকদিন ধরেই আমি মেলামেশা করছি। নিকিতা, তোমার বোধহয় মনে পড়বে, যেদিন তুমি ডুবে যাচ্ছিলে একমাত্র যে মেয়েটি তোমার জন্যে দুঃখিত হয়েছিল আমি তার কথাই বলছি। যাই হোক তাকে আমি বিয়ে করতে চলেছি।

নিকিতা সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে জানাল যে সে মেয়েটিকে চিনতে পেরেছে। এই প্রথম তার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে নাতালিয়া। তার মন আজ তাই এত খুশিতে ভরে উঠেছে যে কে কি বলছে তা শোনার দিকে তার কোনো মন নেই। কথা বলতেও তার ইচ্ছে হচ্ছে না। কোনো কারণে চমকে ওঠায় নাতালিয়ার কনুই স্পর্শ করলো নিকিতাকে। খুশিতে উল্লাসিত হয়ে উঠলো নিকিতা। টেবিলের তলা দিয়ে নাতালিয়ার হাঁটু দেখতে লাগলো সে।

আলেক্সি আবার বলল, আমি স্থির নিশ্চিত আমার ভাগ্যই ওকে

মিলিয়ে দিয়েছে। তবে আমার সংসার অন্যভাবে চলবে। আমি এখানে ওকে আনতে চাই না। আমার আশঙ্কা হয়তো তোমাদের সঙ্গে ওর বনবে না।

উলিয়ানা তার চিন্তিত অবনমিত চোখ তুলে আলেক্সিকে সমর্থন জানিয়ে বলল, হ্যাঁ, ওকে আমি খুব ভালো করেই জানি। চমৎকার হাতের কাজ। লেখাপড়াও জানে। ছোটবেলা থেকে নিজের আর মাতাল বাপের ভরণ-পোষণ করে আসছে সে। তবে একরোখা ধরনের, নাতালিয়ার সঙ্গে বনবে বলে মনে হয় না।

নাতালিয়া বলে উঠল, না না, আমার সবার সঙ্গেই বনবে।

স্ত্রীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে পিওতর ভাইকে বলল, এটা তোমার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার।

আলেক্সি উলিয়ানার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার বাড়িটা আমায় বিক্রী করে দিন না। আপনার তো কোনো কাজে লাগছে না।

পিওতর ভাইকে সমর্থন জানিয়ে বলল, হ্যাঁ, মা তো আমাদের সঙ্গেই থাকতে পারেন।

ওর্লোভার সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে আলেক্সি উঠে পড়লো। আলেক্সি চলে যেতেই পিওতর নিকিতাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, ঝিমোচ্ছ কেন? সব সময় কি ভাবো?

নিকিতা চমকে উঠে বলল, আলেক্সি বোধহয় ঠিক কাজই করেছে।

ঠিক কাজ? দেখতেই পাবো আমরা। তারপর উলিয়ানার দিকে তাকিয়ে পিওতর বলল, মা, এ সম্পর্কে আপনার মত কি বলুন?

উলিয়ানা আমতা আমতা করে বলল, হ্যাঁ, বিয়ে করলে ভালোই হবে হয়তো, তবে দুজনের সম্পর্ক কেমন থাকবে কে বলতে পারে? মেয়েটা তো উদ্ভট প্রকৃতির। পাগল বললেও চলে তবে খুবই ধূর্ত। ওর বাবার অনেক দামী দামী জিনিস ছিল। পাছে মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দেয় তাই জিনিসগুলো একে একে সরিয়ে আমার বাড়িতে এনে রাখতো। আলেক্সিই রাত্তিরে জিনিসগুলো আমাকে দিয়ে যেত। আর আমি পরের দিন ওগুলোকে উপহার হিসেবে আলেক্সিকে দিতাম। ওই দামী জিনিসগুলো বিয়ের যৌতুক হিসেবে ও পাবে।

উলিয়ানা অনিচ্ছার ভাব দেখিয়ে আরো অনেক কথা বলে গেল। ওর মায়ের জমিজমা ছিল অনেক কিন্তু দুশ্চরিত্রা। স্বামীর জীবদ্দশাতেই সে

লোকটি ছিল ঘড়ি সারাবার কারিগর আবার কাঠ খোদাই করে মূর্তি তৈরিতেও ছিল দক্ষ। এমনি একটি নগ্ন নারীমূর্তি এখনো আমার বাড়িতে লুকোনো আছে। ওর্লোভার ধারণা ওটি ওর মায়ের মূর্তি। স্বামী মারা যেতেই ওরা দুজনে বিয়ে করে। দুজনেই প্রচুর পরিমাণে মদ খেতো। মাতাল অবস্থায় স্নান করতে গিয়ে ওর মা একদিন জলে ডুবে মরে যায়।

ভালোবাসার ক্ষেত্রে এমন ঘটনা তো কতই ঘটে। ভদ্রমহিলার দোষটা কোথায়? নাতালিয়া আচমকা মন্তব্য করে বসে।

এমন বেফাঁস কথা বলে ফেলায় উলিয়ানা মেয়ের দিকে কটমট করে তাকায়। দৃষ্টি দিয়ে যতখানি ভৎসনা করা যায়।

পিওতর মুচকি হেসে বলল, না না, আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল মদ্যপান, ভালোবাসাবাসি নয়।

একসময় আলোচনায় ছেদ পড়লো, স্তব্ধতা নেমে এল। নিকিতা লক্ষ্য করলো নাতালিয়া মায়ের বলা গল্প মোটেই ভালো মনে নেয়নি। রাগে তার সুন্দর মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে।

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর নিকিতা বাগানে লিলিয়াক গাছের নিচে বসে ছিল। ওপরেই নাতালিয়ার ঘর। পিওতরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে।

আলেক্সি সত্যিই খুব চালাক। ওর মাথায় বুদ্ধি আছে।

পরমুহূর্তেই নিকিতা শুনতে পেল নাতালিয়ার মর্মভেদী কান্নাজড়িত কণ্ঠস্বর। তোমাদের সকলেরই বুদ্ধি আছে, আমিই শুধু বোকা। ও ঠিকই বলেছিল, আমরা সবাই বন্দী। যেমন তোমার সংসারে আমি বন্দিনী।

করুণা ও ভয়ে নিকিতার হৃদয় মথিত হয়ে উঠলো। দু হাত দিয়ে সে বেঞ্চিটাকে শক্ত করে ধরলো। অজানা কোন্ এক শক্তি যেন তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। যে নারীকে সে ভালবাসে তার কণ্ঠস্বর যতই তীব্র হচ্ছে ততই নিকিতার মনে হচ্ছে তার বুকের আশার আলোটা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

বিনুনি বাঁধার সময়ে হঠাৎ তার স্বামীর একটি কথায় নাতালিয়ার মনের বিক্ষোভের দাহ্যপদার্থে একটি দেশলাইয়ের কাঠি ফেলে দিল। দেয়ালের দিকে পিছন ফিরে হাত মোচড়াতে মোচড়াতে তার মনে হচ্ছিল কিছু একটা টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে তার বিক্ষোভকে প্রকাশ করে। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কি বলছে সেদিকেও তার খেয়াল নেই, স্বামীর বিস্মিত প্রশ্নের ও কোনো উত্তর না দিয়ে সে ঝড়ের বেগে বলে

চলেছে, আমি তো এ বাড়ির কেউ নই, কেউ আমাকে গ্রাহ্যই করে না, সবাই আমার সঙ্গে ঝি-চাকরের মতো ব্যবহার করে।

তুমিও আমাকে ভালোবাস না, কোনো বিষয়েই আমার সঙ্গে কথা বল না তুমি। তোমার কাছে আমি শুধুই একটি মেয়েমানুষ। আমি কি তোমার স্ত্রী নই? কী অন্যায় করেছি আমি? আমার মা তোমার বাবাকে কেমন ভালোবাসতেন দেখোনি তুমি?

ধরো তুমিও আমাকে সেইভাবেই ভালোবাসতে শুরু করলে, স্ত্রীর বিকৃত মুখখানি দেখতে দেখতে মন্তব্য করলে পিওতর। পিওতরের মনে হলো তার স্ত্রী বোকার মতো কথা বলে যাচ্ছে তবুও মনে মনে সে স্বীকার করল যে ওর দুঃখ যুক্তিসঙ্গত। সবচেয়ে আশঙ্কাজনক ব্যাপার হলো এতে তাদের মনো-মালিন্য আরো দীর্ঘস্থায়ী হবে। একেই তো তার চিন্তাভাবনার অন্ত নেই তার ওপর আরো কিছু বাড়বে।

···চোখ খুলে দেখার চেষ্টা করো আলেক্সি কেমন ভালবাসে তার··· তাকে ভালবাসাও কত সহজ। সে কত হাসিখুশি, ভদ্রলোকদের মতো সাজগোজ করে থাকে, আর তুমি? তুমি কারো প্রতিই সদয় নও, জীবনে কোনোদিন হাসনি। হ্যাঁ, আলেক্সির সঙ্গে বিয়ে হলে আমি কত সুখী হতে পারতাম। ওর সঙ্গে একদিনের জন্যেও কথা বলার সুযোগ পেলাম না আমি। পারিনি তোমার জন্যেই আমার পিছনে ওই কুঁজোটাকে গোয়েন্দার মতো লাগিয়ে রেখেছ তুমি। ওই নোংরা ঘিনঘিনে লোকটাকে।

আর বসে থাকা যায় না। নিকিতা মাথা নিচু করে উঠে পড়লো। হতাশায় ভেঙে পড়লো সে। টলতে টলতে বাগান ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

পিওতরও উঠে দাঁড়াল। স্ত্রীর কাছে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে বলল, কি বললি? আলেক্সির সঙ্গে?

নাতালিয়ার কথায় পিওতর এতই বিস্মিত হয়েছে যে বউকে মারার মতো রাগ সে সঞ্চয় করতে পারছে না। ভিতর থেকে সে এও অনুভব করছে যে নাতালিয়া অন্যায় কিছু বলেনি। সত্যিই ওর জীবন একঘেয়েমিতে ভরে গেছে। একঘেয়েমির কারণটাও সে বোঝে। তবু বউয়ের মুখ বন্ধ করার জন্যে কিছু তো করা দরকার। দেয়ালে বউয়ের মাথা ঠুকে দিল সে।

এত সাহস তোর? বলিস কি না আলেক্সির সঙ্গে বিয়ে হলে সুখী হতিস?

ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে নইলে আমি চেঁচাব।

অন্য হাত দিয়ে পিওতর নাতালিয়ার গলা টিপে ধরল। নাতালিয়ার

মুখ নীল হয়ে উঠল, কষ্ট করে টেনে টেনে সে শ্বাস নেবার চেষ্টা করতে লাগল। পিওতর তার মাথা আর একবার দেওয়ালে ঠুকে দিয়ে "মূর্খ" বলে ছেড়ে দিল।

নাতালিয়া ধীরে ধীরে দেওয়ালের কাছ থেকে সরে এসে ঘেরা খাটে যেখানে তার শিশু কন্যাটি অনেকক্ষণ ধরেই কাঁদছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েকে কোলে তুলে নিল সে। পিওতরের মনে হলো বউ তার ওপর টেক্কা দিয়েছে। আকাশের তারাগুলো যেন তার চোখের সামনে নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। আর নীল আকাশের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে তা যেন একবার এদিকে আর একবার অন্যদিকে দোল খাচ্ছে। সমান্তরাল রেখায় তার বউ বসে আছে, ইচ্ছে করলে সে এখানে বসেই বউয়ের মুখে ঘুষি চালাতে পারে। নাতালিয়াকে মনে হচ্ছে ভাবলেশহীন কাঠের মূর্তির মতো কিন্তু তার দু চোখ দিয়ে জল ঝরে চিবুক পর্যন্ত গড়িয়ে আসছে। ঘরের এক কোণের দিকে ঝাপসা দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে, খেয়ালই নেই তার যে মেয়েটি দুধ খেতে পারছে না।

পিওতর যেন দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে। সেইভাবে নিজেকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, মেয়েকে তোমার বুকের ঠিক জায়গায় নিয়ে এস।

নাতালিয়া আর্তস্বরে বলল, এ বাড়িতে একটা মাছি আছে তার পাখনা নেই।

তুমি তো জানো আমিও কত একা। এ বাড়িতে তো দ্বিতীয় একজন পিওতর আর্টামনোভ নেই।

পিওতর সব সময়েই একটা অস্বস্তিতে ভোগে। সে যা বলতে চায় তা বলতে পারে না। সঠিক ভাষা খুঁজে পায় না সে, ফলে যা বলে তা তার মনের কথা নয়। কিন্তু স্ত্রীকে শান্ত করতে হলে এবং বিপদ এড়াতে গেলে এমন সহজ সরল ও সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলা দরকার যাতে স্ত্রীর কাছে সব কিছু বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে, নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়ে অযথা চোখের জল ফেলে অনুযোগ করে তাকে আর বিব্রত না করে।

পিওতর গুছিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলো।—আমাকে ব্যবসা দেখতে হয়। কারখানা চালানো নিশ্চয়ই গম কিংবা আলুর বীজ বোনার চাইতে অনেক কঠিন। অত্যন্ত জটিল সব সমস্যার সমাধান করতে হয় আমাকে। তোমাকে তো কোনো কিছু নিয়েই চিন্তাভাবনা করতে হয় না।

পিওতর চেষ্টা করেছিল প্রথমে স্থূল তথ্য পরিবেশন করে ক্রমে সূক্ষ্মতর আভাসে ইঙ্গিতে তার সমস্যা-পীড়িত জীবনকে স্ত্রীর কাছে তুলে ধরবে।

কিন্তু স্ত্রী তাকে ক্রমশই এড়িয়ে যাচ্ছে ফলে সে আরো অস্বস্তিতে পড়ে গেল। 'কারখানা চালানো সহজ কাজ নয়' বার করেক সে একই কথা উচ্চারণ করলো। কিন্তু বুঝতে পারলো যে সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ কোনো বক্তব্যই তার নেই। এমন সময় টিখনের কণ্ঠস্বর তাকে অস্বস্তির হাত থেকে মুক্তি দিল।

পিওতর ইলিচ, একবার বাইরে আসুন।

একটা চাষা। বিরক্তি প্রকাশ করে বলল পিওতর। অনুযোগের স্বরে স্ত্রীকে বলল, তাহলেই দেখতে পাচ্ছ রাত্তিরেও বিশ্রাম নেবার সময় নেই আমার। আর তুমি কিনা তুচ্ছ কারণে অশান্তি···।

দরজার সিঁড়ির এক ধাপ নিচে টিখনকে দেখতে পেল সে। তার মাথায় আজ টুপি নেই, চোখের দৃষ্টিও উদ্‌ভ্রান্তের মতো। জ্যোৎস্নালোকিত উঠোনের দিকে একবার তাকিয়ে সে ধীরে ধীরে বলল, নিকিতা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। এইমাত্র ফাঁস খুলে তাকে নামিয়ে রেখে এলাম আমি।

কি খুলে? পিওতর ধপ করে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল, তার মনে হচ্ছিল সে যেন বালির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে।

বসে পড়লে চলবে না। চলুন। সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সিঁড়ি থেকে না উঠেই সে প্রশ্ন করল, কিন্তু কেন এ কাজ সে করলো?

এতক্ষণে সে অনেক সামলে উঠেছে। চোখে মুখে জল দিয়ে তাকে অনেকটা সুস্থ করে আমি এখানে এসেছি।

মনিবের কনুই ধরে তুলে টিখন তাকে বাগানের দিকে নিয়ে চললো। যেতে যেতে টিখন আবার বলল, স্নান-বাড়ির পাশের ছোট ঘরটার বরগায় দড়ি বেঁধে তারপর···

কিন্তু কেন সে এ কাজ করলে? বাবার শোকে না অন্য কোনো কারণে?

টিখন দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর স্পষ্ট করে বলল, ওঁর রুমালে চুমু খাওয়া পর্যন্ত পৌঁছেছিলো নিকিতা।

কার রুমালের কথা বলছো তুমি?

খালি পায়ে ভিজে মাটির স্পর্শ নিতে নিতে সে টিখনের কুকুরটাকে দেখছিল। কুকুরটা এখুনি ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে লেজ নাড়া শুরু করে দিল। পিওতর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে ভয় পাচ্ছে। কী করবে সে? কী বলবে?

ও, আপনার দেখছি কপালের ওপর কোনো চোখ নেই।

পিওতর কিছু বলল না। টিখন আরো কিছু বলবে তারই প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে রইল।

আমি নাতালিয়া যেভসেভনার রুমালের কথা বলছিলাম। ওগুলো বাগানে শুকোতে দেওয়া হতো।

তা রুমালে চুমু খেত কেন? প্রশ্ন করেই পিওতর সজোরে এক লাথি কষাল কুকুরটাকে যেন সে তার কুঁজ ভাইয়েরই প্রতিমূর্তি। ব্যাপারটা এতই হাস্যকর যে তার নিজের কাছেই তা ধরা পড়লো। খানিকটা থুথু ফেলে সে যেন হাস্যকর ব্যাপারটাকে চাপা দিতে চাইল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সন্দেহের সুতীব্র জ্বালায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। মজুরটার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে সে বলল, তাহলে ওরা চুমু খাওয়াখাওয়ি করতো। তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ, বল আমাকে।

টিখন দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, দেখতে আমি সবই পাই। নাতালিয়া এর বিন্দুবিসর্গও জানতেন না।

তুমি মিথ্যে কথা বলছো।

আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলে আমার লাভ কি? আমি আপনার কাছে কোনো পুরস্কার প্রত্যাশা করি না।

কুড়ুল দিয়ে গর্ত কেটে অন্ধকার ঘরে আলো ঢোকাবার মতো অল্প কথায় টিখন নিকিতার হতভাগ্য জীবনের কথা বলে গেল। পিওতরের মনে হলো টিখন সত্য কথাই বলছে। এখন তার মনে পড়লো বৌদির জন্যে কিছু কাজ করে দিতে পারলে তার ভাইয়ের চোখে খুশির আলো উপচে পড়তো।

ও, তাহলে এই ব্যাপার। আমি কাজে এত ব্যস্ত থাকি, এসব লক্ষ্য করার অবকাশ পাইনি। চলো যাওয়া যাক।

নিকিতার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার জন্যে স্নান-বাড়ির নিচু দরজা দিয়ে ঢুকে অন্ধকারে টিখনের পিছনে দাঁড়িয়ে সে বলল, কি করছো নিকিতা?

নিকিতা কোনো উত্তর দিল না। জানলার ধারে অন্ধকারে বেঞ্চের ওপর সে বসেছিল। তাকে ভালো করে দেখাই যাচ্ছে না। বাইরের ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে নিকিতার পেট আর পায়ের ওপর। পিওতর এবার দেখতে পেল নিকিতা তার কুঁজটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। তার সার্টটা কলার থেকে নিচে পর্যন্ত ছিঁড়ে দু ভাগ হয়ে জলে ভিজে লেপ্টে রয়েছে তার গায়ে। তার চুলও ভেজা। গালের ওপর রক্ত জমে গিয়ে চিকচিক করছে।

রক্ত ! রক্ত কেন ? ও কি নিজেকে ঘুষি মেরেছিল ?

না, তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আমিই ওকে আঘাত করে ফেলেছিলাম।

ভাইয়ের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছিল পিওতর। তাই কানে হাত দিয়ে দূর থেকেই সে ভাইকে তিরস্কার করে যেতে লাগলো। এ তো পাপ। তোমার জন্যে তো লোকের কাছে মুখ দেখানো যাবে না, নিকিতা।

আমি জানি। উত্তর দিল নিকিতা। কিন্তু সে কণ্ঠস্বর যেন নিকিতার নয়। কিছুক্ষণ বিরতির পর আবার সেই উদাস নির্লিপ্ত স্বরে সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও ভাই, আমি কোনো মঠে চলে যাবো। আমি আর সইতে পারছিলাম না।

কাশতে কাশতে সে আবার চুপ করে গেল।

পিওতর বললে, আর ওই নাতালিয়ার সঙ্গে ব্যাপারটা ? এটা নিশ্চয়ই শয়তানের প্রলোভন।

বেদনায় ককিয়ে উঠে নিকিতা বলল, ওঃ টিখন তোমাকে কত অনুনয় করেছিলাম কারোকে না বলতে। যীশুর নাম নিয়ে পিওতর তোমায় অনুরোধ করছি ওর কানে অন্তত একথা তুলো না। তিনি বিদ্রূপ করবেন, আমার গায়ে থুথু ছিটোবেন। সারাজীবন আমি তোমাদের ভালোর জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাব। না না, তাঁকে বোলো না। টিখন, তুই সব গোলমাল করে দিলি, পাজি, বদমাইশ।

মাথাটাকে সে খাড়া করে বসলো। তার পক্ষে এটা খুবই অস্বাভাবিক। ভয় লাগছে দেখতে।

টিখন বলল, এই কাণ্ডটা না ঘটলে আমি কখনই বলতাম না। আর এও জেনে রাখো আমার কাছ থেকে তিনি কিছুই জানতে পারবেন না।

পরিস্থিতির চাপে পিওতরের মন খুবই নরম হয়ে পড়েছিল। সে প্রতিশ্রুতি দিল নাতালিয়াকে কখনই সে এসব কথা বলবে না।

ধন্যবাদ পিওতর, আমি মঠেই চলে যাব।

তোমার কি লেগেছে খুব, নিকিতা ? উত্তর না পেয়ে পিওতর আবার প্রশ্ন করলো, তোমার ঘাড়ে কি খুব ব্যথা হচ্ছে ?

ও কিছু না। তুমি এবার যাও পিওতর।

পিওতর টিখনকে ফিসফিসিয়ে বলল, ওকে একা রেখে তুমি কোথাও যেও না। তারপর পিছন ফিরে বাগানের দিকে পা বাড়াল।

বাগানে ভিজে মাটির মিষ্টি গন্ধ। পিওতর প্রাণভরে স্বস্তির নিশ্বাস নিতেই অস্বস্তিকর দুর্ভাবনাগুলো তার মনের একটু আগের স্নেহকোমলতাটুকু

দূর করে দিল। পিওত্‌র খুব সাবধানে হাঁটছিল যাতে পায়ের নিচের নুড়ি-গুলো বেজে উঠে নৈঃশব্দ ভঙ্গ না করে। দুর্ভাবনার সংখ্যাবৃদ্ধিতে সে খুবই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। সেগুলো তার মনের ভিতর থেকে উঠছে, না বাইরের অন্ধকার রাত্রির ভিতর থেকে বাদুড়ের মতো উড়ে এসে তার মস্তিষ্কে ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে তা সে বুঝতে পারছে না। দুর্ভাবনাগুলো এত দ্রুত একে সরিয়ে আর একটি জায়গা করে নিচ্ছে যে সে কিছুতেই তাদের ধরে ভাষায় রূপ দিতে পারছে না। যতটুকু সে আয়ত্তে আনতে পেরেছে তা হচ্ছে দড়ি ও ফাঁসের এক জটিল বুনন—তাকে, আলেক্সি, নিকিতা, নাতালিয়া ও টিখনকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে। এ যেন এক জটিল নৃত্যের ঘূর্ণিতে বোঁ বোঁ করে পাক খাওয়া—কারোকেই চেনা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না আর সেই ঘূর্ণন চক্রের মাঝখানে সে একা দাঁড়িয়ে। অবশ্য জটিল ভাবনার এই রূপকে সে যে ভাষায় প্রকাশ করলো তা কিন্তু অত্যন্ত সাদামাঠা।

শাশুড়ীকে আমাদের সঙ্গে এসে থাকতে হবে আর আলেক্সিকে এখান থেকে চলে যেতে হবে, নাতালিয়াকে দেখছি সবাই ভালোবাসে সুতরাং তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা উচিত। তবে ও যে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল তা নিশ্চয়ই ভালোবাসার জন্যে নয়, রিক্ততাই তার কারণ। 'মঠে চলে যাচ্ছে, 'সিদ্ধান্তটা ভালোই। সংসারে ওর 'প্রয়োজনটাই বা কী?' টিখনটা 'মহামূর্খ, অনেক আগেই ওর আমাকে জানানো উচিত ছিল।

কিন্তু এগুলো সবই ছলনাময় অপ্রকাশিত ভাবনা। ফলে তার আতঙ্ক ও ভীতি বেড়েই চললো। বাধ্য হয়েই তাই সে ঘন সিক্ত রাত্রির অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। বাতাস ডাঁশের গুঞ্জনে ভরাট হয়ে আছে আর দূরের কারখানা সন্নিহিত গ্রাম থেকে গানের করুণ সুর ভেসে আসছে, অন্ধকারে স্বল্পতোয়া নদীর কলধ্বনির মতো। পিওত্‌র স্পষ্টই বুঝতে পারছে তার আশঙ্কা ও দুর্ভাবনাগুলোকে গলা টিপে না মেরে ফেললেই নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঝেড়ে ফেলতেই হবে। এরই মধ্যে কখন যে লিলিয়াক ঝোপে তাদের শোওয়ার ঘরের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে সে খেয়ালই ছিল না। দুই কনুই দুই হাঁটুর ওপর রেখে, তালুতে মুখ ঢেকে দীর্ঘ সময় সে সেখানে বসেছিল। একসময় তার মনে হলো পায়ের তলার কম্পমান মাটি বুঝি তারই ভারে তলিয়ে যাবে।

নিকিতার বাহাদুরি আছে মানতেই হবে। এই বেলেমাটিতে বাগান করলো কিভাবে? মঠে গিয়েও নিশ্চয়ই ও এই কাজই করবে।

নাতালিয়া যে তার কাছে আসছে সে খেয়ালই করেনি। এক শুভ্র

নারীমূর্তি তার কাছে এসে দাঁড়াতেই সে চমকে উঠলো। যেন মেদিনীর গর্ভ থেকে উঠে এল সেই নারী। পরমুহূর্তেই অবশ্য পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে সে চিনতে পারলো।

যীশুর দোহাই, ক্ষমা করো আমায়। অনেক কু-কথা বলেছি তোমায়।

ঠিক আছে, ঈশ্বরই তোমায় ক্ষমা করবেন। আমিও তোমায় অনেক কু-কথা বলেছি। পিওতর খুশি হলো এই ভেবে যে তাকে কথা হাতড়ে বেড়াতে হয়নি। তাদের কলহ মেটাবার উপযুক্ত মধুর ভাষা আপনিই বেরিয়ে এসেছে। তবু তাকে আরো কিছু সান্ত্বনার কথা বলতেই হয়।

আমি বুঝি নাতালিয়া, খুবই নিরানন্দ পরিবেশে তোমার দিন কাটে। কিন্তু আমোদ-প্রমোদের কোনো অবকাশ নেই এখানে। কি নিয়ে আনন্দ করবে? বাবা কাজ ভালোবাসতেন, কাজের মধ্যেই আনন্দ পেতেন। সত্যি কথা। ভদ্রলোক আর ভিখিরি ছাড়া সব্বাইকেই কাজ করে খেতে হয়।

খুব সাবধানেই কথা বলছিল পিওতর। তার ভয় পাছে বেশি কথা না বলে ফেলে। নিজের কথা শুনতে পাচ্ছিল বলেই তার মনে হলো সে ঝানু ব্যবসায়ীর মতো কথা বলছে। কথাগুলো মোটেই তার অন্তর থেকে আসছে না। ভাষা তার মনের কথাকে প্রকাশ না করে বার বার পিছলে যাচ্ছে। সে যেন এক গর্তের পাশে বসে আছে: যে-কোনো মুহূর্তে তাকে কেউ ঠেলে ফেলে দিয়ে কানে কানে বলতে পারে: পিওতর তুমি সত্য বলছো না।

কিন্তু তেমন কোনো অঘটন ঘটার আগেই নাতালিয়া তার কাঁধে মাথা রেখে ধীরে বললে, চিরকালের জন্যে তুমি শুধু আমারই। একথা কেন বুঝতে চাও না।

পিওতর বাহুবেষ্টনে বউকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে কান পেতে রইল আরো কিছু শোনার জন্যে।

একথা না বোঝা অন্যায়। তুমি আমাকে যতটুকু ভালোবাসো তাতে তোমার কাছে থাকাও যা, একা থাকাও তাই। আমার চাইতে আপনার তোমার আর কে আছে বলবে?

নাতালিয়া যেন তাকে আকাশের দিকে তুলে বাতাসের মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে এল। সুখের আবেশে তার সিদ্ধান্ত দুর্বল হয়ে এল।

হ্যাঁ, নিকিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বলবো না, কিন্তু আমাকে বলতেই হবে। সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে তাজা নির্মল হাওয়ায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো যেন সে। অতএব নিকিতা সম্পর্কে সব কথাই সে সবিস্তারে বলে ফেললো। এমনকি রুমালে চুমু খাওয়া পর্যন্ত

তার বাহুর মধ্যে নাতালিয়ার দেহ দারুণ ভাবে কেঁপে উঠলো। ও কি নিকিতার জন্যে দুঃখিত হলো? ভাবল পিওতর।

আমার সম্পর্কে ওর আগ্রহ জন্মেছে লক্ষ্যই করিনি। উঃ পাজি, ঠগ কোথাকার। কুঁজোগুলো বোধহয় এমনিই ধূর্ত হয়।

সত্যিই ওকে অপছন্দ করে, না ভান করছে। নিজেকেই প্রশ্ন করলো পিওতর। আর একটু উসকে দেবার জন্যে বলল, ও কিন্তু তোমার সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহার করতো।

তুলুনও আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতো।

তবু···তুলুন তো কুকুর।

হ্যাঁ, তাই তুমি কুকুরের মতো ওকে আমার আর আলেক্সির দিকে নজর রাখার জন্যে ব্যবহার করেছিলে। আমি সব বুঝি। ওঃ, কী ঘেন্না লাগে লোকটাকে!

নাতালিয়া যে সত্যিই ক্ষুব্ধ ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পিওতর তা বুঝতে পারছে তবুও তার মনে হলো স্ত্রীর আচরণের মধ্যে কিছু যেন বাড়াবাড়ি আছে। তাই সে বাজিয়ে নেবার জন্য শেষ আঘাত হানলো।

জানো কি ও একটু আগে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। টিখন ওকে বাঁচিয়েছে। সে এখন স্নান-বাড়িতে শুয়ে আছে।

শুনেই নরম হয়ে গেল নাতালিয়া। স্বামীর হাতের বাঁধন থেকে খসে ভয়ে আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল সে। আঁতকে উঠে বলল সে, না, না···কি বলছো তুমি? হায় ভগবান!···

পিওতর স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলো যে এতক্ষণ নাতালিয়া মিথ্যে কথা বলছিল। নাতালিয়া যেন কপালে তীব্র আঘাত পেয়েছে সেইভাবে মাথা পিছনে হেলিয়ে দিল। নাতালিয়ার সুতীব্র আর্ত বিলাপে পিওতরও নাড়া খেল।

ওগো আমাদের কী হবে? বাবা হঠাৎ মারা গেলেন বলে পঞ্চায়েতী বিচার থেকে আমরা রেহাই পেলাম। এখন লোকে আবার আমাদের কথা নিয়ে ঘোঁট পাকাবে। কেন আমাদের ওপর এই অভিশাপ? ভগবান, কী অন্যায় করেছি আমরা? এক ভাই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে যায়, আর এক ভাই এক নাগরীকে বিয়ে করতে চলেছে। এ সবের মানে কী?

ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বউয়ের কাঁধে হাত রেখে পিওতর বলল, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। টিখন ছাড়া আর কেউ এ খবর জানে না। ও কাউকে বলবে না। আর নিকিতা তো মঠেই চলে যাচ্ছে।

কবে ?

তা ঠিক জানি না। তবে মনে হয় ও তাড়াতাড়িই করবে। তুমি একবার দেখা করে এসো না।

সর্পদষ্টের মতো লাফিয়ে উঠল নাতালিয়া। কান্নার স্বরে বলল, না না, আমায় পাঠিও না। আমি যেতে পারবো না। ভয় করছে আমার।

বেশ, তাহলে চলো শুতে যাই।

স্ত্রীর পাশে হাঁটতে হাঁটতে পিওতর ভাবছিল আজকের দিনটা তার কাছে ভালো ও খারাপ দুই রূপেই দেখা দিয়েছে। প্রথমত নিজেকে এতদিন সে যা ভেবে এসেছে পিওতর আর্টামনোভ তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ। যে তার মনের শান্তির ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল এইমাত্র তাকে সে চতুরভাবে বঞ্চনা করতে পেরেছে। বউকে অবশ্য সে বলল, তুমিই আমার একমাত্র আপনজন। এই কথাটা যদি বুঝে থাকো তাহলে আর কোনো গোলমালই হবে না।

বারোদিন পর। সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে শিশিরপাতে সিক্ত কালো বালির পথ ধরে হাতে লাঠি নিয়ে নিকিতা আর্টামনোভ হেঁটে চলেছিল। কুঁজের ওপর একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে সে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হাঁটছিল। তার এই দ্রুততার কারণ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে আত্মীয়দের দেওয়া বিদায় অনুষ্ঠানের স্মৃতি ভুলে যেতে চায়। তারই জন্যে সবাই একদিন রাতের বিশ্রাম-সুখ ত্যাগ করে সমবেত হয়েছিল খাবার ঘরে। সবাই অত্যন্ত সতর্ক ও সংযত হয়ে কথা বলছিল। তার জন্যে যে কারো মনে এতটুকু সহানুভূতি নেই তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। একটা ভালো চাল চেলেছে তারই সাফল্যে যেন খুশি খুশি দেখাচ্ছিল পিওতরকে।

দু'দুবার সে বলেছিল, এখন আমাদের নিজেদের পরিবারেরই একজন সন্ন্যাসী আমাদের জন্যে প্রার্থনা করবে।

নাতালিয়া নিজেকে অত্যন্ত ব্যস্ত রেখেছিল পরিবেশনের কাজে। তার ইঁদুরের মতো কান দুটি এতই লাল হয়ে উঠেছিল যে মনে হচ্ছিল কেউ বুঝি মাড়িয়ে দিয়েছে। তার কপালে ভ্রূকুটি। বারে বারেই সে বাইরে চলে যাচ্ছিল। উলিয়ানা চিন্তিত, নির্বাক হয়ে বসে ছিল। মুখের মধ্যে আঙুল ভিজিয়ে সে তার পাকা চুল মসৃণ করায় ব্যস্ত রেখেছিল নিজেকে। একমাত্র আলেক্সিই তার ভিতরের উত্তেজনা প্রকাশ না করে পারছিল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে মাঝে মাঝেই সে প্রশ্ন করে উঠছিল, কখন তুমি এই সিদ্ধান্ত নিলে ?

হঠাৎই নাকি ? আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

আলেক্সির পাশে বসেছিল ওর্লোভা। ছোটখাটো চেহারা, তীক্ষ্ণ নাক। সে বারে বারেই ভুরু তুলে সবাইকে দেখছিল। নিকিতার ভালো লাগেনি তাকাবার এই কৌতূহলী ভঙ্গী। তার চোখ দুটি মুখের তুলনায় ছোট।

এদের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিল নিকিতা। একটা ভীরু চিন্তায় সে অস্বস্তির মধ্যে ছিল। কি জানি পিওতর হয়তো হঠাৎ সব ফাঁস করে দেবে। এরা এবার আমাকে ছেড়ে দিলে পারে।

প্রথমেই বিদায় জানিয়েছিল পিওতর। এগিয়ে এসে সে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, তাহলে ভাই বিদায়।

উলিয়ানা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, করছো কি পিওতর! আগে সবাই মিলে প্রার্থনা করি তবে তো বিদায়।

অবশেষে তাই হয়েছিল তবে সব কিছুই অতি দ্রুত সম্পন্ন করা হয়েছিল। পিওতর আবার তার কাছে এগিয়ে এসে বলেছিল, তোমার গচ্ছিত টাকা রয়েছে, প্রয়োজন হলেই জানাবে, পাঠিয়ে দেব। আর খুব বেশি কৃচ্ছ্র সাধন করো না। তাহলে বিদায় ভাই, আমাদের সকলের হয়ে প্রার্থনা করো

উলিয়ানা উঠে এসে তার কপালে তিনবার চুম্বন করেছিল তারপর কোনো অজ্ঞাত কারণে কেঁদে উঠেছিল। আলেক্সি উষ্ণ আলিঙ্গনে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, বিদায় ভাই। ঈশ্বর তোমার ভালো করুন। আমিই একদিন বলেছিলাম আমরা নিজের নিজের পথে চলবো। তবু আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না তুমি কেন এত তাড়াতাড়ি এই সিদ্ধান্ত নিলে।

সকলের শেষে এসেছিল নাতালিয়া। বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে হাত দুটি তার বুকের কাছে জড়ো করে ধীর স্বরে বলেছিল, বিদায় নিকিতা ইলিচ।

প্রায় ছত্রিশজন বুড়ো তাঁতি উঠোনে দাঁড়িয়েছিল তাকে বিদায় জানাতে। সেই বুড়ো বোরিস মোরোজোভ বলল, সৈনিক ও সন্ন্যাসীই হচ্ছে জনগণের প্রকৃত সেবক।

বাপের সমাধির ওপর শেষবারের জন্যে দৃষ্টিপাত করতে সমাধিক্ষেত্রে গিয়েছিল নিকিতা। কোনো প্রার্থনা না জানিয়ে নতজানু হয়ে নিজের জীবনের গতির কথাই অনেকক্ষণ সে ভেবেছিল। সূর্যের প্রশস্ত কৌণিক ছায়া সমাধির সবুজ তৃণভূমির ওপর এসে পড়েছিল। মাথা নিচু করে সে

বলেছিল, বাবা আমায় ক্ষমা করো।

প্রভাতের অপার্থিব স্তব্ধতায় নিষ্প্রাণ মনে হয়েছিল নিকিতার কণ্ঠস্বর। ক্ষণিক বিরতির পর সে গলার স্বর বাড়িয়ে বলেছিল, বাবা আমায় ক্ষমা করো। তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। মেয়েমানুষের মতো কেঁদেছিল অনেকক্ষণ। সীমাহীন দুঃখ যেন সংযমের বাধ ভেঙে দিয়েছিল তার।

সমাধিক্ষেত্র থেকে কিছুটা পথ এগিয়ে যেতেই হঠাৎ তার চোখে পড়লো ঝোপের পাশে পথের ধারে টিখন দাঁড়িয়ে আছে পাহারাদারের মতো। কাধে তার কোদাল, কোমরের কাছে কুড়ুল।

তাহলে তুমি চললে। টিখন বললে।

হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এখানে কি করছো?

আমার হাজরা-ঘরের কাছে পুঁতবো বলে একটা অ্যাশ গাছের চারা তুলতে এসেছি।

দুজন দুজনের দিকে অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল। একসময় টিখন তার চোরা দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

চলো. তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

অনেকক্ষণ তারা নীরবে হাঁটছিল। টিখনের মন্তব্যে নীরবতা ভঙ্গ হলো। এবারে কী ভয়ানক শিশির পড়ছে। এতে চাষের ক্ষতি হবে। খরায় ফসল জ্বলেপুড়ে যাবে।

ভগবান করুন তা যেন না হয়।

টিখন অস্পষ্টভাবে কি যেন মন্তব্য করলো, শোনা গেল না।

কি বললে? নিকিতার সব সময়েই আশঙ্কা টিখন উদ্ভট কিছু একটা বলে বসতে পারে।

বলছিলাম, ভগবান নিশ্চয়ই তা হতে দেবেন না।

নিকিতা নিশ্চিত যে টিখন আগে একথা বলেনি। তাই সে সরাসরি প্রশ্ন করলো, ঈশ্বর মঙ্গলময় একথা কি তুমি বিশ্বাস করো না?

কেন করবো? শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে জবাব দিল টিখন। আমাদের এখন বৃষ্টির দরকার। শিশিরে ব্যাঙের ছাতাগুলোর ক্ষতি হবে। ভালো মনিব তাকেই বলবো যিনি আমাদের ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটা দেবেন।

নিকিতা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তুমি যে ভাবে চিন্তা করছো এ চিন্তাধারা ঠিক নয়।

আমি সঠিক চিন্তাই করি। চোখ দিয়ে আমি চিন্তা করি না।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে তারা হেঁটে চললো। নিজের পায়ের কাছের

প্রশস্ত ছায়ার দিকে নিকিতার দৃষ্টি নিবদ্ধ। আর টিখন হাঁটার তালে তালে কোদালের বাঁটে টোকা দিয়ে চলেছে।

নিকিতা ইলিচ, এই বছরেই কোনো এক সময়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

হাঁা এসো। তুমি খুব মজার মানুষ।

তা ঠিকই বলেছ।

টুপিটা খুলে টিখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

তাহলে এখানেই বিদায় জানাই তোমায়। তোমাকে আমি পছন্দ করি নিকিতা। তোমার বাবা ছিলেন শরীরের দিক থেকে সচল আর তোমার মনটা সচল। নিরীহ প্রকৃতির তুমি, ধর্মে মতি আছে তোমার তবে···

নিকিতা লাঠিটা ফেলে দিয়ে কুঁজে নাড়া দিয়ে চামড়ার ব্যাগটা সোজা করে নিল তারপর কোনো কথা না বলে টিখনকে আলিঙ্গন করলো। ঘনিষ্ঠতম আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে টিখন আবার বলল, তাহলে ওই কথাই রইলো, আমি দেখা করতে যাব।

ধন্যবাদ টিখন।

পাইন বনের দিকে যেখানে রাস্তাটা হঠাৎ বাঁক নিয়েছে সেখান থেকে নিকিতা একবার পিছন ফিরে তাকাল। দেখতে পেল টিখন টুপিটা খুলে বগলের তলায় রেখে রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ভাবখানা যেন এই, কাউকে সে আর এগুতে দেবে না।

দূর থেকে তাকে দেখাচ্ছিল ঠিক সেই অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ আন্তোনুস্কার মতো। আবার হাঁটা শুরু করতেই আন্তোনুস্কাই নিকিতার মন অধিকার করে বসলো। সঙ্গে সঙ্গেই নিকিতার স্মৃতিতে জেগে উঠলো আন্তোনুস্কার সেই বিরক্তিকর ছড়াটা :

জেগেছেন যীশু···জেগেছেন তিনি। আর ? রথ খুইয়েছে চাকা একটি !

দ্বিতীয় খণ্ড

আটামনোভদের নিজস্ব গির্জা তৈরি হতে প্রায় সাতটি বছর লেগে গেল। বাপের নবম বার্ষিক মৃত্যুতিথি উদ্‌যাপনের দিন গির্জা উৎসর্গ করা হল মহাত্মা ইলিয়ার নামে। গির্জা তৈরি হতে এত সময় লাগার জন্যে দায়ী আলেক্সি। দু'দুবার সে গির্জার জন্যে আনা ইট অন্য কাজে ব্যবহার করল। প্রথমবার কারখানার তৃতীয় ব্লক তৈরির জন্যে দ্বিতীয়বার হাসপাতাল তৈরি করতে। দেরী করার যুক্তি হিসেবে সে বলতো, ভগবান অপেক্ষা করতে জানেন, তাঁর কোনো ব্যাপারেই তাড়াহুড়ো নেই।

আলেক্সির এইসব রসিকতাকে কেউ অবশ্য সুরুচির প্রকাশ বলে মেনে নিত না।

গির্জা উৎসর্গীকরণের পর তারা সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হল প্রার্থনা জানাতে। প্রার্থনানুষ্ঠান শেষ হলে অন্যান্যরা চলে যাওয়ার পর আটামনোভ পরিবারের লোকেরা বাড়ির দিকে রওনা হল। একটা বার্চ গাছের নিচে উলিয়ানা যে একা বসে রইল তা কেউ খেয়াল করল না।

মেঘলা দিন। আকাশে মেঘের ভ্রূকুটি। বৃষ্টির সঙ্কেত। ফার গাছের ডগাগুলোকে এলোমেলো বিক্ষিপ্ত করে দিয়ে ভিজে বাতাস যেন ক্লান্ত ঘোড়ার মতো হাঁপাচ্ছে। লাল বালির রাস্তা দিয়ে মানুষের কালো কালো মূর্তি ধীরগতিতে চলেছে কারখানার দিকে। কারখানার তিনটি ব্লক একই কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এসে যেন আঙুল খিঁচে মাটি আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে।

ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে আলেক্সি বলল, বাবা বেঁচে থাকলে আমাদের কাজ দেখে খুশি হতেন।

ভাইয়ের মন্তব্যকে গুরুত্ব না দিয়ে পিওতর বলল, জারের হত্যায় বাবা দুঃখিত হতেন।

দুঃখিত হওয়া বাবার ধাতে ছিল না। তিনি নিজের বুদ্ধিতে চলতেন জারের বুদ্ধিতে নয়।

মাথার ওপর টুপিটা আরো টেনে দিয়ে আলেক্সি মেয়েদের দিকে তাকানো থেকে বিরত হল। কাছাকাছি স্ত্রী ও নাতালিয়া হেঁটে চলেছে।

স্বাস্থ্যবতী নাতালিয়ার পাশে আলেক্সির বউকে দেখায় গ্রামের ইস্কুল মাস্টারনীর মতো। ছোটখাটো পাতলা চেহারা, অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষটি। নাতালিয়ার কাঁধের ওপর পুঁতিবসানো কালো রেশমের গাত্রাবরণ। বেগনী-লাল শিরাবরণের পটে তার সুন্দর লাল চুল—সব মিলিয়ে তার রূপ আজ খুলে গিয়েছে।

গোমরামুখো ভাইয়ের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে আলেক্সি বলল, তোমার বউ-এর রূপ দিন দিন আরো যেন খুলছে।

পিওতর কোনো কথা বলল না।

নিকিতা এবারের অনুষ্ঠানেও এল না। কী জানি আমাদের ওপর রাগ করেছে না অন্য কোনো কারণ আছে।

এই আবহাওয়ায় আলেক্সির বুক ব্যথা করে তার ওপর মনের ওপর চেপে আছে মেঘলা দিন ও শোকানুষ্ঠানের বিষণ্ণতার ভার। এই থমথমে ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্যে ভাইকে কথা বলাবার জেদ চেপে গেল তার।

বিরলে কান্নাকাটি করার জন্যে তোমার শাশুড়ী সমাধিক্ষেত্রে রয়ে গেলেন। বাবাকে তিনি ভুলতে পারছেন না। সত্যিই অপূর্ব মহিলা। হাঁপানিতে আজকাল খুব কষ্ট পাচ্ছেন, হাঁটতেও কষ্ট হয়। আমি তাই টিখনকে বলেছি ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দিতে।

দায়সারা গোছের উত্তর দিল পিওতর, হ্যাঁ, কষ্টকর।

তুমি কি ঘুমোচ্ছ নাকি? কি বলছিলে 'কষ্টকর'। আলেক্সি রাগতস্বরে

ছোট ছোট পাহাড়ের মাথায় যেখানে সারি সারি ফার গাছগুলো রাগী ভঙ্গিমায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে পিওতর বলল, টিখনকে আমি ছাড়িয়ে দেবই।

কেন? কি কারণে? টিখন একজন সৎ, নিষ্ঠাবান কর্মী।

এবং নির্বোধ—পিওতর যেন পাদপূরণ করল।

ওদের আলোচনায় বাধা পড়ল কারণ ততক্ষণে মেয়েরা কাছে এসে পড়েছে। আলেক্সির স্ত্রী ওর্লোভা স্বামীর সঙ্গে কণ্ঠস্বরে এমন দৃঢ়তা এনে কথা বলল যে ওই ক্ষীণ আকৃতির মহিলার পক্ষে তা বেশ বেমানান।

আমি নাতালিয়াকে বোঝাতে চাইছিলাম যে ইলিয়াকে (পিওতরের বড় ছেলে। ঠাকুর্দার নাম কিংবা মহাত্মা ইলিয়ার নামানুসারে তার নাম রাখা হয়েছে) এখন স্কুলে পাঠানো দরকার। কিন্তু নাতালিয়া খুব ভয় পাচ্ছে

সন্তানসম্ভবা নাতালিয়াকে আদরে লালিত স্ফীত হাসের মতো দেখাচ্ছে। তার নাকিস্বরে কথার ধরনটা বয়স্কাদের মতো। সে বলল, আমার মতে স্কুলে যাওয়ার ফল খুবই খারাপ হয়। এই যে এলেনা চিঠিতে কত কিছু লেখে কিছুই বোঝা যায় না। পমিয়ালোভ ঠিকই বলে। শিক্ষা মানুষকে অসামাজিক করে তোলে।

আলেক্সি টুপি খুলে কপাল আর টাকের ঘাম মুছতে মুছতে বলে, আজকের দিনে প্রত্যেকেরই শিক্ষিত হওয়া উচিত।

এসব আলোচনায় যোগ দেবার এতটুকু ইচ্ছে নেই পিওতরের। সংক্ষেপে সে শুধু বলল, হুঁ, স্কুলে যাওয়া দরকার।

সকলের সামনে অপদস্থ হয়ে নাতালিয়া অন্যান্যদের সঙ্গে বাড়ির দিকে রওনা হয়। 'আমি মায়ের জন্যে অপেক্ষা করি' বলে পিওতর একা রয়ে গেল। আত্মগত চিন্তায় এখন সে মগ্ন হয়ে থাকতে চায়। বর্তমানে তার মনের শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে টিখন। কারখানার শ্রমিক টিখন। মনের ভারসাম্যই যেন নষ্ট করে দিয়েছে ওই শ্রমিকটা।

সমাধিক্ষেত্র থেকে কারখানার দিকে তাকিয়ে পিওতর স্বগতোক্তি করেছিল, 'ব্যবসার কত প্রসার হয়েছে'। অহঙ্কার করে নয়, চোখের সামনে যা দেখেছে তারই বাস্তব বর্ণনা করেছে সে। তখন পিছন থেকে টিখন মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়েছিল, 'ব্যবসা হচ্ছে ফাংগাসের মতো, আপনিই বাড়ে।

পিওতর একটি কথাও বলেনি, একবার ফিরেও তাকায়নি টিখনের দিকে। কিন্তু কারখানার শ্রমিকের এই অপমানকর মন্তব্যে তার মনের শান্তি বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। নিজের কথাই সে ভাবে। দিবারাত্র কাজ করে যাচ্ছে সে, শত শত লোকের অন্ন যোগাচ্ছে। ব্যবসার কি করে প্রসার হবে সেই চিন্তাই দিবারাত্রির তার ধ্যানজ্ঞান। নিজের কথা চিন্তা করার তার এতটুকু অবকাশ নেই। আর এই নির্বোধ মহাজ্ঞানীর মতো বলে কি না ব্যবসা আপনা-আপনিই বাড়ে। ব্যবসার সমৃদ্ধির জন্যে মালিকের বুদ্ধির কোনো ভূমিকাই নেই। আর অপদার্থ ওই লোকটা আবার আত্মা, পাপ এসব নিয়েও কথা বলে।

একটা পাইন গাছের গুঁড়ির ওপর বসে কান টানতে টানতে পিওতরের মনে পড়ে গেল একবার সে ওর্লোভাকে বলেছিল, আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করার অবকাশই হয় না আমার। ওর্লোভা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল, আপনার আত্মা কি আপনার থেকে আলাদা না কি?

প্রথমে পিওতরের মনে হয়েছিল এ বুঝি মেয়েলি রসিকতা কিন্তু চশমার

পিছনে তার কালো চোখের দীপ্তি দেখে সে বলেছিল, বুঝতে পারলাম না তোমার বক্তব্য।

হ্যাঁ, আমিও বুঝতে পারি না লোকে কেন মানুষকে বাদ দিয়ে শুধু আত্মা নিয়ে আলোচনা করে। ভাবখানা এই যে আত্মা যেন দত্তক নেওয়া এক অনাথ।

পিওত্তর এই মেয়েটির কথাবার্তা সব সময়ে বুঝতে পারে না তবে মেয়েটির সরলতা তার ভালো লাগে আবার সন্দেহও হয় এই সরলতা কুটিলতার আবরণ নয় তো।

আবার টিখন তার মন জুড়ে বসে। লোকটাকে সে কোনোদিনই দেখতে পারে না। তার দাগে ভরা মুখ, গালের উঁচু হাড়, চুলে ঢেকে থাকা কান, ঘন দাড়ি, হাঁটার অনতিক্রুত অথচ ঋজু ভঙ্গি সব কিছুই খারাপ লাগে। এমনকি তার হাজিরার সময়জ্ঞান, শান্ত অনুত্তেজিত হাবভাব তাও ঈর্ষা জাগায়। সে কাজ করে অনেক আর সে কাজে ত্রুটিও থাকে না এতেও পিওত্তরের বিরক্তি ধরে যায়। কিন্তু এহ বাহ্য। তার সবচেয়ে বড় অস্বস্তির কারণ যতই দিন যাচ্ছে ততই টিখন তাদের পরিবারের একজন হয়ে উঠছে। তাকে না হলে যেন আর্টামনোভ পরিবারের চাকা আর ঘুরবেই না। আরো অস্বস্তির কারণ সবাই তাকে ভালোবাসে। এমনকি কুকুর ঘোড়া পর্যন্ত। বদমেজাজী বুড়ো কুকুর তুলুনকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়, কেউ তার কাছে ঘেঁষতে পারে না একমাত্র ব্যতিক্রম টিখন। আর ছেলেদের তো কথাই নেই। তার বড় ছেলে ইলিয়া তো মা-বাবার চাইতে টিখনকেই মান্যগণ্য করে বেশি।

টিখন ভায়ালোভকে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে তাকে সে গির্জার তত্ত্বাবধায়ক কিংবা বন-রক্ষকের কাজ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, ওসব কাজ আমার দ্বারা হবে না। যদি আমাকে সহ্য করতে না পারেন তবে আমাকে বিশ্রাম দিন। এক মাসের ছুটি দিন নিকিতা ইলিচকে দেখে আসি।

হ্যাঁ, ঠিক ওই কথাটিই বলেছিল—'বিশ্রাম দিন।' কী পাজি, উদ্ধত লোকটা! শুধু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হয়নি, কায়দা করে ভাইয়ের কথাও মনে করিয়ে দিলে। সুদূর এক বনের মধ্যে দীন এক মঠে তার ভাই কৃচ্ছ্রসাধন করছে। উদ্বেগে পিওত্তর আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। মনে হয় নিকিতার আত্মহত্যার প্রচেষ্টার ব্যাপারে টিখন যতটুকু বলেছে তার চেয়ে অনেক বেশি সে জানে। সে যেন তাদের নতুন কোনো দুর্ভাগ্যের অপেক্ষায় বসে আছে।

তার জ্বলজ্বলে চোখের দৃষ্টি যেন বলছে, 'পিওতর আমায় ঘাঁটিও না, আমাকে তোমার প্রয়োজন আছে।'

ইতিমধ্যে তিনবার টিখন মঠে গিয়ে নিকিতার সঙ্গে দেখা করে এসেছে। পিঠে একটা বোঁচকা, হাতে একটা লাঠি নিয়ে যখন সে মাটির ওপর দিয়ে চলে তখন তার হাঁটবার ভঙ্গি দেখে মনে হয় বুঝি পথকেই সে অনুগ্রহ করছে। সত্যিই যখন যে কাজ সে করে মনে হয় অন্যকে অনুগ্রহ করার জন্যেই তা করছে।

ফিরে এসে নিকিতা সম্পর্কে এমন ভাসা ভাসা কথা বলে যাতে মনে হয় সে যা জানে কিছুই বলছে না।

ভালো আছে, লোকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, আপনাদের শুভেচ্ছা আর উপহারের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছে—এর বেশি সে একটিও কথা বলবে না।

পিওতর প্রশ্ন করে, আর কি সে বলল?

সাধু-সন্ন্যাসীর আর কী বলার থাকতে পারে?

আলেক্সি বিরক্ত হয়ে বলে, নিশ্চয়ই আরো কিছু বলেছিল সে। বলেছে কি না?

হ্যাঁ বলেছিল। ধরুন ঈশ্বর সম্পর্কে, আবহাওয়া সম্পর্কে। বৃষ্টি প্রয়োজনের সময় আসছে না। আর আপনাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া এই আর কি।

স্পষ্ট করে বল। ধমকে ওঠে আলেক্সি।

আপনাদের জন্যে তার দুঃখ হয়।

কেন?

সে স্থির হয়ে আছে, আর আপনারা চরকির মতো ঘুরছেন তাই।

আলেক্সি হো হো করে হেসে উঠল। তারপর সে বলল, যত্তো সব বাজে কথা।

সে কি চিন্তা ভাবনা করে আমি বলতে পারব না। সে যা বলেছে তা-ই আপনাদের বললাম। আমি বাপু সরল মানুষ।

আলেক্সি খোঁচা দিয়ে বলল, হ্যাঁ, সরল মানুষ! ঠিক সেই নির্বোধ আন্তোনুস্কার মতো।

বাতাস উঠে সুগন্ধ ছড়িয়ে দিল পিওতরের চারপাশে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। আকাশে নীল মেঘের গুহা থেকে সূর্য বেরিয়ে আসছে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে পিওতরর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সে আবার ডুবে গেল নিজের চিন্তার গভীরে।

ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখের। নিকিতা মঠে জমা দেবার জন্যে হাজার রুবল ও নিজের জন্যে একশো আশি রুবল রেখে বাকী টাকা ও পৈতৃক সম্পত্তি ভাইদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে। কী দরকার ছিল সবকিছু দান করে দেবার?

আলেক্সি কিন্তু খুশিই হয়েছিল। বলেছিল, টাকা পয়সা সম্পত্তি নিয়ে ও কি করবে? নিষ্কর্মা সাধুগুলোর পেট মোটা করার জন্যে? আমাদের ব্যবসা আছে, ছেলেপুলে আছে।

নাতালিয়াও অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। এক ফোঁটা চোখের জল মুছে ফেলে সে বলেছিল, আমাদের ওপর অন্যায় করেছে তা বোধহয় এখনো ভুলতে পারেনি তাই…। ভালোই হল এলেনার বিয়ের যৌতুক হয়ে যাবে।

কিন্তু ভাইয়ের এই সিদ্ধান্ত পিওতরের মনের ওপর গভীর ছায়া ফেলেছে। তাছাড়া শহরের লোকেরা নিকিতার এই মঠে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে নানারকম অপব্যাখ্যা করেই চলেছে।

আলেক্সির সঙ্গে অবশ্য সে ব্যবসা ভালোই চালাচ্ছে। তবে তার চতুর ভাইটি ব্যবসার সবচেয়ে সহজ কাজটি বেছে নিয়েছে। নিজ্‌নি নভগরদ মেলায় ও বছরে দুবার, মস্কো যাওয়া এইটিই তার বড় কাজ। মস্কো থেকে ফিরে এসে সেখানকার শিল্পপতিদের ঐশ্বর্য ও আদবকায়দার গালভরা গল্প করতো সে। বয়স হলেও যৌবনসুলভ চঞ্চলতা এখনো হারিয়ে যায়নি। ভাইকে সে প্রায়ই বলে, তুমি অমন মুখ গোমরা করে থাকো কেন? ব্যবসা করতে হলে ফুর্তিতে থাকতে হবে, মুখ বেজার করে ব্যবসা চলে না।

এইসব কথায় বাবার সঙ্গে আলেক্সির মিল খুঁজে পায় পিওতর কিন্তু তবু ভাইকে সে ঠিক বুঝতে পারে না। আলেক্সি প্রায়ই সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার শরীর মোটেই ভালো নয় কিন্তু শরীরের যত্ন নেয় না একটুও। রাত জাগা, মদ্যপান, জুয়া খেলা এ ছাড়া নারীঘটিত অসংযমের প্রকাশ তো রয়েইছে। তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য কী? তাকে মনে হয় কোকিলের স্বভাব। অন্যের বাসায় নিজের ছানা রেখে আসা আর কি। উলিয়ানার বাড়িটা সারানো দরকার কিন্তু তার কোনো খেয়ালই নেই। তার ছেলেমেয়েগুলো জন্মায় দুর্বল হয়ে, বেশিদিন বাঁচে না। শুধু একটি ছেলেই টিকে গেল তার নাম মীরন। সাধারণ রুগ্ন চেহারা, পিওতরের বড় ছেলে ইলিয়ার চাইতে তিন বছরের বড়। আলেক্সি ও তার স্ত্রী দুজনেরই স্বভাব অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে ঘর ভরানো। বড়লোকের বাড়ির মতো অজস্র ফার্নিচারও তারা কিনেছে। উপহার দিয়েও সে আনন্দ পায়। পিওতর, নাতালিয়া ও

উলিয়ানাকে আলেক্সি একাধিক সৌখিন জিনিস উপহার দিয়েছে। পিওতর বলতো, রূপো কিনলে কাজে দিত। আলেক্সি তাকে বোঝায় পুরোপুরি ভদ্রলোক হতে গেলে এসবের প্রয়োজন আছে। মস্কোতে নিজের চোখে সে দেখে এসেছে।

পিওতর অনুভব করেছে ভাইয়ের বাড়িতে সে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ নিজের বাড়ির চাইতে। কারণটা কিন্তু তার কাছে সুবোধ্য নয়। যেমন ওর্লোভাকে কেন তার ভালো লাগে তাও সে বোঝে না অথচ নাতালিয়ার পাশে তো তাকে ঝিয়ের মতো দেখায়। বোধহয় নাতালিয়ার মতো তার অহেতুক ভয় ও কুসংস্কার নেই বলে। কেরোসিনের বাতি সম্পর্কে তার কোনো আতঙ্ক নেই আর সে বিশ্বাসও করে না যে আত্মঘাতীদের চর্বি থেকে ছাত্রেরা কেরোসিন চুঁইয়ে বার করে। তার কোমল কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর। চশমা থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তার চোখ দুটি অপূর্ব এবং দৃষ্টি সহৃদয়তায় ভরা। কিন্তু মানুষ ও অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে তার ছেলেমানুষী মন্তব্যে পিওতর বিরক্তি বোধ করে।

তোমার মতে তাহলে কোনো মানুষেরই ত্রুটি নেই?

নিশ্চয় আছে কিন্তু আমি একাই তো তার বিচারক নই।

আলেক্সির সঙ্গে সে এমন ভঙ্গিতে কথা বলে যেন সে বয়সে বড় এবং জ্ঞান বুদ্ধিও তার বেশি। আলেক্সি কিন্তু রাগ করে না। স্ত্রীকে সে অনেক সময়েই 'পিসী' বলে ডাকে। পিওতর আলেক্সিকে একবারই রাগতে দেখেছে।

যথেষ্ট হয়েছে পিসী এবার থামো। আমার অসুস্থ শরীর, একটু-আধটু প্রশ্রয় দিলে ক্ষতি হবে না কিছু।

প্রশ্রয় তুমি যথেষ্টই পেয়েছ, আর দরকার নেই। বলেই সে স্বামীর দিকে তাকিয়ে নীরবে হাসতে থাকে। নিজের স্ত্রীকে এভাবে হাসতে দেখলে পিওতর খুশি হতো। যদিও ঘরণী হিসেবে নাতালিয়া আদর্শ, গৃহকর্মে নিপুণা। ব্যাঙের ছাতা ভুলে জ্যাম তৈরি করে রাখে। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে চাকরবাকরের মতো সে কাজ করে যায়। স্বামীর প্রতি সেবা-পরায়ণতায় তার তুলনা বিরল। স্বামীর প্রতি তার এই ভালবাসা ক্ষীরের মতো ঘন। খরচ করার ব্যাপারেও সে হিসেবী। মাঝে মাঝেই সে জানতে চায়, ব্যাঙ্কে তাদের কত টাকা আছে? ব্যাঙ্কটা ভালো কি না, ফেল পড়বে না তো? টাকা গোনার সময়ে তার সাবধানতা দেখে মনে হয় তার ভয় বুঝি যে কোনো সময়ে টাকাগুলো মাছির মতো উড়ে যেতে পারে। রাতে শোবার

সময়ে সে প্রশ্ন করে, লাভের অংশ তুমি আলেক্সির সঙ্গে কিভাবে ভাগ কর? তোমাকে ঠকাচ্ছে না তো? ওদের দুজনেরই হাতড়ে নেবার তাল। টিখন ছাড়া আমার আর কাউকে বিশ্বাস হয় না। সব চোর।

তার মানে তুমি একটি নির্বোধকে বিশ্বাস কর।

হতে পারে নির্বোধ কিন্তু বিবেকবান।

একবার নাতালিয়াকে সার্কাস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। আর্টিস্টরা মঞ্চে প্রবেশ করতেই নাতালিয়া আতঙ্কে বলে উঠেছিল, ছিঃ ছিঃ, এরা তো দেখছি সব অর্ধ-উলঙ্গ। এই সব নোংরা জায়গায় তুমি আমাকে আনো কেন? আমার পেটে ছেলে রয়েছে না। এবার হয়তো আমার ছেলেই হবে।

এইসব সময়ে পিওতরের মনে হয় তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ভাটারাস্কা নদীর আঠালো শ্যাওলার মতো বিরক্তিতে তার মন ভরে ওঠে। একমাত্র টেঞ্চ মাছ ছাড়া আর কোনো মাছ বাঁচে না ওখানে। আজকাল নাতালিয়া ঘুমিয়ে পড়ার পর তার পাশে শুয়ে মনে হয় নাতালিয়া আর কাম্য নয় তার। এই সব বিদ্বেষের মুহূর্তে পিওতর তাদের প্রথম পুত্রসন্তানের জন্মের ভয়াবহ মুহূর্তগুলো মনে করার চেষ্টা করে।

'একটি উজ্জ্বল ছেলে' ধাই এসে বলেছিল। এমন গর্বভরে সে ছেলেকে দেখাতে লাগল যেন সে-ই প্রসব করেছে। পিওতর ছেলের দিকে তাকাতে ভয় পায়। স্ত্রীর মৃতকল্প মুখ ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ে না।

নাতালিয়া বাঁচবে তো?

বাঁচবে না মানে? তাহলে আর আমি কেমন ধাই?

সেই উজ্জ্বল ছেলের বয়স এখন আট। নাম রাখা হয়েছে ইলিয়া। সত্যিই উজ্জ্বল—দীর্ঘদেহ, স্বাস্থ্যবান, চওড়া কপাল আর নিকিতা ও আলেক্সির মায়ের মতো দীর্ঘায়ত গভীর ঘন নীল চোখ। পরের বছরেই মেজ ছেলে ইয়াকভের জন্ম হয়। কিন্তু ইলিয়াই পাঁচ বছর বয়স থেকে বাড়ির সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে। যদিও সকলের আদরে তার মাথাটি বিগড়ে গেছে। কারো কথা শোনে না, নিজের ইচ্ছামতো চলে ফলে রোজই একটা না একটা বিপজ্জনক কিংবা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ফেলে সে। কিন্তু তার দুষ্টুমিগুলো এমনই অসাধারণ যে বাপের মনে অদ্ভুত একটা অনুভূতি জেগে ওঠে যার নাম এক কথায় গর্ব।

একদিন পিওতর দেখে ইলিয়া একটা কাঠের পিপেতে ঠেলা গাড়ির

চাকা লাগাবার চেষ্টা করছে :

কি তৈরি হচ্ছে ?

স্টিমার।

এ স্টিমার জলে ভাসবে না, চলবে না।

ভাসাবই, চালাবই। ঠাকুদার মতো জেদী কণ্ঠস্বর।

পিওতর মনে মনে বলে, হুঁ, ঠাকুদার স্বভাব পেয়েছে দেখছি। যা করতে চাইবে সফল হোক বা না হোক শেষ পর্যন্ত সে দেখবেই।

স্টিমার কিন্তু শেষ পর্যন্ত তৈরি করা গেল না। তখন সে দুটি চাকা পিপের পাশে লাগিয়ে টানতে টানতে নদীর ধার পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। তারপর নদীতে ভাসাতে গেলে স্টিমার আটকে গেল কাদায়, সে নিজেও কাদায় আটকে গিয়ে বিপদে পড়ে গেল। কিন্তু ভয় পাবার পাত্র সে নয়। কিছুটা দূরে এক ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচছিল। তাদের ডেকে সে বলল, এই যে মেয়েরা আমাকে একটু টেনে তোল না, নইলে ডুবে যাব যে।

বড় ছেলের কাণ্ডকারখানা দেখে পিওতর মনে মনে বলতো, এ ছেলে অসাধারণ হবেই, বোধহয় ইঞ্জিনীয়ারই হবে।

দিন কয়েক পিওতর ছেলের আর দেখাই পায় না। হঠাৎ একদিন সে অফিস-ঘরে এসে বাপের কোলে চড়ে বসলো।

একটা গল্প বলো।

আমার সময় নেই বাবা।

আমারও তো সময় নেই।

পিওতর হেসে ফেলে। কাগজপত্র সরিয়ে রাখতেই হয়। তারপর গল্প বলার চেষ্টা করে। একদা এক কৃষক ছিল···।

ও, কৃষকের গল্প আমি জানি, একটা মজার গল্প বলো।

মজার গল্প আমি জানি না, তুমি দিদিমার কাছে যাও।

দিদিমার সর্দি হয়েছে।

তাহলে মায়ের কাছে যাও।

মা মুখ ধুইয়ে দেবেন।

পিওতর হেসে ফেলে। খুশিতে তার মন ভরে ওঠে। সংসারে একজন তবু আছে যে তাকে হাসায়, মন হালকা করে তোলে।

একদিন দুষ্টুমি করায় নাতালিয়া ছেলেকে মেরেছিল। ইলিয়া রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলেছিল, এরপর যদি আমায় মারো তাহলে তোমার সামনেই আমি মরে যাবো।

একদিন ছেলেকে একান্তে ডেকে পিওতর প্রশ্ন করেছিল, তুমি মার সঙ্গে অমন রূঢ় ব্যবহার কর কেন?

মা মারেন কেন? টিখন বলে বোকাদেরই শুধু মারা হয়।

টিখন নিজেও তো···।

যে কোনো কারণেই হোক পিওতর ছেলের সামনে টিখন সম্পর্কে বিরূপ কোনো মন্তব্য করল না।

ছেলেকে কি ভাবে গড়ে তুলবে পিওতর ভেবে পায় না। ছেলেও তা জানে। কান টেনে ধরে উত্তমমধ্যম দিলে হয় কিন্তু অমন সুন্দর চোখ, কোমল মুখশ্রী—পিওতরের হাত উঠতে চায় না। তাছাড়া কড়া রোদ উঠলে পিওতরের অস্বস্তি হয়। আর মজা এই যে ইলিয়া সাংঘাতিক কাণ্ড সব বাধিয়ে তোলে এইসব উত্তপ্ত উজ্জ্বল দিনেই।

দ্বিতীয় ছেলে ইয়াকভ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সে হয়েছে ঠিক মায়ের মতো। নরম নরম গোলগাল চেহারা, ছিঁচকাঁদুনে এবং লোভী। সব সময়েই এটা-সেটা খাচ্ছে, নয়তো বায়না করছে। প্রচুর খায়, ঘুমোয় আর ঘ্যানঘ্যান করে।

বড় মেয়ে এলেনা গরমের ছুটিতে বাড়ি আসে। সে এখন তরুণী, কেমন যেন পর পর মনে হয়।

সাত বছর বয়সে ইলিয়াকে ফাদার গ্লায়েবের কাছে পড়তে পাঠানো হলো। কিছুদিন পরে সে বাবার কাছে বিক্ষোভ জানাতে এল।

আমি আর পড়তে যাবো না, আমার জিভ ব্যথা করে।

'বাবা বাছা' বলে অনেক আদর করার পর পিওতর জানতে চাইল পড়াশোনায় তার অনিচ্ছার প্রকৃত কারণ কি? তখন সে বললে কেরানী নিকোনোভের ছেলে পড়ে ছবিওলা বই 'নিজের দেশকে জানো' আর তাকে কিনা পড়তে হয় দুর্বোধ্য ধর্মপুস্তক।

দুরন্ত প্রকৃতির হলেও ইলিয়া মাঝে মাঝে কেমন যেন অন্যমনা হয়ে যায়। এক এক দিন তাকে দেখা যায় টিবির ওপর পাইন গাছের ছায়ার নিচে চুপচাপ বসে থাকতে। পিওতর তখন ভাবে এখানকার যান্ত্রিক পরিবেশ বোধহয় ওকে বিষণ্ন করে তুলছে। সে নিজেও তো দিনের পর দিন কানে তালা ধরানো শব্দের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে হাঁপিয়ে উঠছে। কাজের একঘেয়েমি জনিত বিরক্তিতে সেও তো ভাবনা-চিন্তার ঘন অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইসব দিনে যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই ঘেন্না লাগে। বিশেষ করে টিখন ভায়ালোভকে।

টিখনকে দেখা গেল উলিয়ানার হাত ধরে নিয়ে আসছে। তার বক-বকানিও কানে এল। আমাদের মস্ত সংসার, বুঝলেন ?

পিওতর কাছে এগিয়ে গিয়ে ঝাঁঝালো কণ্ঠে প্রশ্ন করে, তাহলে তুমি তাদের সঙ্গে গিয়ে থাকো না কেন ?

টিখন বর্ণহীন দৃষ্টি মেলে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলে, কেউ নেই বলে। তাদের সব নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে।

'নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া' বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ ?

আমার দুই ভাইকে সিবাস্তোপোলে জোর করে পাঠানো হয়, সেখানে তাদের মৃত্যু ঘটে। এদের মধ্যে বড়জন কৃষকদের মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। আমাদের বাবাও এই সংগ্রামের শরিক হয়েছিলেন এবং আলুর চাষ করতে অস্বীকার করেছিলেন কারণ তখন আলু খাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। ওরা তাকে চাবুক মারতেই সে পালায় কিন্তু পায়ের তলার বরফ গলে যেতেই সে ডুবে যায়। তারপর মা আবার বিয়ে করেন এবং আমরা দুই ভাই জন্মাই। আমি আর সার্গেই।

উলিয়ানা জানতে চাইল তার ভাই এখন কোথায় ?

তাকেও মেরে ফেলা হয়েছে।

কে মেরে ফেললো ? পিওতর প্রশ্ন করে।

মানুষেই মেরেছে, আবার কে? শান্ত নির্লিপ্ত ভাবে উত্তর দেয় টিখন।

কিছুদিন হল কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে রোগভোগ দেখা দিয়েছে। টাকুর গুনগুন, মাকুর খুটখাট শব্দের মধ্যে পিওতর শুনতে পায় শুকনো কাশির খকখক শব্দ। শ্রমিকদের মধ্যে কেমন একটা ঢিলেঢালা ভাব। উৎপাদন কমে যাচ্ছে, কাপড় তৈরি হচ্ছে আগের চেয়ে অনেক নিরেস। কামাইয়ের সংখ্যা বাড়ছে। একদিকে পুরুষেরা মাত্রাতিরিক্ত মদ খাচ্ছে, অন্যদিকে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। ছুতোর মিস্ত্রী সেরাফিম এখন খুবই ব্যস্ত ছোট ছোট কফিন তৈরি করতে। লোকটি কিন্তু বেজায় রসিক, দারুণ ফুর্তিবাজ। শিশুর মতো রক্তিম তার গাল।

পিওতর অনুভব করল এদের বিশ্রাম প্রয়োজন। মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও করা দরকার। একদিন স্ত্রীকে বলল, একটা উৎসবের আয়োজন কর। উৎকৃষ্ট মদ ও উৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা যেন থাকে। আমোদপ্রমোদই এই অসুখের একমাত্র চিকিৎসা।

বনভোজনের আগে প্রার্থনানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হল। ফাদার গ্রায়েব অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করালেন। বেশ রোগা হয়ে গেছেন তিনি। তাঁর

ভাঙা গলায় অনভ্যস্ত শব্দগুলোর উচ্চারণ অত্যন্ত করুণ হয়ে বাজছিল। মেয়েদের মধ্যে অনেকে তো কাঁদতে শুরু করে দিল। ফাদার গ্লায়েব যখন ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে দ্যুতিহীন সূর্যের দিকে তাকিয়েছিলেন তখন সমবেত জনতা তাঁর দৃষ্টির অনুসরণ করে আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। তারা বোধহয় ভাবছিল ফাদার বোধহয় আকাশে কাউকে দেখছেন যিনি তাঁকে চেনেন এবং তাঁর প্রার্থনা শুনছেন।

প্রার্থনানুষ্ঠান শেষ হলে মেয়েরা ধরাধরি করে টেবিল নিয়ে পাতলে রাস্তার ওপর। শ্রমিকেরা সুশৃঙ্খল ভাবে খেতে বসে গেল। প্রত্যেকের সামনে কাঠের বড় বড় বাটিতে মাংস। ভারসিমেল্লি দিয়ে তৈরি ভেড়ার মাংস। প্রাণ ভরে খাও। ভড্‌কা আর বীয়ারের অঢেল ব্যবস্থা। ব্যবস্থাপনার গুণে মানুষগুলো আবার তাদের হারিয়ে যাওয়া উৎসাহ উদ্দীপনা ফিরে পেল। কাঠের চামচের খটখটানি, শিশুদের কলরোল, মেয়েদের হাঁকাহাকি ও পুরুষদের উচ্চ হাসিতে ঘুমন্ত গ্রামখানি প্রাণচঞ্চলতায় জেগে উঠল।

ঘণ্টা তিনেক চলল এই পানভোজন। মাতালদের ও শিশুদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। ছেলেছোকরারা ঘিরে ধরল সেরাফিমকে। সেই কফিন নির্মাতা। বয়স হলেও সেরাফিমের চোখে মুখে আজও শিশিরের স্নিগ্ধতা। স্বর্গীয় সুখের পরশ মাখানো উজ্জ্বল চোখে আলোর রোশনাই। নামটি তার সার্থক। সেরাফিম মানে দেবোপম পবিত্রতা, স্বচ্ছ আলোর দীপ্তি।

বেঞ্চির ওপর বসে কোলের ওপর বাজনাখানা রেখে আঙুলের স্পর্শে সে সুর তুলতে থাকে। তারপর গান ধরে। যীশুর যশোগান। আজকের পরিবেশটা ঠিক ভক্তিভাবের নয় তাই যীশুর বন্দনা গানের পর সেরাফিম বাজনায় লঘু সুর বাজাতে থাকে, নৃত্যেরই আবহসঙ্গীত। মেয়েদের দিকে তাকায় বার বার, এদের মধ্যে তার মেয়ে ঝিনাইদাও রয়েছে। আগুনের শিখার মতো রূপ ও যৌবন তার। ক্ষীণ কটি, ঈষৎ গুরু নিতম্ব, ভারী বুক। আপাত পেশা তার সেলাইয়ের কাজ।

ঝিনাইদা উঠে এল। জিপসীদের ভঙ্গিমায়, হাত দুটিকে মাথার পিছনে নিয়ে এল তারপর স্তনদ্বয় কাঁপিয়ে দিল নিবিড় থরে থরে। বাজনার স্পন্দিত সুরের তালে তালে নাচতে লাগল সে। যুবক-যুবতীরা ওকে ঘিরে নাচে গানে উদ্দাম দুর্বার হয়ে উঠল। মীনকেতনের কেতন উড়িয়ে যাযাবর যৌবনের সুরাস্রোতে সিক্ত হয়ে উঠল যেন সবাই।

একপ্রান্তে কাঠের গাদার ওপর বসে ইলিয়া ও নিকোনোভের ছেলে

পাভলুসকা নাচ দেখছিল। হাড়জিরজিরে কঙ্কালসার চেহারা এই পাভলুসকার। তার ওপর মাথায় চুল নেই, বুড়োদের মতোই দেখায় তাকে। যেমন অসুস্থ দেখতে তেমনি ধূসর চোখে লুব্ধদৃষ্টিতে সে ঝিনাইদাকে দেখছিল। ইলিয়ার কিন্তু ঝিনাইদার ভাবভঙ্গি মোটেই ভালো লাগছিল না। শিস দেওয়া, চরকির মতো ঘুরে ঘুরে নাচের চাইতে সেরাফিমের বাজনা ও গান তার অনেক ভালো লাগছিল।

পাভলুসকা ইলিয়ার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল, ঝিনাইদার স্বভাবচরিত্র মোটেই ভালো নয়। এমন কোনো পুরুষ নেই যার সঙ্গে ও শোয়নি। এমনকি তোমার বাবার সঙ্গেও। আমি নিজের চোখেই দেখেছি ওকে জড়িয়ে ধরেছেন তোমার বাবা।

কেন? ইলিয়ার সরল মনের প্রশ্ন।

কেন আবার? বুঝতে পারো না!

ইলিয়া বিরক্ত হয়ে চোখ সরিয়ে নিল। লজ্জাও পেল বন্ধুকে বোকার মতো প্রশ্ন করে ফেলায়।

মিথ্যুক কোথাকার। ছেলেটার মিনমিনে ভাব ও ভীরু প্রকৃতির জন্যে ইলিয়া তাকে পছন্দ করে না মোটেই। কারখানার মেয়েদের সম্পর্কে ওর ঘিনঘিনে গল্প, একঘেয়ে বিরক্তিকর নালিশ মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না ইলিয়া। কোনো ভালো জিনিস ওর নজরে পড়ে না, যা কিছু ও দেখে এবং বর্ণনা করে সবই 'কু'। তবু যে ইলিয়ার ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে তার দুটি কারণ। প্রথমত, ইলিয়া পায়রা পছন্দ করে, আর এই ছেলেটা পায়রা ধরতে ওস্তাদ। দ্বিতীয়ত, ক্ষীণজীবী বলে কারখানার ছেলেদের অত্যাচারের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে পেরে ইলিয়া গর্ব অনুভব করে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর ইলিয়া পাভলুসকার পাশ থেকে উঠে এল। বাড়ি ফিরে সে দেখল তখনো বাগানে অতিথিরা চা খাচ্ছেন। একটি টেবিলে বসে আছে ফাদার গ্লায়েব, ইঞ্জিনীয়ার কপতিয়েভ ও কেরানী নিকোনোভ।

ইলিয়া বাপের পাশে গিয়ে বসল। ইলিয়া বিশ্বাস করতেই পারছিল না সর্বদা গম্ভীর এই মানুষটির সঙ্গে ওই নির্লজ্জ ঝিনাইদার অমন একটি সম্পর্ক থাকতে পারে। তার পিঠের ওপর হাত রেখে বাবা টোকা দিচ্ছিলেন। প্রচণ্ড গরমে সবাই দরদর করে ঘেমে নেয়ে উঠেছিল। সবাই এত ক্লান্ত যে কারো যেন আর কথা বলার উদ্যম নেই। শুধু কপতিয়েভেরই পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, যেন কুয়াশাঘেরা শীতের রাতে সে বসে আছে।

নাতালিয়া এসে জানতে চাইলে, এখন আমরা গ্রামের দিকে বেড়াতে যাবো তো?

হ্যাঁ, আমি জামাকাপড় পাল্টে আসি। পিওতর ঘরের দিকে রওনা হতেই ইলিয়া তার অনুসরণ করল। ঠিক সিঁড়ির মুখটায় সে বাবার পথ আগলে দাঁড়াল।

কি ব্যাপার ইলিয়া? সস্নেহে বলল পিওতর।

'তুমি কি ঝিনাইদাকে জড়িয়ে ধরেছিলে? ধরনি তো?

ইলিয়ার মনে হলো তার বাবা যেন কেমন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ইলিয়া অবশ্য এতে আশ্চর্য হল না কারণ বাবাকে তার ভীতুই মনে হয়। সব কিছুকে, সবাইকেই তিনি ভয় পান তাই বোধহয় সব সময় বিরস বদনে থাকেন। ইলিয়ার মনে হয় বাবা তাকেও ভয় পান। তাই বাবাকে সাহস দেবার জন্যেই যেন সে বলল, আমি বিশ্বাস করি না শুধু জিজ্ঞেস করছি।

পিওতর তাকে ঠেলতে ঠেলতে বারান্দা দিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। তারপর শব্দ না করে দরজায় খিল এঁটে দিল। ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে সে পায়চারি করতে লাগল। খুব রেগে গেলে এমনটাই সে করে। একসময় টেবিলের পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে ছেলেকে কাছে ডাকল।

কি বলছিলে তুমি?

পাভলুসকা বলছিল কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি।

বিশ্বাস করনি? অ্যাঁ!

পিওতর অনুভব করল ছেলের ওই সুন্দর মুখখানির দিকে তাকিয়ে তার রাগ যেন উবে যাচ্ছে। কান টানতে টানতে সে বুঝতে চাইছিল তার ছেলে যে ওই বদছেলেটার কথায় বিশ্বাস করেনি এটা ভালো না খারাপ। বাপকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা থেকেই বোঝা যাচ্ছে বিশ্বাস সে করেনি। ছেলেকে এখন কি বলা যায় স্থির করে উঠতে পারছে না সে। মারবে না নিশ্চয়। কিন্তু কিছু তো একটা করা দরকার। অবশেষে সে সিদ্ধান্তে এল সবচেয়ে সহজ কাজ হচ্ছে মারা। সুতরাং অনেক কষ্টে সে তার অনিচ্ছুক হাতখানা তুলে ছেলের কুঞ্চিত চুল মুঠো করে ধরে বলল, বোকাদের কথায় কান দেবে না, বুঝলে? মোটেই কান দেবে না।

ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে সে বলল, যাও নিজের ঘরে গিয়ে বসো, আর ওখানেই এখন তোমাকে থাকতে হবে, বুঝলে?

ইলিয়া দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মাথাটা একদিকে হেলে পড়েছে,

এমনভাবে সে হাঁটছে যেন মাথাটা তার নয়, মাথাটাকেই সে টেনে নিয়ে চলেছে।

ছেলে চলে যেতেই পিওতর আবার ধন্দে পড়ে গেল।

কাঁদছে না তো, লাগেনি বোধহয়। আমি তো তেমন আঘাত করিনি। নিজেকে রাগে উত্তপ্ত করে তোলার চেষ্টায় সে আবার বলল, পাজি ছেলে, তুমি বিশ্বাস করনি, তাই না। আশা করি আজকের শিক্ষা তোমার মনে থাকবে।

কিন্তু তার এই চিন্তাধারা তাকে শান্তি দিতে পারল না কারণ এতে না চাপা পড়ল ছেলের ওপর মমত্ববোধ, না গেল তার নিজের ওপর রাগ।

এই প্রথম আমি ওকে মারলাম। ওর বয়সে আমি কম করে একশোবার মার খেয়েছি। এতেও কোনো সান্ত্বনা পাওয়া গেল না। তখন সে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। নদীর ঘোলা জলে তখন সূর্যের আলো তেলের মতো ভাসছে আর গ্রাম থেকে ভেসে আসছে একটানা উল্লাসের শব্দ। দ্বিধাগ্রস্ত-ভাবে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্যে। পথেই দেখা হলো নিকোনোভের সঙ্গে। তাকে সে বলল, তোমার সৎছেলেকে সমঝে দিও আমার ছেলের কানে যেন আজেবাজে চিন্তা ঢুকিয়ে না দেয়।

তা আর বলতে, এমন উত্তমমধ্যম দিয়ে দেব—

খুশি-খুশি ভাবে বলল নিকোনোভ।

হ্যাঁ, ওকে মুখ সামলে চলতে শিখিও।

শ্রমিক-বসতির মানুষেরা তাদের মনিব আর মনিবগিন্নীকে সানন্দে স্বাগত জানাল। খুশিতে চকচক করছে সকলের মুখ, মনিবের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। সেরাফিমই সকলকে ছাড়িয়ে গেল।

দ্যাখো দ্যাখো কে এসেছেন। হ্যাঁ তিনি সশরীরে উপস্থিত আর সঙ্গে তিনি এনেছেন তাঁকে।

ইভান মরোজোভ বলল, হুজুর আমরা খুবই খুশি হয়েছি। হ্যাঁ সত্যিই আপনার ব্যবহার আমাদের মুগ্ধ করেছে।

আরো অনেকেই নিজের নিজের ভাষায় প্রভুর গুণগান করে গেল। নিকোনোভ কপতিয়েভকে বলল, লোকগুলোর কৃতজ্ঞতাবোধ আছে বলতে হবে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষাও ওরা জানে।

পিওতর সকলকে শুনিয়ে বলল, ঠিক আছে বন্ধুগণ, আমি জানি আমরা সবাই এখানে বন্ধুর মতো আছি।

পিওতর বিষণ্ণচিত্তে ভাবছিল, হায় ইলিয়া দেখতে পেল না তার বাবাকে

সবাই কেমন সম্মান জানালো। যাই হোক শ্রমিকদের সম্মান জানানোর বিনিময়ে সে ঘোষণা করলো, বাচ্চাদের হাসপাতালটি দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে এবং আরো তিন ব্যারেল মদ নিয়ে আসার আদেশ দিল।

পিওত্তরের কথায় মেয়েদের মধ্যে উল্লাসের ধ্বনি উঠল। নিকোনোভ অভিভূত ভঙ্গিতে বলল, আহা ঠিক যেন গির্জার বিশপকে অভিনন্দন জানাচ্ছে ওরা।

এমন সময় কিছুটা রসভঙ্গ করল বলকভ। বয়লারে কয়লা ঝাড়ে সে। তার কোলে একটি বাচ্চা। বাচ্চাটি গরমে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, ঝুলে পড়েছে বলকভের কোল থেকে। তার নীলচে সাদা গায়ের চামড়ায় ফোস্কার দগদগে ঘা। নাতালিয়ার কাছে এগিয়ে এসে বলকভ কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, আমি এখন একে নিয়ে কি করি, আমার বউটা গরমে মরে গেল, একে রেখে গেল আমার কাছে, আমি এখন কি করি?

সবাই মিলে তখন জোর করে লোকটিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। কয়েকজন এসে মনিবের কাছে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে এসে বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না। লোকটার মাথা খারাপ। ওর বউ এমনিতেই মারা গেছে, যক্ষা হয়েছিল কিনা, ও নিজেও ওই রোগেই ভুগছে।

পিওত্তর বলল, সে যাই হোক তোমরা কেউ ওর কোল থেকে বাচ্চাটিকে নিয়ে নাও।

মোটের ওপর একটা ছুটির দিন, প্রীতি অনুষ্ঠানের দিন, ভালোভাবেই কাটলো।

'লোকসংখ্যা কত বেড়ে গেছে, আহা বাবা দেখলে কতই না খুশি হতেন'—নতুন নতুন মুখ দেখতে দেখতে পিওত্তর আপনমনে বলছিল।

হঠাৎই পাশ থেকে নাতালিয়া অনুযোগের সুরে বলে উঠল, আজকের দিনে ইলিয়াকে তুমি না মারলেই পারতে। বেচারা দেখতে পেল না তার বাবাকে সবাই কেমন সম্মান করে।

পিওত্তর কিছু বলল না। আড়চোখে সে একবার ঝিনাইদাকে দেখে নিল। ঝিনাইদা তখন কয়েকজন মেয়েকে নিয়ে বেসুরো গলায় গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ছাখো ছাখো আমায় নাচতে দেখে জুলজুল করে দেখছে কেমন।
অধীর হয়ে দেখছে সে, আমারই জন্যে জ্বলছে যে।

বেহায়া মেয়ে। গানটাও অশ্লীল। মনে মনে বলল পিওত্তর।

পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখে নিয়ে কেন জানি সে বউকে মিথ্যা কথা বলে বসল।

আমাকে এখনই বাড়ি যেতে হবে। আলেক্সির কাছ থেকে টেলিগ্রাম আসার কথা আছে।

ছেলেকে কি বলবে ভাবতে ভাবতে সে চলার গতি বাড়িয়ে দিল। কঠিন অথচ ভালোবাসা প্রকাশ পায় এমন কয়েকটা কথা ভেবে নিল সে। কিন্তু ছেলের ঘরের ভেজানো দরজা খুলতেই সব ভুলে গেল আবার। চেয়ারের ওপর হাঁটু গেড়ে, জানলায় কনুই রেখে ইলিয়া ধোঁয়াটে লাল আকাশের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে। গোধূলির আলো এসে ঘরটাকে কেমন যেন লাল ধুলোয় ভরে দিয়েছে।

কি করছো তুমি ওখানে ?

ইলিয়া চমকে ফিরে তাকাল তারপর চেয়ার থেকে হাঁটু সরিয়ে বাপকে একবার দেখে নিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মাথা নিচু করে কেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও।

ইলিয়া মুখ তুলল বটে কিন্তু বাপের দিকে তাকাল না।

'হুঁ, রাগ হয়েছে'। তারপর চেঁচিয়ে বলল, বাজে কথা শোনা তোমার উচিত হয়নি, বুঝলে ?

আমি কি করতে পারি যদি লোকে বাজে কথা বলে।

ছেলের স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনে পিওতরের ভালো লাগলো। নরম সুরে এবার সে বলল, লোকেরা অনেক বাজে কথাই বলে, ওসব শুনতে নেই। ওসব ভুলে যাও। যদি কেউ বাজে কথা বলতে আসে তবে তাকেও ভুলে যাবে। বুঝলে কি বললাম ?

বুঝেছি। ভুলে তো যাবোই, সব কথা মনে রাখলে আমার অবস্থা কি দাঁড়াবে।

ছেলেটা সহজ কথায় ভাব প্রকাশ করতে শিখেছে দেখছি। বিস্মিত হয়ে সে ছেলের মানসিক পরিণতি লক্ষ্য করে। স্নেহের সুরে সে ছেলেকে ডাকে, আমার কাছে এসো।

ইলিয়া গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসছিল। পিওতর এগিয়ে গিয়ে তার চওড়া কপালে হাত রাখল। কিন্তু যখনই সে বুঝল, ছেলে মাথা তুলবে না তখন সে কিছুটা মুষড়ে পড়ল।

তুমি এত একগুঁয়ে কেন ? আমার মুখের দিকে তাকাও।

ইলিয়া তার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাল কিন্তু তার প্রশ্ন শুনে

মনে হল, না তাকানোই ছিল ভালো।

তুমি আমায় মারলে কেন? আমি তো বললামই পাভলুসকার কথা আমি বিশ্বাস করিনি।

পিওতর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর খুঁজে পেল না। বিস্ময়ের সঙ্গে সে লক্ষ্য করল তার ছেলে কখন জানি তারই সমপর্যায়ে উঠে এসেছে। কোন্ অলৌকিক উপায়ে এমনটি ঘটল তা সে বুঝে উঠতে পারল না। হয় ছেলে বয়স্কদের মতো মানসিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে নয়তো সে শিশুর পর্যায়ে নেমে এসেছে।

'বয়সের তুলনায় বেশি পরিণত—' ভাবতে ভাবতে পিওতর তাড়াতাড়ি কথা বলা শুরু করল যাতে ছেলের সঙ্গে একটা মিটমাট হয়ে যায়।

আমি তোমাকে মোটেই মারিনি। গুরুজনদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় শেখো। আমার বাবা আমাকে সব সময়েই মারতেন। শুধু বাবা নন, মাও বকতেন, অন্যান্যেরাও মারতো। তুমি তো সেদিক দিয়ে ভাগ্যবান। গুরুজনরা কেউ মারলে অপমানকর মনে হবে কেন? হ্যাঁ বাইরের কেউ মারলে কান্না পেতেই পারে। মা বাবার হাত অনেক হাল্কা।

পিওতর তাড়াতাড়ি কথা বলা শেষ করে ফেলতে চায় কারণ সে ভয় পাচ্ছে ছেলে আবার না কিছু প্রশ্ন করে বসে। পায়চারি করতে করতে সংলাপ ভেবে নিয়ে সে বলল. যা দেখা উচিত নয় শোনা উচিত নয় তুমি তাই দেখে শুনে বেড়াচ্ছো। তোমাকে ভাবছি স্কুলে পাঠিয়ে দেব। লেখাপড়া শিখতে চাও?

'হ্যাঁ চাই।

বেশ, আমি ব্যবস্থা করছি।

ছেলেকে তার খুব আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু সে পেরে উঠল না। তার মনে পড়ছে না পুরনো দিনে তার অভিভাবকরা মারার পর তাকে আদর করত কি না।

যাও এখন খেলতে যাও তবে পাভলুসকার মতো ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না।

ওর সঙ্গে খেলার, ওকে দেখার কেউ নেই।

ওই রকম এক বদ ছেলেকে দেখাশোনা করার কারুর প্রয়োজন নেই।

পিওতর নিজের ঘরে ফিরে এসে ব্যর্থতার জ্বালায় জ্বলতে লাগল। আমিই ওকে খারাপ করে দিয়েছি, আমাকে আর ও ভয় পায় না। —ভাবে পিওতর। শ্রমিকদের গ্রাম থেকে নানান ধরনের শব্দ তার কানে

ভেসে আসছে। মেয়েদের গান, কলকাকলি, বাজিয়েদের সঙ্গীতযন্ত্রের সুরসংঘাত আরো অনেক কিছু। টিখনের গলার স্বর শুনে তার চমক ভাঙলো। বড় ছেলে ইলিয়ার সঙ্গে টিখন কথা বলছে শুনতে পেল সে।

এই ছেলে, ঘরে বসে কি করছো? বাইরে চলছে উৎসব আর নিজেকে তুমি বন্দী করে রেখেছ ঘরে। তুমি বোধহয় এবার স্কুলে যাবে। ঠিক বলেছি কি না? খুব ভালো। কথায় বলে লেখাপড়া যে শেখেনি তার জন্মই হয়নি। যদিও তুমি চলে গেলে এখানে আমার খুব একঘেয়ে লাগবে।

পিওতরের ইচ্ছে হলো চিৎকার করে বলে, না না তুমি নও, ওর অভাবে আমিই শুধু বিষন্ন হয়ে থাকবো। পরক্ষণেই মনে মনে সে বলল, পাষণ্ডটা মনিবের ছেলেকে খোশামোদ করছে।

শহরে চলে গেল ইলিয়া। সেখানে ফাদার গ্লায়েবের ভাই ওকে স্কুলে ভর্তি করার মতো করে তৈরি করে দেবে। তিনি একজন শিক্ষক। কিন্তু ইলিয়া চলে যাবার পর থেকে বুকটা তার বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কী যেন একটা হারিয়ে গেছে শূন্যতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় সে। শোবার ঘরে আইকনের কাছে নীল বাতিটা না জ্বললে যেমন অস্বস্তি হয় তেমন একটা অস্বস্তিতে তার মন ছটফট করে। সারা রাত তার প্রায় জেগেই কাটে।

যাবার আগে ইলিয়া সকলের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে গেল। ভাবখানা যেন এই সবাই যেন তাকে ভুলে যায়। দুর্ব্যবহারে মাকে কাঁদিয়ে ছাড়তো। ছোট ভাই ইয়াকভের পাখিগুলো খাঁচা থেকে ছেড়ে দিয়ে পাভলুসকাকে দিয়ে দিল।

পিওতর একদিন ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, তোমার স্বভাব এত রুক্ষ কেন? উত্তর দেয় না ছেলে। মাথাটা একদিকে হেলিয়ে সে এমন গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যেন বাপকে মনে করিয়ে দিতে চায় সেই অস্বস্তিকর ব্যাপারটা। ছেলেটা কেন যে তার বুকের এতখানি জায়গা দখল করে আছে বুঝতে পারে না সে।

আচ্ছা আমার বাবা কি আমার জন্যে এতটা ভাবতেন? তার স্মৃতি বলে—না। আমার কথা মোটেই উনি চিন্তা করতেন না। ভালোবাসতেন উনি আলেক্সিকে।

বাবা কি আমার চাইতে স্নেহময় ছিলেন? চিন্তাসূত্রে কেমন যেন জট পাকিয়ে যায়। সে কি সত্যিই স্নেহময়? এইসব চিন্তাগুলো কাজের সময়েই প্রবল হয়ে ওঠে ফলে সে স্বস্তি পায় না মোটেই। ব্যবসা লাফিয়ে লাফিয়ে

বেড়ে চলেছে, শত শত চোখ মনিবের দিকে তাকিয়ে আছে, তার মনোযোগ তারা দাবী করছে কিন্তু ইলিয়া তার মনোসংযোগে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। ব্যবসা সংক্রান্ত তার চিন্তাভাবনা পচা সুতোর মতো বার বার ছিঁড়ে যায়। ছিন্ন-সূত্রগুলোকে জোড়া দিতে বেগ পেতে হয় তাকে। ছোট ছেলে ইয়াকভের দিকে বেশি মন দিয়ে সে ইলিয়ার অভাব ভুলতে চেয়েছিল কিন্তু হতাশ হয়ে তাকে মেনে নিতে হয়েছিল ইয়াকভ ইলিয়ার বিকল্প নয়। ইয়াকভ তাকে কোনো সান্ত্বনাই দিতে পারে না।

বায়না করা ছাড়া ইয়াকভের কোনো কথাই নেই। বাবা আমাকে একটা ছাগল কিনে দেবে?

কেন ছাগল দিয়ে কি হবে?

আমি চড়বো।

কী উদ্ভট তোমার চিন্তা! ছাগলের ওপর চড়ে তো ডাইনীরা।

কিন্তু আমি একটা ছবির বইতে দেখেছি একটা ছেলে ছাগলের পিঠে চড়েছে।

পিওতর কখনো ও ছবি বিশ্বাস করতো না আর ডাইনীদের গল্পও সে শুনতে চাইত না। ইয়াকভের এর-তার বিরুদ্ধে নালিশ করাও তার খুব খারাপ লাগে। কারখানার শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের পিছনে লাগবে, তাদের মারধোর করবে আবার তাদের নামে নালিশও করবে। বড় ছেলেও মারপিট করতো কিন্তু মার খেলে সে কারো বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে আসতো না। কিন্তু ইয়াকভ, ভীরু, অলস এবং লোভী। সব সময় সে কিছু না কিছু চিবুচ্ছে। ওর হাবভাব বোঝাও মুশকিল। একদিন নাতালিয়া ওরই জন্যে চায়ে গরম দুধ মেশাচ্ছিল। জামার হাতায় লেগে গরম দুধের বাটি উল্টে গিয়ে নাতালিয়ার হাত পুড়ে যায়। ইয়াকভ হি হি করে হাসতে হাসতে বলে, আমি জানতাম দুধের বাটি উল্টোবে।

পিওতর বিরক্ত হয়ে বলে, জানতে তো মাকে সাবধান করে দাওনি কেন?

ইয়াকভ কিছু না বলে চোখ পিট পিট করে চিবুকে হাত বোলাতে থাকে। পিওতর মনে মনে বলে, হাঁদা, গবেট কোথাকার!

বড় মেয়ের স্বভাবও ইয়াকভের মতোই বিরক্তিকর। সব সময়েই সে চুপচাপ, কারো সঙ্গেই বিশেষ কথা বলে না, শুধু শুয়ে শুয়ে বই পড়ে। চায়ের সময় খায় অনেকটা জ্যাম। আর খাবার সময়ে রুটি নিয়ে সরু সরু আঙুল দিয়ে এমনভাবে নাড়াচাড়া করে কিংবা চামচ নাড়ে যেন তার

পাতে মাছি পড়েছে। তাকে সব সময়েই দেখা যায় দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে। মাকে প্রায়ই সে বলে, আজকাল ওসব কেউ করে না, ওসব রীতি তামাদি হয়ে গেছে।

বাপ একদিন তাকে বলল, ওহে বিদূষী মেয়ে, কারখানার ভিতরে ঢুকে কোনোদিন তো দেখেও এলে না তোমার পরনের কাপড় কি ভাবে তৈরি হয়।

মেয়ে উত্তর দেয়, আচ্ছা যাবে৷ একদিন।

একদিন সেজেগুজে, কাকার দেওয়া সুন্দর ছাতাটি নিয়ে অনুগ্রহের মতো সে কারখানার ভিতরে ঢোকে। তার পোশাকে যাতে কিছু না লাগে সেদিকেই তার সতর্ক দৃষ্টি কয়েকবার সে হাঁচে। শ্রমিকদের নমস্কারের বিনিময়ে সে একটি কথাও না বলে শুধু মাথাটি নাড়ায়, তাতে গর্বের ভঙ্গীটি বেশি করে প্রকাশ পায়। তার বাবা তাকে বোঝাতে যায় কিভাবে কাজ হচ্ছে কিন্তু সে লক্ষ্য করে মেয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে, কিছুই শুনছে না। মসিনগুলোর দিকে তো তার চোখই নেই। কাজের প্রতি মেয়ের এই অবজ্ঞায় বাপের মন আহত হয়।

কারখানা থেকে বেরিয়ে এসে বাপ জিজ্ঞেস করে, কি বুঝলে?

জামাকাপড়ে কোথাও নোংরা লেগেছে কি না পরীক্ষা করতে করতে মেয়ে জবাব দেয়, বড্ড ধুলো।

পিওতর মৃদু হেসে বলে, কিছুই তো দেখলে না। পরক্ষণেই বিরক্তিতে চিৎকার করে বলে, কি সেই তখন থেকে বার বার স্কার্ট তুলে ধরছো, এখানে মোটেই ধুলো নেই, তাছাড়া তোমার স্কার্ট এমনিতেই ঝুলে ছোট।

দুই আঙুলের মাঝে ধরে রাখা স্কার্টের প্রান্ত সে ছেড়ে দেয়। তারপর মৃদুস্বরে বলে, বড্ড তেলের গন্ধ।

পিওতর বিরক্ত হয়ে বলে, ওই দুটো আঙুল দিয়ে জীবনে কোনো কিছুই করে উঠতে পারবে না তুমি।

এক বৃষ্টির দিনে সে সোফায় হেলান দিয়ে বই পড়ছিল। পিওতর কাছে গিয়ে জানতে চাইল, কি বই পড়ছে সে।

একজন ডাক্তারের কথা।

ও। বিজ্ঞানের বই।

কিন্তু বইখানির দিকে তাকাতেই পিওতর রাগে ফেটে পড়ল। মিথ্যে কথা কেন বললে? এ তো দেখছি ছন্দে লেখা। বিজ্ঞান কি আজকাল

কবিতায় লেখা হচ্ছে ?

মেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বলতে থাকে, ভগবান শয়তানকে বলেছিলেন এক ডাক্তারকে প্রলুব্ধ করতে। শয়তান ডাক্তারকে ফাঁদে ফেলার জন্যে তার এক অনুচরকে পাঠায়। পিওতর কান টানতে টানতে মেয়ের বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করছিল। কিন্তু মেয়ের উপদেশ দেবার বিরক্তিকর ঢঙ দেখে কিছুই সে বুঝে উঠতে পারে না। প্রশ্ন করে সে, ডাক্তারটা মাতাল ছিল নাকি ?

এলেনা বিব্রত বোধ করে। এদিকে পিওতর মেয়ের ব্যাখ্যায় আর মন না দিয়ে মন্তব্য করে, উদ্ভট গল্প! রূপকথা নিশ্চয়ই ডাক্তার কখনো শয়তান-টয়তান বিশ্বাস করতে পারে না। কোত্থেকে বইটা পেলে ?

ইঞ্জিনিয়ার দিয়েছে।

পিওতরের মনে পড়ল এলেনার ধূসর বেড়ালের মতো চোখে একদৃষ্টে শূন্যে চেয়ে থাকা সে লক্ষ্য করেছে তাই তাকে সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করে সে বলল, ক্রপাতিয়েভ মোটেই তোমার উপযুক্ত নয় ; ওর সঙ্গে বেশি মেলামেশা করবে না।

হ্যাঁ, পিওতর স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে ইলিয়ার বুদ্ধির তুলনায় ইয়াকভ ও এলেনা অনেক স্থূল। কিন্তু একটা জিনিস সে লক্ষ্য করেনি। ইলিয়ার প্রতি তার ভালোবাসা কখন বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়ে গেছে ওই রুগ্ন পাভলুসকার ওপর। তাকে দেখলেই পিওতরের মনে হয়, এই লক্ষ্মীছাড়াটাই সব নষ্টের মূল।

ছেলেটার চেহারা দেখলেই তার মন বিদ্বেষে ভরে ওঠে। ওর মেরুদণ্ড কেমন যেন বেঁকে গেছে। ক্ষীণ ঘাড়ের ওপর মাথাটা কেমন নড়বড়ে মনে হয়। যখন সে ছোটে তখন মনে হয় কোনো দুষ্কর্ম করে পালাচ্ছে। অথচ ছেলেটাকে খাটতে হয় প্রচুর। সৎবাবার জুতো জামা পরিষ্কার করা, কাঠ কেটে বাড়িতে বয়ে আনা, নদী থেকে জল বয়ে আনা, আরো অনেক কিছু কাজ তাকে করতে হয়। জামাকাপড় ছেঁড়া ও নোংরা। যাকে দেখে তাকেই সে অনুগত ভঙ্গিতে অভিবাদন জানায়। বিশেষ করে পিওতরকে দেখলেই, তা যতদূর থেকেই দেখুক না কেন, অভিবাদন করতে গিয়ে তার পাখির মতো গলার ওপর মাথাটা বুক পর্যন্ত নুইয়ে পড়ে। পিওতর খুব খুশি হয় যখন হেমন্তে বৃষ্টিতে ওকে ভিজতে দেখে কিংবা শীতে হি হি করে কাঁপতে থাকে ও মুখের ভাপে হাত গরম করতে চেষ্টা করে। কাশির চোটে একেক সময় ছেলেটার শরীর কেমন মুচড়ে ওঠে। দু হাত দিয়ে নিজের

বুক চেপে ধরে সে তখন। এই সব দৃশ্য দেখে পিওতর অদ্ভুত একটা আনন্দ পায়।

ছেলেটা স্নানবাড়ির লফ্‌টের ফোকরে দু'জোড়া পায়রা রেখেছে জানতে পেরে পিওতর টিখনকে আদেশ দিল পায়রাগুলোকে উড়িয়ে দিতে। আরো বলল, দেখো ছেলেটা যেন কোনোদিন লফ্‌টে না ওঠে। শেষে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবে।

একদিন সন্ধ্যায় অফিস ঘরে ঢুকে পিওতর দেখে ছেলেটা ছুরি দিয়ে মেঝের কালির দাগ চেঁচে তোলার চেষ্টা করছে আর ভিজে ন্যাতা দিয়ে মুছে ফেলছে।

কে ফেলল কালি?

বাবা।

ঠিক বলছিস?

হ্যাঁ, দিব্যি করে বলছি আমি ফেলিনি।

ছেলে ঘুষি খাবার আশঙ্কায় মাথা নিচু করে বসে ছিল।

হঠাৎ পিওতর যেন স্বচ্ছ আলোয় নিজের হাস্যকর আচরণ দেখতে পেল। তার হৃৎপিণ্ড পোল, তুচ্ছ এই জীবটার ওপর তার এত রাগ কেন? ছেলেটার ওপর তার করুণা জাগে। একটা তামার পাঁচ কোপেক ছেলেটার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, যা, বিস্কুট কিনে খাস।

রোগা রোগা নোংরা হাত বাড়িয়ে ছেলেটা সন্তর্পণে কোপেকটা তুলতে যায়। ওর ভয় দেখে মনে হয় কোপেকটা স্পর্শ করলে বোধহয় ছেঁকা লাগবে।

এই, তোর সৎবাবা তোকে মারে?

হ্যাঁ।

তা আর কি করা যাবে বল্। সবাইকেই কোনো না কোনো সময়ে মার খেতেই হয়। সান্ত্বনা দিতে চাইল পিওতর। কিন্তু কয়েকদিন পরেই ইয়াকভ পাভলুসকার নামে নালিশ করতে এল, সে নাকি তাকে মেরেছে। যদিও ছেলের কথা সে বিশ্বাস করেনি তবু নিকোনোভকে সে বলল, ছেলেটাকে কয়েক ঘা দিও।

নিকোনোভ বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, নিশ্চয় হুজুর, ভালো করেই দেব।

গরমের ছুটিতে ইলিয়া বাড়ি ফিরে এল। পরনে তার অপরিচিত পোশাক, চুল ছোট করে ছাঁটা ফলে কপালটা আরো বড় দেখাচ্ছে। ইলিয়া ফিরে আসায় ওই অপরিচ্ছন্ন, রুগ্ন পাভলুসকার ওপর পিওতরের রাগটা

যেন আরো বেড়ে যায়। কারণ অবাধ্য ইলিয়া ওই ছেলেটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েই চলে। সে নিজেও এমন ভদ্রতা শিখে এসেছে যা শুধু ব্যবধানই রচনা করে। মা বাবাকে সে এখন আর 'তুমি' বলে না। 'আপনি' বলে সম্বোধন করে। পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সে এমন ভাবে কথা বলে যেন সে এ বাড়ির অতিথি। ছোট ভাইয়ের ওপর অত্যাচার ও বোনকে বিরক্ত করা---এক কথায় তার ব্যবহার জঘন্য হয়ে উঠেছে।

নাতালিয়া বলল, আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম লেখাপড়া শিখলে ছেলেমেয়েরা উদ্ধত হয়ে ওঠে।

পিওতর কিছু বলে না। উদ্বেগের সঙ্গে ছেলের আচরণ লক্ষ্য করে তার ধারণা হয়েছে যে দুষ্ট হলেও যে অনাচারগুলো সে করে তা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।

স্নানবাড়িতে আবার পায়রাদের আস্তানা গড়ে উঠল। পাখি ওড়ানোর কাজ যখন থাকে না তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইলিয়া আর পাভলুসকা চিমনির কাছে বসে গল্প করে যায়।

একদিন ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, তোমার স্কুলের গল্প শোনাও। অনেক গল্প আমি শুনিয়েছি, এবার তোমার পালা।

ইলিয়া বাপকে অতি দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল কিভাবে ছাত্রেরা মাস্টারমশাইদের বিরক্ত করে।

মাস্টারমশাইদের বিরক্ত করে কেন?

মাস্টারমশাইরাও ওদের বিরক্ত ও ক্লান্ত করেন বলে।

না না, এ ঠিক কাজ নয়। লেখাপড়া শিখতে তোমার কি কষ্ট হয়?

না।

ঠিক বলছো?

আমার নম্বর দেখলেই বুঝতে পারবেন ঠিক বলছি কি না।

কি দেখছো তখন থেকে?

একটা বাজপাখি।

আচ্ছা যাও, খেলতে যাও।

শহরে ফিরে যাওয়ার আগে ইলিয়া বাবাকে একটা অনুরোধ জানাতে এল। বাবা স্নানবাড়ির লফ্‌টে পাভলুসকাকে পায়রা রাখতে দেবেন?

প্রতিশ্রুতি না দিয়ে পিওতর শুধু বলল, দেখ সবাইকে খুশি করা এক-জনের পক্ষে সম্ভব নয়, বিশেষ করে যে অসুখী।

তাহলে আপনি অনুমতি দিলেন? আমি ওকে বলে যাবো, ও খুব খুশি হবে।

পিওতর দুঃখ পায়। তারই ছেলে একটা নোংরা রুগ্ন বদস্বভাবের ছেলের সুখদুঃখের জন্যে কত ভাবে অথচ তার বাবার কথা সে একটুও ভাবে না। বাবাকে সুখী করার বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই তার। ছেলে চলে যাবার পর পিওতর অনুভব করে সে যেন ক্রমেই পাভলুসকার প্রতি ঘৃণার শিকার হয়ে উঠছে। বাড়িতেই হোক কিংবা কারখানাতেই হোক যখন কোনো ব্যাপারে সে তিতিবিরক্ত বোধ করে তখনই তার মনে হয় এ সবেরই মূলে রয়েছে ওই ছেলেটা। পিওতরের হৃদয়হীনতা ও বিদ্বেষপরায়ণতার যাবতীয় চিন্তাসমূহকে ওর ক্ষণভঙ্গুর পাঁজরায় ঝুলিয়ে রাখার জন্যে পাভলুসকা যেন প্রতিনিয়তই তাকে আহ্বান জানাচ্ছে। ছেলেটা যেন ক্রমশই সন্ধ্যার ছায়ার মতো সংখ্যায় বেড়ে চলেছে আর পিওতরের সঙ্গে সংঘর্ষও তত তীব্র হচ্ছে।

শেষ গ্রীষ্মের অনতিউষ্ণ এক দিনে শরীরে মনে বিধ্বস্ত পিওতর বাগান দেখতে এল। দিনের শেষে ক্লান্ত সূর্যের আলো তখন স্তিমিত হয়ে আসছে। বাগানে টিখন শুকনো পাতা এক জায়গায় জড়ো করছে। টিখনকে এড়াবার জন্যে পিওতর বাগানের বিপরীত কোণের বাড়িটায় ঢুকে গেল দরজা খোলা। পিওতর বুঝতে পারল ছেলেটা এখানেই আছে। সন্তর্পণে সে ভিতরের ঘরে উঁকি দিল। হ্যাঁ, শত্রুকে দেখতে পেল সে। অন্ধকার এক কোণে বেঞ্চির ওপর ও বিকৃত শরীরটা নিয়ে কুঁকড়ে শুয়ে আছে। ক্রুদ্ধ পিওতর তার দিকে এগিয়ে যেতেই পাভলুসকা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। পরমুহূর্তেই সে বলের মতো গড়াতে গড়াতে পিওতরের পায়ের কাছে এসে পড়ল। শরীরের সব শক্তি সঞ্চয় করে পিওতর ছেলেটার পাঁজরায় ডান পা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে লাথি মেরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পাঁজরার মুড়মুড় করে ভাঙার শব্দ, ক্ষীণ গোঙানি···তারপর ছেলেটার শরীর পিওতরের পায়ের ওপর নিথর হয়ে পড়ে রইল।

মুহূর্তের জন্যে পিওতরের মনে হলো সে যেন এক ঝটকায় তার মনের ওপর থেকে অনেকগুলো ময়লার বোঝা ঝেড়ে ফেললো। পরমুহূর্তে এক লহমায় বাগানের দিকটা দেখে নিয়ে সন্তর্পণে সে দরজা ভেজিয়ে দেয়। তারপর ছেলেটার দিকে ঝুঁকে পড়ে মৃদুস্বরে বলে, 'উঠে পড়, চল্ আমরা যাই।

পাভলুসকার নিস্পন্দ শরীরটা পড়ে আছে। একটা হাত সামনের দিকে ছড়ানো, অন্য হাতটা বেঁকে যাওয়া হাঁটুর নিচে ঢোকানো। ওর একটা পা

আরেকটি পায়ের চেয়ে ছোট। ছড়ানো হাতখানা অস্বাভাবিক, ভয়াবহ লম্বা। পিওতরের শরীর টলে উঠল। দরজার ফ্রেমের ওপর ভর দিয়ে সে অন্য হাত দিয়ে টুপিটা খুলে কপালের ঘাম মুছে নিল। কপালে অজস্র ঘাম জড়ো হয়েছে।

ফিসফিসিয়ে সে বলল, উঠে পড়, আমি কাউকে কিছু বলব না। কিন্তু অনেক আগেই সে বুঝে গিয়েছে, ছেলেটাকে সে খুন করেছে। একটা কালো রক্তের রেখা ছেলেটার ঠোঁট থেকে নেমে মেঝেতে গড়িয়ে যাচ্ছে তাও দেখতে পেল পিওতর।

'খুন'! অসাবধানতায় উচ্চারিত এই শব্দটা যতই সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র হোক ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে বাজতে থাকে। কানে তালা ধরিয়ে দেয়। পায়ের কাছে কুঁকড়ে পড়ে থাকা ছোট্ট শরীরটার দিকে তাকিয়ে সে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে নেয়, পরে কিছুক্ষণ বোকার মতো তাকিয়ে দেখে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে একটি সরল কৈফিয়ত তার মনে আসে। হ্যাঁ, আমি বলবো এটি নিছক দুর্ঘটনা। আমি দরজা ঠেলছিলুম দরজার আঘাতে ওর মৃত্যু ঘটেছে। দরজাটা ভারী কি না।

মুখ ফিরিয়ে এবার সে থপ করে বেঞ্চটার ওপর বসে পড়ে। তারপরেই টের পায় সে টিখন তার পিছনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। তার হাতে একটি ঝাঁটা, চোখ ভর্তি জল নিয়ে সে পাভলুসকার দিকে ... আঙুল দিয়ে পাথরের মতো ... গাল চুলকোচ্ছে। গভীর চিন্তায় ... দেখাচ্ছে তাকে। 'ওই দেখো' চিৎকার করে বলল পিওতর বলেই বেঞ্চির কোণটা দু হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরলো। টিখন শুধুই মাথাটা সামান্য নাড়ালো।

ক্ষীণজীবী ছোট্ট এতটুকু প্রাণী! কতদিন আমি বলেছি ছাদে উঠিস না।

আাঁ, কি বললে? আশা আতঙ্কের দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর পিওতরের।

ওকে কতদিন বলেছি একদিন ঘাড় ভেঙে পড়বি। আপনিও তো বলেছিলেন. মনে নেই আপনার? যে যে কাজ করবে সেই ব্যাপারে তার দক্ষতা তো চাই। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে বুঝি?

গোড়ালিতে ভর দিয়ে টিখন ছেলেটার কব্জি আর গলার কাছটায় হাত বুলিয়ে কিছু অনুভব করার চেষ্টা করে, তারপর দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালার মতো শব্দ করে আঙুলগুলো অ্যাপ্রনের ওপর ঘষে পরিষ্কার করে নেয়।

আমার তো মনে হচ্ছে শেষ হয়েই গিয়েছে। ক্ষীণজীবী এতটুকু প্রাণী! ওকে মেরে ফেলা এমন কি শক্ত! শক্ত কি বলুন?

টিখন যেভাবে কথা বলে, শান্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গি, অনুত্তেজিত কণ্ঠস্বর, আজও সে একই ভাবে কথা বলে যাচ্ছে, এতটুকু ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু তার মনিব বিশ্বাস করতে পারছে না। প্রতিমুহূর্তেই সে ভাবছে লোকটা হয় তাকে ভয় দেখাবে নয়তো অভিযুক্ত করবে। কিন্তু টিখন সেই একই সহজ শান্ত স্বরে বলতে থাকলো, হ্যাঁ, এই দরজা বেয়েই সে উঠতো : প্রথমে বেঞ্চির ওপর একটা পা রাখতো তারপর আর এক পা দরজার কড়ায় রেখে ওপরে উঠতো। সেখান থেকে ফোকরের কাছে পৌঁছে হাতে ভর দিয়ে উঠে পড়তো ছাদে। হাতে তো কোনো জোর নেই তাই পড়ে গিয়েছে। মনে হয় দরজার কোণাটা ওর হৃৎপিণ্ডে গিয়ে আঘাত করেছে।

আমি ওসব কিছুই দেখিনি : আত্মরক্ষার তাগিদে গাম্ভীর্য রক্ষা করে পিওতর বলে। মনে মনে সে ভাবতে থাকে, লোকটা মিথ্যে কথা বলছে না কি? ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে? অথবা নির্বোধটা আসল ব্যাপার কিছুই আন্দাজ করতে পারছে না? শেষের অনুমানটাই বোধ হয় ঠিক। বোকার মতোই তো সে আচরণ করছে। মাথাটা একবার সামনে একবার পিছনে দুলোচ্ছে যেন মাটিকে গুঁড়িয়ে দেবে। তারপর আবার বিড়বিড় করে বলতে, 'ইস্, একরত্তি খুদে! কেন যে এগুলো জন্মায়।' তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, যাই, ওর মাকে খবরটা দিয়ে আসি। ওর সৎবাবা অবশ্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে।

শ্রমিকটার কথার মধ্যে ভণ্ডামি আছে কি না লক্ষ্য করার জন্যে পিওতর সতর্কতার সঙ্গে ওর কথাগুলো শুনছিল। কিন্তু না, ও তো ওর চিরাচরিত ভঙ্গিতেই কথা বলছে অদ্ভুত একটা মানুষ যার মধ্যে কোনো কৌতূহল নেই।

কোনো মহিলার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর, 'পাশ্‌কা... পাশ...কা' শুনে সে উদ্বিগ্ন হয়ে চুপ করে রইল।

গালের ওপর টোকা দিতে দিতে টিখন বলতে থাকে, এই যে এখানে তোমার পাশ্‌কা। চোখের জল তৈরি রাখো।

না, লোকটা যে সত্যিই বোকা তাতে আর সন্দেহ নেই। পিওতর যেন নিশ্চিন্ত হয়ে পকেট থেকে টুপিটা বের করে বাগানে চলে আসে।

পরবর্তী দু-তিন সপ্তাহ পিওতরের মনের মধ্যে ভয়ের একটা স্রোত বয়ে চলল। কখনো জোয়ার কখনো ভাঁটা, প্রতিমুহূর্তেই অচেনা অজানা বিপদের আশঙ্কা। যে কোনো মুহূর্তে দরজা খুলে যেতে পারে আর সেখানে আবির্ভাব ঘটবে টিখনের। ঢুকেই টিখন যেন বলবে, অবশ্যই, আমি সবই জানি...।

বাইরে থেকে সবই ঠিকঠাক চলছে। জন্মমৃত্যুর অমোঘ সূত্র মেনে নেওয়ার মতো পাভলুসকার মৃত্যুকেও সবাই স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিল। ছেলেটার সৎবাবা নিকোনোভ একটা কালো টাই পরেছে বটে কিন্তু তার চকচকে মুখখানা দেখলে মনে হয় যেন হঠাৎই অপ্রত্যাশিত ভাবে সে একটা পুরস্কার পেয়েছে। মৃত ছেলেটির মাকে দেখতে লম্বাটে, রোগা আর মুখখানা ঘোড়ার মতো। তার আচরণ দেখে মনে হয় যেন তাড়াতাড়ি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার কাজ সেরে ফেলতে চায়। অন্তত পিওতরের ধারণা তাই। কিন্তু প্রার্থনার সময় দেখা গেল তার হাত দুটি যেন কিভাবে আটকে গেছে, তুলতেই পারছে না। যদিও তোলে তা হঠাৎই এমনভাবে পড়ে যায় যে মনে হয় বুঝি ভেঙে গিয়েছে

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজ নির্বিঘ্নে চুকে গেলে নিকোনোভ পারবার এই বাবদে সাহায্য করার জন্যে পিওতরকে ধন্যবাদ জানিয়ে গেল। যদিও ইচ্ছে থাকলেও পিওতর তেমন কিছু সাহায্য করেনি। পাছে বেশি সাহায্য করলে টিখনের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় তাই বাড়াবাড়ি সে করেনি। মাঝে মাঝেই তার সন্দেহ জাগে ঘটনাস্থলে টিখন যেরকম বোকামি করল বা তাকে যেমন নির্বোধ মনে হয়েছিল আসলে তা নয়। আশ্চর্য হয়ে ভাবে সে ঘটনাচক্রে দ্বিতীয়বার টিখন তার ভাগ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেল। একেক সময় তার ইচ্ছে হয় ওই স্নানবাড়িটা হয় পুড়িয়ে দেয় নয়তো ভেঙে ফেলে। বাড়িটা যথেষ্ট পুরনো হয়েছে, একটা নতুন স্নানবাড়ি তৈরি করলে ক্ষতি কি?

টিখনের প্রতি সজাগ অনুসন্ধানী দৃষ্টি রেখেও পিওতর তার কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করে না। আগের মতোই সে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করছে সেই ভাবেই কাজ করে চলেছে। শ্রমিকদের সঙ্গে সে রুক্ষ ব্যবহার করে, তারাও ওকে পছন্দ করে না। মেয়েদের সম্পর্কে ওর প্রবল ঘৃণা, তাদের সঙ্গে ব্যবহারেও তা প্রকাশ হয়ে পড়ে একমাত্র ব্যতিক্রম নাতালিয়া। এমন সশ্রদ্ধ অথচ আন্তরিকভাবে তার সঙ্গে ব্যবহার করে যেন নাতালিয়া ওর পিসি কিংবা বড় বোন। আর যাই হোক মনিবগিন্নী নয়।

পিওতর একদিন প্রশ্ন করেছিল, আচ্ছা টিখনের ওপর তুমি এত সদয় কেন? উত্তরে নাতালিয়া বলেছিল, ও তো আমাদের পরিবারেরই একজন।

টিখনের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব বলতে কেউ নেই। একমাত্র ছুতোর মিস্ত্রি সেরাফিমকেই সে পছন্দ করে আর খুব নিষ্ঠাভাবে গির্জায় প্রার্থনা করতে যায়। কোনো অজ্ঞাত কারণে প্রার্থনার সময়ে তার দুই ঠোঁটের

মাঝখানে কিছুটা ফাঁক লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় এবার সে কিছু বলবে। পিওতর মাঝে মাঝে ওর পিটপিট করে তাকানো চোখের দিকে দৃষ্টিপাত করে। চোখাচোখি হতেই টিখনের ভুরু কুঁচকে যায়, মনে হয় তখন বুঝি সে ভয় দেখাতে চায়। পিওতরের মাথায় রক্ত উঠে যায়। ইচ্ছে হয় লোকটার কলার চেপে ধরে বলে, এখন তুমি কথা বলবে কি?

টিখনের চোখের পিটপিটানি থেমে যায়, মুখখানা পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে। একদিনের ঘটনা মনে পড়ে যায় পিওতরের। তখনো আর এক নির্বোধ আস্তনুস্কা বেঁচে। প্রায়ই দেখা যেত টিখনকে তার সঙ্গে বকবক করতে। টিখন তাকে প্রশ্ন করছিল, এই পাগলা, তুই দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব বলিস? কী মানে তোর ওই ছড়ার? 'রথ খুইয়েছে চাকা একটি' এর মানে কি?

পিওতর ডেকে পাঠিয়েছিল টিখনকে। ওর কাছ থেকে কি জানতে চাও তুমি? টিখন বলেছিল, ও যে অতিমানবিক ভাষা ব্যবহার করে তার মানে বোঝবার চেষ্টা করি।

নির্বোধের কথার আবার মানে থাকে নাকি?

থাকে। নির্বোধের কথার মধ্যেও কখনো কখনো প্রবল যুক্তি থাকে।

এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতে পিওতরের চোখে ঘুম নেই, বুকের মধ্যে অসম্ভব কষ্ট, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। পিওতর অনুভব করে কিছুদিন ধরে তার বুকের ওপর যে পাথরটি চেপে বসেছে তার ভার যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই চাপ সহ্য করা তার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। স্ত্রীকে জাগিয়ে সে নিকোনোভের ছেলেকে হত্যার ঘটনা বলে ফেলল।

নাতালিয়া ঘুম-ঘুম চোখে বলল, কী একটা স্বপ্ন দেখছিলাম ভুলে গেলাম। তারপর জেগে উঠে ছোট ছেলে সম্পর্কে অবাস্তর একটা মন্তব্য করল।

স্ত্রীর এই আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা দেখে পিওতর বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলল, কেন বলতে গেলাম?

সেই রাতে প্রচণ্ড তুষারপাত ও ঝড়ের গর্জনের মধ্যে গভীর আত্মসমীক্ষায় পিওতর অনুভব করল সংসারে সে বড়ই একা। মানসিক এই প্রতিফলনে ওই হত্যাকাণ্ডের রহস্যও তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। একটা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সে খুঁজে পায়। একটি ছেলে তার বড় ছেলের বন্ধু সেজে তার স্বভাবচরিত্র খারাপ করে দিচ্ছিল। ওই ভয়ঙ্কর ছেলেটিকে হত্যা করে নিজের ছেলের প্রতি সুগভীর ভালবাসাই প্রকাশ করেছে সে।

নিকোনোভের ছেলের প্রতি তার ঘৃণার মনোভাবের যুক্তিসঙ্গত একটি ব্যাখ্যাও এতে পাওয়া যাচ্ছে। পিওতরের মনের ভার অনেক হাল্কা হয়ে যায়। কিন্তু আংশিক ভারমুক্তিতে পিওতর খুশি হতে পারছে না। হত্যার সম্পূর্ণ অপরাধ যতক্ষণ সে অন্যের কাঁধে স্থানান্তরিত করতে পারছে ততক্ষণ যেন তার শান্তি নেই। এই কারণেই সে একদিন ফাদার গ্লায়েবকে ডেকে পাঠালো। যদিও সরাসরি স্বীকারোক্তি করার বাসনা তার নেই।

সেই রোগা, কুঁজো পুরোহিত সন্ধ্যেবেলায় এসে হাজির হলেন। ঘরের এক কোণে এসে বসলেন। তাঁর বসার ধরনটাই এই। সব সময়েই ঘরের অন্ধকার কোণে এসে বসবেন। মনে হয় এইভাবে উনি নিজের লজ্জা ঢাকতে চান। চেয়ারের কালো চামড়ার সঙ্গে ওঁর মলিন পোশাকের রঙ কেমন একাকার হয়ে গেছে। মুখের অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যই শুধু এই বিষণ্ণ পরিবেশের মাঝে ওঁকে একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তিনি রোগা হাতখানি দিয়ে লম্বা দাড়িতে মাঝে মাঝে মোচড় দিচ্ছেন।

আলোচনার সূত্রপাত কি ভাবে করা যায় বুঝতে না পেরে পিওতর দ্বিধান্বিত ভাবে বলল, কি ভাবে দিনে দিনে মানুষের অধঃপতন হচ্ছে, মদ্যপান, জোচ্চোরি, অসমতা দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। কিন্তু বিষয়টা এতই নীরস যে পিওতর নীরব থাকাকেই শ্রেয় বলে মেনে নিল। ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে সে পায়চারি শুরু করে দিল। ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে তখন পুরোহিতের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। তাঁর বক্তব্য অনেকটা অনুযোগের কাহিনির মতো।

জনগণের আত্মিক উন্নতির জন্যে কারোরই আজকাল মাথাব্যথা নেই, জনগণের নিজেদের তো নয়ই। এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণই অজ্ঞ। আমাদের মধ্যে সামান্য যে কজন শিক্ষিত মানুষ আছে, তাদের সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয় তবু বলতেই হচ্ছে সাধারণ মানুষের কল্যাণের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহই নেই। ওঁরা অনেক কিছুই করতে চান কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করেন না। লোককে তাঁরা ক্ষেপিয়ে বেড়ায় আর সরকারী শাসনের কোপ নেমে আসে তাদের ওপরে। এক কথায়, আমাদের সমাজের চাকাটা ঠিকমতো ঘুরছে না। এত হৈচৈয়ের মাঝখানে একক একটি কণ্ঠস্বরই বিশ্বমানবের বিবেকের মতো ধ্বনিত হচ্ছে। সাহিত্যিক ও দার্শনিক কাউন্ট টলস্টয়ের কথাই আমি বলছি। আশ্চর্য মানুষ এই কাউন্ট টলস্টয়। অসাধারণ সাহস ও তেজের সমন্বয় উনি। কিন্তু সেখানেও বাধা। সনাতন ধর্মের ধ্বজাবাহকেরা…।

দীর্ঘ সময় ধরে পুরোহিত লিও টলস্টয় সম্পর্কে বলে গেল। পিওতর অবশ্য অনেক কথাই বুঝতে পারে না তবু পুরোহিতের চাপা কণ্ঠস্বর অন্ধকারের মধ্য থেকে শান্ত স্রোতস্বিনীর মতো প্রবাহিত হয়ে সেই লোকটিকে এমন অসাধারণ করে তোলে যে পিওতরের মন অহংসর্বস্বতা থেকে মুক্তি পায়; যদিও কি কারণে পুরোহিতকে সে ডেকে পাঠিয়েছে তা কিন্তু সে ভুলে যায়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরোহিতের প্রতি তার করুণাই জাগ্রত হয়ে ওঠে। পিওতর জানে গরীবদের মধ্যে এই পুরোহিত অত্যন্ত জনপ্রিয় কারণ, প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি সহৃদয় ব্যবহার করেন। গির্জায় প্রার্থনার অনুষ্ঠান তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করেন বিশেষ করে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে তাঁর ভঙ্গি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। কিন্তু পিওতরের মতে এগুলো ফাদার গ্লায়েবের কোনো বিশেষ গুণ নয়। যে কোনো পুরোহিতেরই এই আবশ্যিক গুণগুলো থাকা প্রয়োজন। তার করুণার কারণ গির্জার উচ্চ-পদাধিকারী পুরোহিত ও সমাজের ওপর তলার মানুষেরা ওঁকে পছন্দ করেন না। পুরোহিতের মধ্যে কিছুটা কাঠিন্য থাকা দরকার সুতীক্ষ্ণ ধিক্কার ও তিরস্কার না করলে লোকের মন থেকে পাপের চেতনা দূর হবে কি করে? ফাদার গ্লায়েবের মনে দাগ-না-কাটা কথা শুনতে শুনতে তার মনে হল আধ্যাত্মিক গুরু হবার মতো যোগ্যতা এই পুরোহিতের নেই। তাই পুরোহিতের কথার মাঝখানেই সে বলে ওঠে, আপনাকে আজ ডেকে এনেছি কেন জানেন? এ বছরের পুণ্য উৎসবে আমার পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব হবে না।

কেন? তা কি করে সম্ভব? আপনাকে তাহলে নিজের বিবেকের কাছেই জবাবদিহি করতে হবে।

পুরোহিতের এই নিরুত্তাপ কথাগুলো টিখনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। উত্তর না পেয়ে পুরোহিত আবার বলতে শুরু করেছেন: চারদিকে যা ঘটছে তা দেখে একটা সান্ত্বনাই খুঁজে পাই। লক্ষ্য করে দেখেছি পাপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে তাকে কাটিয়ে ওঠা শক্ত হয়। পাপ প্রথমে একটা আশ্রয় অবলম্বন করে দেখা দেয়, পরে জমা হতে হতে তাল পাকিয়ে ওঠে। ছড়িয়ে থাকলে কাটিয়ে ওঠা শক্ত কিন্তু একীভূত হয়ে থাকলে তাকে নিঃশেষ করা যায় ন্যায়ের এক খড়্গাঘাতে।

এবারের কথাগুলো পিওতরের মনে ধরে গেল। এতক্ষণে পিওতর যেন সান্ত্বনা খুঁজে পেল। পাভলুসকা তাহলে সেই খুঁটি যাকে ঘিরে তার মনের কালো চিন্তাগুলো দলা বেঁধেছিল! পাভলুসকাই সেই কু-চিন্তাগুলোকে

আকর্ষণ করেছিল। পিওতর ভেবে দেখল এই পাপের অর্ধেক দায়িত্ব অন্তত সে তার ছেলের ওপর স্থানান্তরিত করতে পারে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে ফাদার গ্লায়েবকে চা খেয়ে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানায়।

সেই গ্রীষ্মে নাতালিয়ার গলায় কিছু লাল ফুটকি দেখা দিল। খুব ছোট হলেও নাতালিয়া বেশ ভয় পেয়ে গেল। রাতে শুতে যাবার আগে মধু বড়া এবং [illegible] মলম সে লাগায় ঘামাচির মতো ওই ফুসকিগুলোর ওপর [illegible] বসে [illegible] ব্যস্ত থাকে [illegible] নিয়ে [illegible] সঙ্গে [illegible] গলায় গ্রীবের মতো তার স্তন দুটি [illegible]। পিওতর [illegible] অবস্থায় আড়চোখে স্ত্রীকে একবার দেখে নেয়। [illegible] প্রার্থনা জানায় [illegible] লম্বা হয়ে [illegible] শুয়ে থাকে।

[illegible] ঘুরপাক খাচ্ছে। [illegible] আশ্রয় করে জমা হয় [illegible]। ঘুরে ঘুরে পাপ জমা [illegible] বলে [illegible] কারখানা [illegible] বার্তা।

আলোকোজ্জ্বল সহযোগ[illegible] বালুময় পাহাড়ী [illegible] ব্যবসা বস্তুত হয়েছে। [illegible] সোনালী আভা আর নেই, অভ্রের রূপোলী ছটাও আর নেই, নেই স্ফটিকের ঝিকিমিকি। কারখানার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। হাজার হাজার টাকুর গুঞ্জন, তাঁতের ফিসফিসানি, যন্ত্রের ঘরঘরানি সর্বোপরি শিল্প ও শ্রমের বিরামবিহীন ধ্বনি একজনের মনে বিশেষ একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। জেনে রাখা ভালো যে এই সবকিছুর প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে একজনই। হ্যাঁ, শুধু একজনই। সেই একজনের মনে বিস্ময় আর গর্বের অন্ত নেই।

কিন্তু তবু ফাঁক থেকেই যায়। বিস্ময় আর গর্বের মাঝে কিছু বিরতি এইসব মুহূর্তে (বড্ড ঘন ঘন দেখা দেয়) বিষাদ ও ক্লান্তি তাকে অবসন্ন করে দেয়। মন তখন পাড়ি দেয় বালক বয়সের সেই দেশে। শান্ত নদী রাটের তীরে সীমাহীন প্রান্তর আর কৃষকদের সহজ অনাবিল জীবনের মাঝে। এইসব মুহূর্তেই তার মনে হয় এক অদৃশ্য হস্তের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছে সে। সারাটা দিন শুধু শব্দ আর শব্দ। ব্যবসা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা মস্তিষ্কে প্রবেশপথ পায় না। কালো চিমনিগুলোর কাঁপা কাঁপা ধোঁয়া

তাকে। ঘিরে রয়েছে যে পরিবেশ তার ওপর যেন নৈরাশ্যের এক ঘন আবরণ ছড়িয়ে দেয়।

মনের এই অবস্থায় শ্রমিকদের সম্পর্কে পিওতর হতাশ হয়ে পড়ে। এক সময় এদের মধ্যে অনেকেই ছিল কৃষক। কৃষকসুলভ ধৈর্য আর এখন কারো মধ্যে নেই। এরা প্রত্যেকেই যেন 'উত্তেজনা' নামক এক ধরনের অসুখে আক্রান্ত হয়েছে। ফলে এরা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, বেপরোয়া, কলহপ্রিয়। এরা বেঁচে [illegible] এরা পরস্পরের সহযোগে [illegible] সুস্থ সামাজিক [illegible] মতো বাস [illegible] এখন এমন মাত্রা-ছাড়ানো মেজাজ [illegible] ছিল না। একটি [illegible] সঙ্গে [illegible] পরিবেশে [illegible] বসবাস [illegible]। [illegible] এখন অনেক [illegible] কিন্তু অন্যদিকে [illegible] কারখানার [illegible] শোধনে [illegible] সম্প্রদায়ের মধ্যে [illegible] উচ্ছৃঙ্খলতা [illegible] আশঙ্কার [illegible] শ্রমিকদের সম্পর্কে পরিবেশের একটা চিত্র [illegible] সহজে [illegible]।

চুল্লীতে [illegible] কাজে [illegible] ভলকোভকে সম্প্রতি পাগলা-গারদে পাঠানো হয়েছে। মাত্র পাঁচ বছর আগে সে আর তার স্ত্রী এক উজ্জ্বল [illegible] কাজে যোগ দিয়েছিল। স্বাস্থ্য ও [illegible] দীপ্তিতে ভলকোভ [illegible] যথার্থই সুপাত্র। কিন্তু ক্রমাগত আগুনের আঁচ লেগে লেগে তার রূপ গেল জ্বলে, কুদর্শন হয়ে পড়ল সে। বছরখানেকের মধ্যেই ওর স্ত্রী হয়ে পড়ল বিশ্বাসঘাতিনী আর ভলকোভও স্ত্রীকে ঈর্ষান্ধ হয়ে পেটাতো। দুজনের কেউই আর নেই। বিগত পাঁচ বছরে চারটি খুন হয়েছে, এছাড়া [illegible] রক্তপাতের ঘটনা তো গুনে শেষ করা যাবে না।

আলেক্সি কিন্তু নির্বিকার। এসব ঘটনার কোনো প্রতিক্রিয়া তার হয়নি। আগের মতোই সে হাল্কা স্বভাবের মানুষ রয়ে গেছে। অনেক দিক দিয়ে সদা হাস্যময় সেরাফিমের সঙ্গে তার মিল রয়েছে। সেরাফিম একদিকে যেমন শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্যে নিপুণভাবে ধনুক আর বাঁশি তৈরি করে দিচ্ছে আবার তাদেরই জন্যে কফিনও তৈরি করছে সে। আলেক্সির বাজপাখির মতো চোখে স্থির বিশ্বাসের আলো—কারখানা চলছে, চলবে। ইতিমধ্যে ওর তিনটি সন্তান কবরে আশ্রয় নিয়েছে। শুধু একটি পুত্রসন্তান মীরনই জীবনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে। তার লম্বা লম্বা হাড় আর পেশীতন্তুগুলো যেন খুব তাড়াতাড়ি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মনে হয় ওর শরীর থেকে যেন একটা ক্যাঁচড় ক্যাচড় শব্দ সব সময় উঠে আসছে। তার

একটা মুদ্রাদোষ আঙুল মটকে শব্দ তোলা। তেরো বছর বয়সেই চোখে চশমা উঠেছে ফলে তার পাখির মতো লম্বা নাকটা কিছু ছোট দেখায়। হাতে তার সব সময় একখানা বই থাকে। যে জায়গাটা পড়ছিল সেখানটা যাতে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় তাই সে পাতার মাঝখানে আঙুল দিয়ে এমন ভাবে চলে যেন বই আর হাত একই সঙ্গে গজিয়েছে। মা বাবার সঙ্গে সে সমপর্যায়ের মানুষের মতন তর্ক করে, আলোচনা করে। তার মা বাবা যদিও একে খুশি হয় কিন্তু পিওতরের মোটেই পছন্দ নয়। জ্যাঠা ভাইপো দুজনেই একে অপরকে পছন্দ করে না।

আলেক্সির বাড়ির পরিবেশ কেমন যেন শ্রী-শৃঙ্খলাহীন। পিওতরের মনে হয় একটা মঠ আর মেলার মধ্যে যে তফাৎ তার আর ভাইয়ের জীবনধারার মধ্যে ঠিক তেমনই তফাত। আলেক্সির তার বাঁধা কোনো বন্ধু নেই শহরে তবু ছুটির দিনে দেখা যায় তার বাড়ি ভরে উঠেছে কিছু সন্দেহজনক চরিত্রের ব্যক্তিসমাবেশে যেমন কারখানার ডাক্তার ইয়াকভলিয়েভ লোকটির সোনা-বাঁধানো দাঁত এবং ব্যাঙ্গাত্মক কথাবার্তায় বেশ পারদর্শী অন্যদিকে মাতাল এবং জুয়াড়ী মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কপতিয়েভ। সবদাই হৈহুল্লোড়ে মেতে থাকে সে। এছাড়া এই সমাবেশে মীরনের মাস্টার মশাইকেও দেখা যায়। পুলিসের নির্দেশে এঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে। সঙ্গে তার চেপটা-নাক গীটার বাজিয়ে স্ত্রীও থাকে। সমাজ-পরিত্যক্ত কিছু উটকো মানুষও এসে জোটে। পিওতর বুঝতে পারে না মস্ত ব্যবসায়ের অর্ধেক অংশীদার তার ভাই কোন্ আকর্ষণে এদের সঙ্গে মেলামেশা করে।

পিওতরের মনে হয় এই কপতিয়েভটার মধ্যে একটা উচ্ছৃঙ্খল অন্তর্ঘাতী সত্তা আছে। ভাইয়ের কাছে সে কথা বলতেই সে হেসে উড়িয়ে দেয়। আলেক্সির মতে ও একটি আশ্চর্য মানুষ। পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, তাছাড়া নিজের কাজ খুব ভালো বোঝে। আলেক্সি এতেই ক্ষান্ত হয় না। মৃদু হেসে বলে, আমার মেয়ে থাকলে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওকে আমি একেবারে বেঁধে ফেলতাম।

পিওতর ক্ষুব্ধ হয়ে বাড়ি ফিরে বউকে বলে, এলেনার দিকে নজর রাখতে। কপতিয়েভটা সব সময় ওর চারদিকে ঘুরঘুর করে। আলেক্সি তো কপতিয়েভ বলতে অজ্ঞান একটা ভালো পাত্রের সন্ধান করতে থাকো।

নাতালিয়া বলে, এখানে আর ভালো পাত্র কোথায় পাবো? শহরে খোঁজ

করতে হবে, তা এত তাড়া কিসের ?

ঝঞ্ঝাটের আশঙ্কা রয়েছে বলেই তাড়াতাড়ি করা। পিওতর উত্তরে বলে।

ব্যবসার দায়দায়িত্ব ও চিন্তাভাবনার সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে পিওতর যখনই মুক্তি পায় তখনই অন্যের প্রতি ঘৃণা ও নিজের প্রতি অসন্তোষের ঘন কুয়াশার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। তার জীবনের একটিই মাত্র উজ্জ্বল বিন্দু ছিল, তা হচ্ছে ছেলের প্রতি ভালোবাসা। কিন্তু পাভলুসকার হত্যার ঘটনার কালো মেঘে তাও ঢাকা পড়ে গেছে। ইলিয়াকে দেখলেই তার বলতে ইচ্ছে করে, দেখো তোমারই ভালো করার জন্যে আমাকে এ কাজটা করতে হয়েছে।

পাভলুসকাকে হত্যা করার মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগে ছেলের জন্যেই তার শঙ্কার অনুভূতি জেগেছিল—এই সত্যটি নিজের কাছে গোপন করার মতো বুদ্ধি তার ছিল না কারণ এরই মধ্যে সে একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পায়। ইলিয়ার সঙ্গে যখন সে কথা বলে তখন ঘুণাক্ষরেও সে তার বন্ধুর নাম উল্লেখ করে না কারণ তার ভয় পাছে বীরত্বের এই ছলটুকু কোনোভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

পিওতর লক্ষ্য করে ইলিয়া যতই বড় হচ্ছে ততই কেমন যেন গুটিয়ে যাচ্ছে নিজের জগতের মধ্যে। স্বভাবটা আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেছে। মায়ের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলে, ছোট ভাইকে আর পীড়ন করে না, ছোট বোন তাতানিয়ার সঙ্গে কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করে আর বড় বোন এলেনার সঙ্গে কিছুটা মজা করে মাত্র। পাভলুসকার শূন্যস্থান পূরণ করেছে এখন মীরন। দু'জনকে বড একটা আলাদা দেখা যায় না। ঘন্টার পর ঘন্টা তারা কী যে গল্প করে তা ওরাই জানে। বাড়িতে প্রায় থাকেই না ইলিয়া। কোনোদিন সকালে প্রাতরাশ সেরেই হয় কাকার বাড়ি চলে যায় নয়তো মীরন আর গোরিংসভিয়েতভের সঙ্গে বনের মধ্যে চলে যায়। ছেলেটাকে বেশ ধূর্ত মনে হয়।

একদিন নাতালিয়া ছেলেকে বলে, ওই খুদে ইহুদিটার সঙ্গে তোমার এত ভাব কেন ? পিওতর লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে ছেলের ভুরু দুটি ধনুকের মতো বেঁকে গেল। খুব সংযত গম্ভীর হয়ে ইলিয়া বলে, অমন অসম্মানজনক ভাবে কথা বলো না মা। ও আমাদের ফাদার গ্লায়েবের ভাইপো। তার মানে আমাদের মতোই ও রাশিয়ান। স্কুলে ও সবচেয়ে ভালো ছাত্র।

হ্যাঁ, ইহুদিগুলো সব সময়েই ঠেলে এগিয়ে যায়। নাতালিয়া আগের মতোই ঘৃণাসূচক মন্তব্য করে।

তুমি কি করে জানলে? শহরে তো মাত্র চারজন ইহুদি আছে, একজন ছাড়া সবাই গরীব।

আর আছে ওদের চল্লিশটা বাচ্চা! যেখানেই যাও সর্বত্রই ওদের ভিড়।

মা, তুমি বারবার অপমানকর শব্দ ব্যবহার করছো।

পিওতর বিরক্ত হয়ে বলে, অনেক হয়েছে, এবার চুপ করো। নাতালিয়া অভিমানে কেঁদে ফেলে। বলতে থাকে সে, কেন আমার কি কিছু বলার অধিকার নেই? আমার কপালের নিচে চোখ নেই নাকি দুটো? এইসব ভালোমানুষদের আমি খুব চিনি। একবার ঐরকম এক ভালোমানুষ ...

ভুরু কুঁচকে বসে আছে ইলিয়া। নাতালিয়া তার দিকে আঙুল নেড়ে বলে, মনে রাখিস আমি তোর মা।

'ধন্যবাদ' বলে ইলিয়া শূন্য কাপটা ঠেলে দেয় সামনে।

ছেলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে পিওতর মুখ টিপে হাসে। কারণ নাতালিয়ার কথা বলার ভঙ্গি দেখে সে বুঝতে পারে মা ছেলেকে ভয় পায়। অবশ্য সেদিক দিয়ে সেও কিছু ব্যতিক্রম নয়। ঠিক ভয় না পেলেও ওই তিনটি ছেলেই যে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। সত্যিই ওদের হাবভাব কিছুই বোঝা যায় না। নইলে টিখনের সঙ্গে ওদের এত ভাব কেন? কি মজা পায় ওরা টিখনের মধ্যে?

কোনো-কোনোদিন সন্ধ্যেবেলা টিখন ওদের নিয়ে আসর জমায়। পিওতর কান পেতে টিখনের কথা শোনে। দুর্বোধ্য সব কথাবার্তা।

ঠিক কথা। ভার যত কম হবে ততই স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারবে। আর ওই কোণটোনে বিশ্বাস করো না। আকাশের কোনো কোণটোন নেই। আকাশ কি দেওয়াল দিয়ে ভাগ করা?

ছেলেরা হেসে ওঠে। এক-একজনের এক-একরকম হাসি। ইলিয়ার মসৃণ, মীরনের শুকনো আর গোরিৎসভিয়েতভের চাপা হাসি।

আবার টিখনের রহস্যময় উক্তি শোনা যায়।

বুঝলে ছেলেরা, মানুষকে মানুষ হিসেবে আরো বেশি করে জানার চেষ্টা করো। কোন্ মানুষ কোন্ কাজের জন্যে নির্দিষ্ট, আর ভাগ্যটাই বা কি এসব বোঝবার চেষ্টা করবে। আর শব্দের গভীরতর অর্থ বুঝতে হবে, তার মর্মে পৌঁছতে হবে। এই ধর না 'আবর্তন' কথাটা। যদি একবার ভাবতে বসো

দেখবে চিন্তার আর শেষ নেই।

পিওতরের অতি পরিচিত সেই প্রবাদটি টিখন আবার আওড়ায়। 'মানুষ কাটে সুতো আর শয়তান বোনে কাপড়। এই চলছে, চলবেও'। ছেলেরা হাসিতে ফেটে পড়ে, টিখনও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। হাসতে হাসতেই সে বলে, হেই ছেলেরা, তোমরা কী সবুজ।

দিনের বেলার চেয়ে সন্ধ্যার ছায়ায় ছেলেদের আরো ছোট দেখায় আর টিখনকে দেখায় আরো বড়। আর কথাও বলে দিনের বেলার চাইতে আরো বেশি বোকার মতো।

টিখনের সঙ্গে এমার ঘনিষ্ঠতা দেখে পিওতরের রাগ আরো বেড়ে যায় এই শ্রমিকটার ওপর। ছেলেকে ডেকে সে প্রশ্ন করে, টিখনের মধ্যে কী পাও তুমি?

খুব মজার মানুষ।

কিসের মজা? ওর বোকামি?

বোকামির মধ্যেও বোঝবার আছে।

ঠিক বলেছ। পিওতর খুশি হয় ছেলের উত্তর শুনে। সে তাই তো তোমরা সবাই বোকা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়, কথাটা টিখনেরই।

ইলিয়া বাপের মনে আজকাল অনেক আশা জাগায়। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সে যখন শিস দিয়ে সুর ভাঁজে কিংবা পকেটে হাত ঢুকিয়ে শ্রমিকদের কাজ দেখে তারপর তাঁতঘরে পায়চারি করে, বাপ খুশি হয়। লঘু পায়ে ঘুরতে ঘুরতে সে শ্রমিক বস্তিতেও চলে যায়। পিওতর খুশি হয়ে ভাবে, হ্যাঁ, এই ছেলে একদিন সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন মনিব হবে। আমাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, আর স্ব-ইচ্ছায় ও একে টেনে চালাবে। কিন্তু ছেলেটা কথা বড় কম বলে, বললেও অনেক ভেবেচিন্তে এমন সংক্ষেপে বলে যে তার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে আর কারো থাকে না। তবু পিওতর খুশি হয় এই ভেবে যে ইলিয়া অন্ততঃ মীরনের মতো কেতাবী ঢঙে কথা বলে না, গোরিৎসভিয়েতভের মতো বাক্যবাগীশ নয় আর ইয়াকভের মতো অলসও নয়।

ছেলেদের ছুটির দিনগুলো দেখতে দেখতে শেষ হয়ে আসে। বিদায় নেবার ও জানাবার বেদনাদায়ক মুহূর্ত এসে যায়। নাতালিয়া ইয়াকভকে ও পিওতর ইলিয়াকে যাবার সময় উপদেশ দেয়। ব্যবস্থাটা কেমন আপনাআপনি হয়ে যায়। পিওতর অনেক কথাই বলল কিন্তু যে কথাটা বলতে চেয়েছিল সেটাই বলা হলো না। কেমন করে ছেলেকে বলবে

যে তার জীবন নিরানন্দময় শুধুই ব্যবসার জটিল চিন্তায় ভরা। ছেলেকে কি আর এ কথা বলা যায়?

অনেকদিন ধরেই পিওতর তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করছিল যে এমন একটা কিছু ঘটুক যেমন প্রবল তুষারপাত, ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যার ফলে তার জীবনে নতুন কিছু আসার একটা সুযোগ ঘটবে। মনে বাসনা অনুযায়ী সুযোগ একটা এসে গেল। সে যাচ্ছিল মফস্বলের একটি শহরে। তার গাড়ি যখন ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে তখন জুন মাসের প্রবল ঝঞ্ঝা বিদ্যুৎ-বৃষ্টির প্রকোপে পড়ল সে। জলে ভিজে তার অবস্থা তখন সঙ্গীন। ঘোড়া দুটিকে সামলাতে পারছে না কোচম্যান। কোচোয়ান তখন বলল, কোনোমতে যদি পোপোভাদের বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারি তাহলে এ যাত্রা বেঁচে যাবে।

যেন স্বপ্নেই সব কিছু ঘটে গেল। পিওতর দেখল ধার করা পোশাক পরে সে উষ্ণ মনোরম একটি ঘরে টেবিলের সামনে বসে আছে। টেবিলের পাশে নিকেলের পাত্রে মোড়া কেটলি থেকে আওয়াজ উঠছে আর দীর্ঘাঙ্গী এক নারী চা ঢালছে। ঢোলা-ঢালা কালো পোশাকের অন্তরালে মহিলা তার সুশ্রী দেহখানি ঢেকে রেখেছে। মাথায় তার লাল চুল চূড়া করে বাঁধা মনে হয় লাল পাগড়িতে ঢাকা বুঝি মাথাটি। মুখখানি শুষ্ক হলেও ধূসর চোখে আশ্চর্য উজ্জ্বল দৃষ্টি। নম্র মধুর কণ্ঠস্বরে তিনি স্বামীর সাম্প্রতিক মৃত্যুর কথা আর এখানকার বাড়ি ও জিনিসপত্তর বিক্রি করে শহরে গিয়ে একটা স্কুল খোলার বাসনার কথা বললেন।

'বুদ্ধিটা আপনার ভাই যুগিয়েছেন। সত্যিই আপনার ভাইটি চমৎকার মানুষ। যেমন হাসিখুশি তেমনি সচল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি।'

পিওতর তার চারপাশের পরিবেশটা খুঁটিয়ে দেখছিল। ঘরখানা ছোটই আসবাবপত্র অনেক কিন্তু সব যেন মানিয়ে গেছে। দেয়ালে টাঙানো রয়েছে তিনখানা বড় বড় ছবি। পিওতরের ঠিক সামনে ঝুলছে একটি ঘোড়ার ছবি ঠিক যেন রূপকথার ঘোড়া। গর্বের ভঙ্গিতে সে ঘাড় বেঁকিয়ে রয়েছে আর তার কেশর এত দীর্ঘ যে মাটি ছোঁয় আর কি! ঘরের আর একটি প্রান্তে ছোট একটি মেয়ে ছবি আঁকছে। মায়ের কথায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে সে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ছবি আঁকছে অপূর্ব স্বাচ্ছন্দ্য আর শান্তিতে ভরা পরিবেশ, তারই মাঝে ভেসে আসছে গৃহকর্ত্রীর কণ্ঠস্বর। যেন সুদূর থেকে ভেসে আসছে করুণ এক সঙ্গীতের সুর। এমন পরিবেশেই একজন মানুষ সারাজীবন শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারে। তার আর অন্যায়

করার ইচ্ছেই হয় না। এমন একজন স্ত্রী পেলে তাকে মন খুলে সব কথা বলা যায়, শ্রদ্ধাও করা যায়।

পরদিন সকালে পিওতর যখন বাড়ির দিকে রওনা হল তখন তার বুকের মধ্যে আঁকা রইল শান্তি ও সুখের অনবদ্য একখানি ছবি। ধূসরনয়নী অপার্থিব এক নারী যেন তাকে এক শান্তির নীড়ে আহ্বান জানাচ্ছে প্রতিনিয়ত। সখেদে স্বগতোক্তি করে সে, হায়, কী সুন্দর এক জীবনের ছবি!

যে কোনো কারণেই হোক পিওতর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সেই রাতের মনোরম অভিজ্ঞতার কথা স্ত্রীকে বলল না, আলেক্সিকেও না। গোপন করার ফলে আলেক্সির বাড়িতে একদিন তাকে বেশ অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হলো। সপ্তাহখানেক পরে একদিন আলেক্সির বাড়ি গিয়ে সে দেখল ভেরা পোপোভা ওর্লোভার পাশে সোফায় বসে আছে। আলেক্সি তাড়াতাড়ি উঠে ভাইয়ের সঙ্গে পোপোভার পরিচয় করিয়ে দিতে গেলে ভদ্রমহিলা মৃদু হেসে বললেন, আমাদের আগেই পরিচয় হয়ে গিয়েছে।

ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে আলেক্সি বলে উঠল, তাই নাকি? তো আমাকে বলনি?

কান টানতে টানতে সে বলল, ভুলে গিয়েছিলাম।

আলেক্সি গলা ছেড়ে হাসতে হাসতে বলল, দেখ দেখ লজ্জায় কেমন লাল হয়ে উঠেছে আমার ভাই। আবার কান টানতে শুরু করেছে। বলি, এমন একজন মহিলাকে কেউ একবার দেখলে সারাজীবনেও ভুলতে পারে?

পোপোভা প্রসন্ন ক্ষমার দৃষ্টিতে হাসি হাসি মুখে পিওতরের দিকে তাকায়।

পান পর্ব শুরু হলে পিওতরের ইচ্ছে হয় পোপোভাকে কিছু বলে। কিন্তু আলেক্সি ঝড়ের বেগে এমন অবিশ্রান্ত ভাবে কথা বলে যাচ্ছে যে সে সুযোগই পাচ্ছে না। সামান্য সুযোগ পেতেই সে বলে ফেলল, না না, ভেরা পোপোভা আপনি তাড়াহুড়ো করে বেচবেন না। এমন কাউকে বেচবেন যে শুধু শান্তিই চায়।

পোপোভা মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলল, সম্পত্তি তাকে বেচতে হবেই।

এর কয়েকদিন পরে আলেক্সি অফিসে এসে পিওতরকে বলল, আমি আসবাবপত্র বন্ধক রেখে ভেরা পোপোভাকে কিছু টাকা দিতে চাই।

না, ও কাজ করো না।

কিন্তু কেন?

বলছি করো না। ভাইকে নিবৃত্ত করার কোনো যুক্তি দেখাতে না পেরে সে বলল, বেশ, তুমি অর্ধেক দিও, আমি অর্ধেক দেব।

আলেক্সি বড় বড় চোখ করে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, বুঝেছি তোমাকে বোকামিতে পেয়েছে। কোনো লাভ নেই। আমিও অনেক চেষ্টা করেছি। মাছের চেয়েও শীতল উনি।

আলেক্সির সাবধানবাণী সত্ত্বেও কয়েকবার সাক্ষাতের পরেই পিওতর মাঝে মাঝে স্বপ্নে পোপোভাকে দেখতে থাকে। শ্রমিকদের অসন্তোষ অভিযোগ কিংবা খোসামোদ তাকে ক্লান্ত করে তুলেছে। তার এই জাগতিক জীবনের পাশে স্বপ্নে যখন সে পোপোভার পাশাপাশি বসে থাকে তখন জীবনকে মনে হয় অবিমিশ্র আনন্দের উৎস। সেই জীবনে নিজেকে মনে হয় যেন পোষা বেড়াল, বান্ধবীর আদরে যত্নে আশ্চর্য সুখের জীবন—এর চেয়ে বেশি কিছু সে চায় না। এক সময় পাভলুসকা ছিল তার জীবনের একটা কালো বিন্দু, তাকে ঘিরেই সব অন্ধকার চিন্তাগুলো ঘুরপাক খেত।। সেই কালো বিন্দুটা হারিয়ে গিয়ে দেখা দিয়েছে একটি উজ্জ্বল বিন্দু, যার নাম পোপোভা।

তবু স্বপ্নে সে পোপোভাকে কামনার ধন হিসেবে দেখে না বরং একটি শোভন সুন্দর জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই দেখে। কিন্তু ওর্লোভা যেদিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সেদিন সেবারতা পোপোভাকে দেখে তার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। পোপোভা বেসিনে তোয়ালে ভিজোচ্ছে নত হয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে—তন্বী পোপোভার দেহসুষমার আকর্ষণ তখন দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল। কোনো মহিলার আকর্ষণ এর আগে তাকে এমন বিবশ করে তোলেনি। বিপদের অস্পষ্ট আশঙ্কায় শিউরে ওঠে সে। ডাক্তার আনার জন্যে নিজের গাড়ি পাঠিয়ে পায়ে হেঁটে সেদিন সে বাড়ি ফিরেছিল।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে তুষারঝঞ্ঝা শুরু হয়ে গেল। মাটির ওপর ধূসর কুয়াশায় চারদিক এমন পরিব্যাপ্ত যে আকাশটিকে তার পূর্ণ রূপে দেখা যায় না। মনে হয় একটা ওলটানো গামলা। সেখান থেকে রাশি রাশি ধূলিকণা নেমে এসে শ্বাসরুদ্ধ করে দেয়। নরম বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পিওতরের মনে হচ্ছিল ব্যর্থতায়, হতাশায় নিষ্পিষ্ট হয়ে সে যেন জীবনের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এমনটি হয়েছিল নিকিতার আত্মহত্যা ও পাভলুসকার হত্যার দিনে। প্রথম দুটি অভিজ্ঞতার তাৎপর্য এখন তার কাছে পরিষ্কার কিন্তু তৃতীয় অভিজ্ঞতাটি তার কাছে আরো

দুর্বোধ্য আরো ভয়াবহ মনে হয়। একটা কথা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে এই মেয়ে কখনো তার রক্ষিতা হয়ে থাকবে না। অথচ তার কামনা এই মেয়েটিকে ইতিমধ্যেই সাধারণ স্তরে নামিয়ে এনেছে। স্ত্রী যে কি জিনিস তা আর জানতে তার বাকি নেই, রক্ষিতা যে তার চেয়ে কিছু ভালো হবে তাও মনে হয় না।

মনের এই অশান্তিতে রাতে তার ভালো ঘুম হয় না। একদিন খুব ভোরে উঠোনে বেরিয়ে এসে সে দেখে তুলুনের নিস্পন্দ শরীরটা রক্তের স্রোতের মধ্যে ভাসছে। ভোরের আলো তখনো ভালো করে ফোটেনি তাই রক্তের রঙ মনে হচ্ছে কালো। টিখনের দরজায় টোকা দিয়ে সে জানতে চায়, কে এই কাণ্ডটা করলো।

টিখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, আমিই ওকে মেরে ফেলেছি।

কিন্তু কেন?

ও আবার একজনকে কামড়ে দিয়েছিল।

কাকে?

সেরাফিমের মেয়ে ঝিনাইদাকে।

পিওতর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে, কুকুরটার জন্যে মায়া হয়।

তা তো হতেই পারে। আমি ওকে লালনপালন করেছি, সম্প্রতি আমাকে দেখলেও কামড়াতে আসতো। তা এভাবে চেন দিয়ে দিনের পর দিন বেঁধে রাখলে মানুষও পাগল হয়ে যেত আর ও তো কুকুর।

তা ঠিক কথা, বলে পিওতর ওখান থেকে চলে এল। হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবছিল নির্বোধটা কখনো কখনো বুদ্ধিমানের মতো কথা বলে ফেলে।

কারখানার কাছাকাছি আসতে তার নজরে পড়ল সেরাফিমের ঘরের একটি জানলা খোলা। হালকা হলুদ রঙের আলো দেখা যাচ্ছে। পিওতর গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেল আস্তাবলের পাশে সেরাফিমের ঘরের কাছে। জানলায় উঁকি দিয়ে দেখল ঘরে শুধু ঝিনাইদাই রয়েছে। টেবিলের ওপর বাতি জ্বলছে আর ঝিনাইদা শুধু শেমিজ পরে মাথা নীচু করে কি যেন সেলাই করছে। পিওতর ভেজানো দরজা ঠেলে সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল। ঝিনাইদা মাথা নিচু করেই প্রশ্ন করল, কি, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে?

উত্তর না পেয়ে সে মাথা তুলল। সঙ্গে সঙ্গে সেলাইটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মুখখানা সরস করে তুলে সে বলল, হায় ভগবান! আমি ভেবেছিলাম বাবা ফিরে এলেন বুঝি।

শুনলাম তুলুন তোমায় নাকি কামড়ে দিয়েছে!

'তাই তো মনে হয়। চোখের পলকে ঝিনাইদা একখানা পা চেয়ারের ওপর তুলে দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত শেমিজ তুলে দেখায়।

শুভ্র নিটোল পা খানার দিকে তাকিয়ে থাকে পিওতর। হাঁটুর নিচে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কাছে এগিয়ে গিয়ে সে প্রশ্ন করল, এত সকালে উঠোনে কি করছিলে?

ঝিনাইদা চোখ টিপে অর্থবহ হাসে তারপর ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বলে, দরজাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভালো।

আধঘন্টা পরে ঝিনাইদার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে কারখানার দিকে হাঁটতে থাকে। হাঁটার সময়ে তার কান টানাও চলছে মেয়েটার নির্লজ্জ আচরণ, মোহ বিস্তার করে আচ্ছন্ন করে রাখার ছলাকলার কথা স্মরণ করে সে মুখ টিপে হাসে আর পিচ পিচ করে থুথু ফেলতে থাকে। মৌমাছির চাকে সে ভালুকের মতো হানা দিয়েছে শ্রমিকদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনে। এদের নগ্ন, অসংযমী উচ্ছ্বাসকেই ঝিনাইদা ও তার বন্ধুরা বলে ভালোবাসা। এই ভালোবাসার ঝাঁঝ মদের চেয়েও বেশি নেশা ধরায়।

শ্রমিকরা সেরাফিমের কুঁড়েঘরের নাম দিয়েছে 'ফাঁদ'। সেরাফিম কিন্তু বলে 'আশ্রম'। কাঁধের ওপর একতারাখানি রেখে সে বাজনার সঙ্গে গান ধরে। নিজের মেয়ে ও অন্যান্য মেয়েদের দিকে তাকিয়ে সে বলে, এই যে সন্ন্যাসিনীরা, এবার মজা বিলোতে শুরু কর। পিওতর ইলিচ, এই যে এদের দেখছেন ওরা সব সন্ন্যাসিনী। শয়তানের সেবা করার ব্রত নিয়েছে ওরা আর আমি হচ্ছি ওদের পুরুত।

সেরাফিমের একটাই কথা—টাকা ফেল, আমি আনন্দ দিচ্ছি। নানা রকম গল্প সে শোনায়। একবার সে একটি গল্প বলে। ইয়াপুসকিন নামে একটি লোক ফেরিওলার মতো কাঁধে ঝোলা নিয়ে দেশময় ঘুরে বেড়াতো। বেড়াতে বেড়াতে সে যা কিছু দেখত শুনতো সব লিখে রাখতো। অনেক লেখা হয়ে গেলে একদিন সে মহামান্য জারের কাছে উপস্থিত হয়ে বলে, 'পড়ে দেখুন মহারাজ আমাদের কৃষকরা কি ভাবছে।' জার লেখা পড়ে অস্বস্তি বোধ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন কৃষকদের মুক্তি দিতে এবং মস্কোতে এই লোকটির একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতে। জার আরো আদেশ দিলেন, এই লোকটিকে এখনই সুদজালে চালান করে দিতে এবং সরকারী খরচে অঢেল মদ পরিবেশন করতে। লোকটি যা লিখেছিল সবই জারের বিরুদ্ধে যায়। পরিশেষে দেখা গেল মদ খেয়ে খেয়ে লোকটি একদিন টেঁশে গেল

আর তার লেখাগুলোও লোপাট হয়ে গেল।

পিওতর বলল, তুমি একটি আস্ত মিথ্যেবাদী।

না হুজুর, একমাত্র মেয়ে ছাড়া আমি আর কারো কাছে মিথ্যে কথা বলি না। মিথ্যে কথা বলা আমার পেশা নয়। তা ছাড়া সত্য না জানা থাকলে মিথ্যে কথা বলা যায় না। আমি সত্য কি তা জানি না সুতরাং মিথ্যে কথা কি করে বলবো? সত্য হচ্ছে মেয়েমানুষের মতো, কচি বয়সেই সুন্দর।

সত্য জানুক আর নাই জানুক সেরাফিম ভদ্রলোকদের কেচ্ছার কাহিনী অনেক জানতো। ডাইনী, ডাকাত, হতাশ প্রেম, অগ্নিমুখী সাপের মতো বিধবাদের ঘরে হানা দেওয়ার গল্পগুলো এমন আকর্ষণীয় ভাবে বলতো যে তার অবাধ্য মেয়েরাও শান্ত হয়ে আগ্রহ সহকারে শুনতো।

ঝিনাইদার একদিকে উচ্ছৃঙ্খলতা অন্যদিকে মানুষকে দোহন করার ক্ষমতা দেখে পিওতরের ঘেন্না ধরে গেছে। নিজেকেই সে প্রশ্ন করে, সুন্দরী মেয়ে তো অনেক ছিল, এটাকেই কেন বেছে নিলাম। ইলিয়া জানতে পারলে আমার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে!

বুড়ো সেরাফিমকে কিন্তু বেশ লাগে পিওতরের। মানুষকে আনন্দ পরিবেশন করতে তার জুড়ি নেই কারখানার সবাই তাকে ভালোবেসে নাম দিয়েছে 'আনন্দ-সঙ্গী'। কিন্তু টিখনের সঙ্গে সেরাফিমের এত বন্ধুত্ব কেন তা পিওতর বুঝে উঠতে পারে না। টিখনটা আজকাল বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তার বিরাগভাজন হচ্ছে। তবুও আর্টামনোভ পরিবারে টিখনের চাকরির বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নাতালিয়া ওকে উপহার দিতে চাইলে পিওতর আপত্তি করে না। নাতালিয়া বলে, দেখ এমন লোক খুব কমই পাওয়া যায়। বিশ বছরে একটিবারও সে আমাদের কোনো অসুবিধে করেনি। মোমের আলোর মতো ওর স্নিগ্ধ দীপ্তি।

বিশেষ সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে পিওতর নিজে গিয়ে উপহার দিয়ে আসে। টিখনের ঘরে তখন সেরাফিমও ছিল। টিখন মনিবের পায়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল।

এই নাও হাতঘড়ি আমার তরফে, আমার স্ত্রী পাঠিয়েছেন একটা কোটের কাপড়। তাছাড়া কিছু টাকাও দিচ্ছি।

টাকা আমার চাই না। পুরস্কারগুলোর জন্যে ধন্যবাদ।

টিখন সেরাফিমের আনা মদ্যপানের জন্যে মনিবকে আমন্ত্রণ জানালো। পিওতর অবশ্য ভদ্রভাবে তা প্রত্যাখ্যান করল। সেরাফিম বলল, আমরা

জানি আপনি কাজের লোক এবং সে কাজও অত্যন্ত কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ।

হাতঘড়িটা দেখতে দেখতে টিখন বলল, হ্যাঁ, ব্যবসা হল রেলিং-এর মতো। খাদের ধার দিয়ে হাঁটার সময় আমরা ওই রেলিং ধরে এগোই।

সেরাফিম বলল, ঠিক বলেছ ভাই নইলে তো আমরা পড়ে তলিয়ে যাব।

পিওতর ধমক দিয়ে বলল, ব্যবসার তোমরা কি বোঝ? তোমরা তো আর মালিক নও।

সেরাফিম মালিককে শান্ত করার জন্যে বলল, ব্যবসা অবশ্য ভালোও আছে, খারাপও আছে।

টিখন মন্তব্য করল, ভালো ছুরিটাও তোমার গলার কাছে ধরলে ব্যাপারটা আর ভালো থাকবে না।

বোকার মতো কথা বলো না। কী যে সব বল কিছুই বোঝা যায় না।

হ্যাঁ, বোঝা অবশ্য একটু কঠিন।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পিওতর চলে আসে। মনে মনে সে ভেবে নেয় এবার এই লোকটিকে সরিয়ে দেবার সময় এসেছে। কালই ওকে বরখাস্ত করব। না না, কাল নয়, আগামী সপ্তাহে।

অফিসে তখন ভেরা পোপোভা অপেক্ষা করছিল। মেঝেতে ছাতা ঠুকতে ঠুকতে সে বলল, আপনি যদি সময় বাড়িয়ে না দেন তাহলে আপনি সম্পত্তি বেচে দিতে পারেন, আমি এখন সুদ মিটিয়ে দিতে পারব না। এই বলেই মেঝেতে আবার ছাতা ঠুকে সে বেরিয়ে যায়।

ঘন্টাখানেক পরে পিওতর ওর্লোভার কাছে যায়। তাকে বলে, তোমার বান্ধবীকে বলো আমি সুদ চাই না আর দুশ্চিন্তা করতেও বারণ করবে।

ওর্লোভার চোখে হাসির ঝিলিক। পিওতর রেগে গিয়ে বলে, হেসো না।

এদিকে ওর্লোভা খবর দেয় যে নাতালিয়া পিওতর ও ঝিনাইদার সম্পর্কের ব্যাপারটা জানে। ওর্লোভার কাছে এসে সে কান্নাকাটি করে গেছে।

পিওতর ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, বজ্জাত মেয়েমানুষ! আমাকে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেয়নি যে সে জানে। এদিকে তোমাকে তো দেখতে পারে না আবার তোমার কাছেই এসে কান্নাকাটি করে গেছে। বিরক্ত হয়ে সে উঠে পড়ে, বাড়ির পথ ধরে। অনেকদিন পর স্ত্রীর কথা তার মনে হয়। যদিও প্রতি

রাত্রে প্রার্থনার পর নাতালিয়া অভ্যস্ত সোহাগে তার পাশে এসে শোয় তবু অনেকদিন যেন সে তাকে লক্ষ্যই করেনি। আসলে স্ত্রী হচ্ছে অভ্যস্ত অতি পরিচিত পথের মতো। অসাবধানে হাঁটলেও হোঁচট খেতে হয় না।

ঝিনাইদার সঙ্গে যত সহজে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবে ভেবেছিল তা কিন্তু পেরে ওঠে না। নির্লজ্জ ওই মেয়েটার পাশাপাশি আর একটি চেতনা জেগে ওঠে। এ যেন দ্বিতীয় এক পিওতর তার মধ্যে জন্ম নিয়েছে। যখন সে কোনো বিষয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন তখন এই দ্বিতীয় সত্তাটি বৈশাখী ঝড়ের মতো মনের এক কোণে উপস্থিত হয়ে তাকে যত সব বিরুদ্ধ কথা বলে যায়, মনকে বিভ্রান্ত করে তোলে। সে বলে, ও হে, ঘোড়ার মতো তো খেটে চলেছ, কিন্তু কেন? একটা জীবন চালানোর পক্ষে যথেষ্টই কামিয়েছ, আর কেন? এবার ছেলের ওপর সব কিছু ছেড়ে দাও। ছেলেকে ভালোবাসে বলে একটা নিরীহ ছেলেকে খুন করলে। একটা মেয়েকে ভালো লাগলো অমনি ছুটলে তার পিছনে, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন শুরু করে দিলে।

এইসব চিন্তা দেখা দেওয়ার পর জীবনকে বড়ই বিবর্ণ মনে হয়। ক্লান্ত বিবশ হয়ে পড়ে সে। অনেক কিছুই তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। ইলিয়া যে কখন সাবালক হয়ে উঠেছে খেয়ালই করেনি সে। নাতালিয়া যে কখন এক জুয়েলারের ছেলের সঙ্গে এলেনার বিয়ে স্থির করে ফেলল তাও সে খেয়াল করেনি। এইভাবেই গুমোট আবহাওয়ার মধ্যে একদিন তার শাশুড়ী চলে গেলেন।

ইলিয়াকে প্রথম দর্শনে চেনাই যায় না। অনেক বদলে গেছে। অনেক লম্বা হয়ে গেছে, রোগাও হয়েছে। চুলের গোছা কপালের ওপর এসে পড়ায় কপাল আগের তুলনায় ছোট দেখায়। ধূসর রঙের স্যুট পরেছে, গোঁফের রেখা স্পষ্ট হয়েছে। ইয়াকভের চেহারা আগের মতোই থলথলে, শুধু মাথায় বড় হয়েছে এই যা, অনেকটা তারই মতো দেখতে। ছেলেরা বাবাকে সম্ভ্রম জানিয়ে অফিস ঘরে এসে বসল।

তারপর তোমাদের দিদিমা তো মারা গেলেন। পায়চারি করতে করতে পিওতর বলে। ইলিয়া সিগারেট ধরালো, কিছু বলল না। ভাগ্যিস ছুটির মধ্যে মারা গিয়েছেন না হলে আসতে পারতাম না। ইয়াকভ মন্তব্য করে।

ছোট ছেলের এই বোকার মতো মন্তব্যের কোনো গুরুত্ব দিল না পিওতর। সে শুধু ইলিয়াকেই দেখছিল। চোখের দৃষ্টি আরো গভীর হয়েছে,

মুখের রেখা হয়েছে আরো কঠিন। এই ছেলেরই একদিন কান টেনে ধরেছিল সে, ভাবতেই কেমন অবাক লাগে।

অনেক বড় হয়ে গেছ ইলিয়া, এবার ব্যবসা বুঝে নাও। তিন বছরের মধ্যে দেখবে তুমি একেবারে শীর্ষে উঠে গেছ।

একটি কোণ-ভাঙা সিগারেট কেসটা নিয়ে লোফালুফি করছিল ইলিয়া। শান্ত নির্লিপ্ত স্বরে সে বলল, আমি পারব না, আমাকে এখন পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে।

কতদিন?

অন্ততঃ চার পাঁচ বছর।

তাই নাকি? তা কি পড়বে?

ইতিহাস।

ইলিয়ার সিগারেট খাওয়া দেখে মোটেই খুশি হয়নি পিওতর। তার ওপর সিগারেট কেসটাও সস্তার এবং ভাঙা। আর একটু ভালো জিনিস কিনতে পারতো। এই পড়ার ব্যাপারটায় সে তো রীতিমতো ক্রুদ্ধ। জানলা থেকে দেখা যাচ্ছে কারখানার চিমনি থেকে কেঁপে কেঁপে ধোঁয়া উঠছে। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওই দেখ, তোমার ইতিহাস বাষ্পের রেখা এঁকে চলেছে। ওইটিই আসল ইতিহাস। আমাদের কাজ হচ্ছে কাপড় বোনা, ইতিহাস-টিতিহাস আমাদের জন্যে নয়। আমার বয়স পঞ্চাশ হল, এবার তোমার উচিত আমাকে বিশ্রাম দেওয়া।

ইলিয়া বলে, মীরন আপনার কাজ দেখবে, ও তো ইঞ্জিনীয়ার হবে। তা ছাড়া ইয়াকভ রয়েছে।

মীরন আমার ভাইপো, ছেলে নয়। যাই হোক এ বিষয়ে পরে কথা বলা যাবে।

ছেলেরা চলে যাবার পর পিওতর বিষণ্ণ মনে ভাবে, ওরা কি বাপের সঙ্গে অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলতে পারত না। মাত্র পাঁচ মিনিট ওরা রইল তার মধ্যে একজন বোকার মতো মন্তব্য করল আর একজন তামাকের গন্ধে ঘর ভরিয়ে দিয়ে চলে গেল। সপ্তাহখানেক পিওতর ইলিয়ার আচরণ লক্ষ্য করে গেল। এই সময়ে ইলিয়াকে দেখা গেল শ্রমিকদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে। টিখন তো ওর সবচেয়ে আপনজন। ইলিয়ার সঙ্গে টিখনের কথাবার্তার কিছু টুকরো একদিন তার কানে ভেসে আসে। 'বুঝলে না ভিখিরির কিছু থাকতে নেই। প্রকৃত সত্য কি জানো ইলিয়া, কিছু লোক যদি এত লোভী না হতো তাহলে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পেত।'

ইয়াকভের চালচলন বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। কারখানার ভেতর ঢুকে সে মেয়েদের দিকে আড়চোখে তাকায়। টিফিনের ছুটির সময়ে সে আস্তাবলের ছাদের ওপরে উঠে শ্রমিক মেয়েদের স্নানের দৃশ্য উপভোগ করে।

একদিন সকালে কাঁধের ওপর ক্যানভাসের ওভারকোট চাপিয়ে হাতে আলেক্সির দেওয়া ছড়িখানা নিয়ে পিওতর বেড়াতে যায়। হঠাৎ নজরে পড়ে নদীর পাড়ে একটা উঁচু ঢিবির ওপর গাছের নিচে ইলিয়া শুয়ে আছে। পিওতর আতঙ্কিত হয়ে ওঠে. কী অসাবধানী ছেলে! স্যাঁৎসেঁতে বালির ওপর শুয়ে আছে! সর্দি-জ্বর হবে যে।

ছেলেকে কি কি বলবে বেশ ভালোভাবে মনের মধ্যে সাজিয়ে নিয়ে পিওতর রওনা হয়। অতিকষ্টে ভারী শরীরখানা নিয়ে সেই ঢিবির ওপর উঠে দেখে ইলিয়া একখানা মোটা বই পড়ছে। মাঝে মাঝে পেন্সিল দিয়ে বিশেষ বিশেষ জায়গায় দাগ দিচ্ছে। একবার চোখ তুলতেই বাবাকে দেখতে পায়। তাড়াতাড়ি পাতার ভাঁজে পেন্সিলটা রেখে শব্দ করে বই বন্ধ করে দেয়। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে সোজা হয়ে বসে।

পিওতর মনে মনে স্থির করে আজ আর সে ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো কথা বলবে না। তার জন্যে অনেক সময় পাওয়া যাবে। আজ শুধুই টুকিটাকি কথা হবে।

ইলিয়া উৎসাহের সঙ্গে বলে ওঠে, বাবা, আমি স্থির করলাম বিজ্ঞানের সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করবো।

উৎসর্গ? তুমি কি পুরোহিত নাকি? কথাটা ঠাট্টার সুরেই পিওতর বলতে চেয়েছিল কিন্তু নিজের কানেই শুনতে লাগল অত্যন্ত রূঢ়।

শিল্পপতি হবার কোনো বাসনা আমার নেই। আমি ও কাজের যোগ্য নই। কি কি কারণে ব্যবসায় সে আসতে চায় না এই নিয়ে ইলিয়া প্রায় দশ মিনিট ধরে বলে গেল। ছড়িখানা বালির ওপর ঠুকে পিওতর ধমকে ওঠে, চুপ করো, বোকার মতো কথা বলো না। লাভ ছাড়া জগৎ চলে না। প্রত্যেকেই চায় কিছু লাভ করতে। সবাই বলে এতে আমার লাভ কি? লাভকে কেন্দ্র করেই জগৎ ঘুরছে।

আপনার কথাগুলোর মধ্যে আমি মনের সায় খুঁজে পাচ্ছি না। ওই নীতিতে এখন আর জীবন চলে না।

লাঠিতে ভর দিয়ে পিওতর সোজা দাঁড়িয়ে বলল, ও, তুমি তাহলে বাবার কথার মধ্যে কোনো সত্য দেখতে পাচ্ছ না।

সত্যের আরো একটি দিক আছে।

আর কোনো সত্য নেই। ওই যে কারখানাটি দেখছো সত্য নিহিত রয়েছে ওখানেই। তোমার ঠাকুরদা পত্তন করেছিলেন, আমি তাকে বাড়িয়েছি। তুমি কি ধর্মভীরু লোকদের মতো পরের শ্রমের ওপর নির্ভর করে বাঁচতে চাও? তুমি ইতিহাস পড়তে চাও। ইতিহাস কি একটি মেয়ে? তাকে কি তুমি বিয়ে করতে পার?

পিওতর বুঝতে পারে যে সে মাথা গরম করে ফেলছে। তাই এবারে সে নরম সুরে বলে, বুঝতে পারছি তুমি মস্কোয় থাকতে চাও, ওখানে অনেক মজা আছে তাই আলেক্সিও···

বাবা, আমাকে পড়াশোনা চালিয়ে যাবার অনুমতি দিন।

না, আমি অনুমতি দেব না। ভবিষ্যতে এমন আবদার আর করবে না।

তাহলে আপনার অনুমতি ছাড়াই আমাকে কাজ করে যেতে হবে।

তোমার এত স্পর্ধা?

আপনি কোনো মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলতে বাধ্য করতে পারেন না।

পিওতর দেখতে পেল ছেলের হাত দুটি অসম্ভব কাপছে, পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়েও কাঁপুনি বন্ধ করতে পারছে না সে। ছেলে পাছে আরো কঠিন কিছু বলে ফেলে সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি বলে ফেলে, জানো তোমার জন্যে আমি একজনকে খুন করেছি ··মানে···সম্ভবত···।

পিওতর ভয় পায়। এখনই ছেলে বোধহয় প্রশ্ন করে বসবে, কে সে? কিন্তু ছেলে সেদিক দিয়ে গেল না। সে বলল, একজনকে নয়, অনেক মানুষকেই আপনি খুন করেছেন। বলেই সে আঙুল তুলে দেখায় কবরখানার অজস্র ক্রুশের দিকে। আবার সে বলে, ওরা সবাই আপনার কারখানার শিকার।

পিওতর সজোরে লাঠি দিয়ে ছেলেকে মারতে যায় কিন্তু ইলিয়া গাছের পিছনে লুকিয়ে পড়ায় লাঠিখানা গাছে ঘা খেয়ে কয়েক টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। 'নচ্ছার ছেলে, তোকে দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করাবো' বলেই ঢিবি থেকে পিওতর নামতে শুরু করে। বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে সে আবার চিৎকার করে বলে, তোর ভাগ্য আমিই নির্ধারণ করব।

হাঁটতে হাঁটতে পিওতর একা নদীর পাড়ে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকে। একসময় নদীর শান্ত স্রোত তার ক্রোধ কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তখন সে আশ্চর্য হয়ে ভাবে কুড়ি বছর বুকের মধ্যে লালিত হয়েছিল সেই

স্নেহের ধন একটি মুহূর্তে তার বুক ফাঁকা করে চলে গেল। বুকের মধ্যে রয়ে গেল শুধুই বেদনা। কুড়িটা বছর এই ছেলেকে ঘিরে কত স্বপ্নই না বাসা বেঁধেছিল তার মনে। কত আশা, কত স্বপ্ন একদিনের একটি দমকায় দেশলাইয়ের কাঠির মতো জ্বলেই নিভে গেল। ব্যবসা মানুষের ক্ষতি করে এইসব ধারণা নিশ্চয়ই টিখন ওর মাথায় ঢুকিয়েছে। ওর যত ভালোবাসা সবই শ্রমিকদের জন্যে, বাপের জন্যে এতটুকু ভালোবাসাও নেই ওর মনে। ভিখিরির মতো আমায় তাড়িয়ে দিলে।

সেদিন রাতে নাতালিয়া ইলিয়ার কথা তুলতে এক হাত নিলে সে তাকে। 'তোমার কি ইলিয়ার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?' এ প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, ছেলের সঙ্গে কেউ ঝগড়া করে না, শাসন করে। নাতালিয়া যখন বলল, 'ইলিয়া তো শহরে চলে গেছে' তখন পিওতর রাগত স্বরে বলল, ফিরে তাকে আসতেই হবে। রেস্ত ফুরিয়ে গেলেই আসবে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তারপরেই স্ত্রীকে সে আক্রমণ করল, তুমি কোন্ কাজের বলতে পারো? ঘুমোনো আর গালে রঙ মাখা ছাড়া আর কি পারো তুমি? ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে পারোনি তাই আজ এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

নাতালিয়া শুধু ক্ষীণ স্বরে বলে, স্কুলে পাঠিয়েছিল কে? তখনই তো বলেছিলাম···।

চুপ করো, আমাকে বিরক্ত করো না।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ। চোখ বুজে নিকিতার লাগানো বার্ড-চেরী গাছের ওপর বৃষ্টির একটানা শব্দ শুনতে শুনতে নিকিতার কথা মনে পড়ে যায় তার। নিকিতাটা বেশ আছে। ছেলেপুলে নেই, ব্যবসা নেই।

সকাল হতেই পিওতর ঠিক করে ফেলে সে নিকিতাকে দেখতে যাবে। প্রলোভন আর ভয় থেকে দূরে কয়েকটা দিন শান্তিতে কাটিয়ে আসা যাবে।

অনেক ঝাঁকুনি খেতে খেতে পিওতর যখন মঠের কাছাকাছি পৌঁছয় তখন ক্লান্তিতে মনে মনে সে বলে, হুঁ, এক কোণে বসে জীবন কাটানো খুবই সহজ। শশা ঠাণ্ডা ঘরে ভালোই থাকে, রোদে রাখলেই শুকিয়ে পচে যায়।

চার বছর পর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। চার বছর আগে হৃদয়হীনতা আর বিরক্তির মধ্যে তারা বিদায় নিয়েছিল। পিওতর আসায় নিকিতা খুশি হয়নি এবং তা গোপনও করেনি। টাকা দিতে গেলে নিকিতা বলেছিল ফাদার সুপিরিয়রকে দাও, আমার দরকার নেই। ফাদার সুপিরিয়র একজন

লোমশ বিশালকায় বুনো দত্যির মতো দেখতে। পিওতরকে সে বলেছিল, 'ফাদার নিকোডিম (নতুন নামকরণ) আমাদের মঠের অলঙ্কার।'

গাছের শিকড়ে এবড়োখেবড়ো পথ দিয়ে হাঁটার সময় পিওতরের মনে হচ্ছিল তার এখন দরকার ছিল আমোদপ্রমোদের।

লিণ্ডেন গাছের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বেষ্টনীর মধ্যে একখানি বেঞ্চির ওপর বসে নিকিতা কয়েকজন ভক্তকে উপদেশ দিচ্ছিল।

'ভগবান আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছেন কারণ তিনি বোঝেন আমাদের বিশ্বাসের জোর নেই। আমরা প্রতিবেশীদের সাহায্য করি না। যখন প্রার্থনা করি তখন চাই সব তুচ্ছ জিনিস···' ইত্যাদি। ভাইকে দেখে নিকিতা উঠে দাঁড়িয়ে ভক্তদের বলে, এই যে আমার ভাই এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। ভক্তেরা পশুপালের মতো এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তোমাকে এখন আশা করিনি। বলে নিকিতা ভাইকে নিয়ে নিজের কুটিরের দিকে এগোতে থাকে। পিওতর বলে, তুমি অনেক বুড়ো হয়ে গিয়েছ।

এ তো স্বাভাবিক পরিণতি। আমার পায়েও খুব ব্যথা, জায়গাটা খুব স্যাঁতসেঁতে।

নিকিতার কুঁজটা আগের চাইতে আরো বড় হয়ে গিয়েছে। টুপি খুললে হাতির দাঁতের মতো সাদা টাকটা মড়ার খুলির মতো দেখায়। মুখখানি তো হাড়সর্বস্ব। চোখের দৃষ্টিও অনেক নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। মুখমণ্ডল আগের চেয়েও বড় হয়ে একটা গভীর গর্তের সৃষ্টি করেছে। ঠোঁটের ওপরে বিশ্রী লোম। সব মিলিয়ে ভয়াবহ দেখতে হয়েছে তাকে।

নিকিতার কুটিরে দুই ভাই মুখোমুখি বসে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর পিওতর বলে, তোমার জন্যে কয়েক বোতল ভালো মদ এনেছিলাম। এখানে মদ চলে তো ?

এখানে তেমন কড়াকড়ি নেই। এখন অনেক মাতালও আসে মঠ পরিদর্শন করতে। তারা মদ খায়। মদ ছাড়া ওদের জীবনে আর কীই বা আছে। পৃথিবীর নিঃশ্বাস বিষাক্ত হয়ে গেছে। সাধুসন্ন্যাসীরাও তো মানুষ।

শুনেছি এখানে অনেক লোক আসে তোমাকে দেখতে।

ঠিকই শুনেছ। ওরা একজন খাঁটি ধার্মিক লোককে খোঁজে যে ওদের বাঁচার পথ দেখিয়ে দেবে। ওরা অনেকদিন বেঁচেছে কিন্তু আর পারছে না।

ধৈর্য ওদের ফুরিয়ে গেছে।

এসব কথা শুনে পিওতর অস্বস্তি বোধ করে। প্রতিবাদ করে সে। মোটেই তা নয়। যখন ভূমিদাস ছিল তখন ওদের ধৈর্য ছিল। স্বাধীনতা পেয়েই ওরা গোল্লায় গেছে। ওদের দরকার শক্ত হাতে শাসন। জমিদারের আমলে এত সময় নষ্ট করার সুযোগ ছিল না ওদের।

নিকিতা চকিতে একবার চোখ তুলে তাকায়, পরক্ষণেই অবশ্য নামিয়ে নেয়।

মদ এলে নিকিতা নীরবে পান করতে থাকে। পিওতর সংযত হয়ে খায়। ভাইয়ের কাছে সে মাতাল হতে চায় না। কিছুক্ষণ পরে নিকিতা বলে, আমি অন্য কোথাও অনেক দূরে চলে যেতে চাই। পিওতর বলে, আত্মগোপন করে এইভাবে থাকা তো ভালোই।

গোড়ায় ভালোই ছিল এখন আর ভালো নেই। তীর্থযাত্রীদের ভিড় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এরা সবাই মনের শান্তি হারিয়েছে। আমার কাছে ওরা আসে জ্ঞান অর্জন করতে। কিন্তু আমি কি জানি? কি শিক্ষা দেব ওদের? আসলে এ সবই ফাদার সুপিরিয়রের কারসাজি। সত্যিই আমি কিছু জানি না, আমি একজন অবিচারের শিকারমাত্র।

'ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে।' পিওতর মনে মনে বলল। মুখে বলল, বাবা বেঁচে থাকতে বলতেন, নিকিতা তোমাদের সান্ত্বনা দেবে অতএব তুমি তো শান্তিদাতা। নিকিতা কিছু বলল না শুধু তার মুখে ক্ষণিকের জন্যে হাসির রেখা ফুটে উঠল। নিকিতা আবার বলতে শুরু করল, মানুষকে শিক্ষাদানের ভার দিয়ে আমাকে নতুন করে দণ্ড দেওয়া হল। আমাকে জ্ঞানী বলে ওরা প্রচার চালায় এতে মঠের লাভ হয়, আয় বাড়ে।

এ যে কী কঠিন কাজ কি করে তোমায় বোঝাই। আমি বলি শান্ত হও, ধৈর্য ধর। কিন্তু ধৈর্য ধরে ধরে ওরা ক্লান্ত হয়ে গেছে। আমি বলি মনে আশা রাখো। কিন্তু কিসের আশা ওরা করবে? ঈশ্বর ওদের কাছে কোনো সান্ত্বনা নয়।

পিওতর মনে মনে ভীত হয়ে ওঠে। যে ভাবে অভিযোগ করছে এবার না বলে বসে, তুমিও আমাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দিয়েছ। কিন্তু নিকিতা আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করে।

সম্প্রতি এখানে একজন তরুণ পণ্ডিত ব্যক্তি এসেছিল। ভয়ঙ্কর অশান্ত তার মন। ফাদার সুপিরিয়র আমাকে বললেন ওর মনে শক্তি সঞ্চার করতে। কিন্তু সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন সব কথা বলতে থাকে যে তার

গূঢ়ার্থ কেন, সাদা অর্থই বুঝতে পারি না। সে বলে, শয়তান আমাদের দেহের অধীশ্বর একথা মানা যায় না, তাহলে তো দুজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। তাছাড়া এই মতবাদ তো যীশুর দেহের প্রতি অপমানকর কারণ প্রার্থনার সময় আমাদের বলতে হয়ঃ 'যীশুর দেহাংশ গ্রহণ কর এবং তার থেকে অমরতার স্বাদ নাও।'

একাধিক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে হলে তো জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। ফাদার সুপিরিয়রের উপদেশ ভুলে গিয়ে আমি চিৎকার করে বলি, তোমার দেহ ও মন ধ্বংসের প্রতীক। লোকটি চলে যেতেই ফাদার সুপিরিয়র এসে আমাকে তিরস্কার করেন।...হ্যাঁ এই রকমই চলছে।

উনি বলেন আমাকে বই পড়তে। কিন্তু দূর বনানীর মর্মর ধ্বনি শোনাও যা আমার পক্ষে বই পড়াও তাই। আজকের দিনের সমস্যাপীড়িত মানুষের কোনো প্রশ্নেরই উত্তর নেই বইতে। নিত্যনতুন সঙ্কট দেখা দিচ্ছে, লেখকরা তার মোকাবিলা করতে পারছে না।

ফাদার ফিওদর বলেন, 'মানুষের বুদ্ধিই সব অশান্তির মূল। এটা শয়তানেরই কারসাজি।' মারাত্মক যুক্তি। মেনে নেওয়া যায় না। এখানে একজন ডাক্তার আছেন, অত্যন্ত সহৃদয় মানুষ। তিনি বলেন, শিশুর কাছে যেমন খেলনা মজার জিনিস, মানুষের কাছে বুদ্ধিও ঠিক তাই। শিশুর মতোই সে সব জিনিস বুঝে নিতে চায়। কি করে তৈরি হল, ভিতরে কি আছে ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জিনিসটা ভেঙে যায়।

পিওতর ভাবে, ভাই একটু বেশি পান করে ফেলেছে তাই এত সব কথা বলছে। ভাইকে বলে, তুমি অত্যন্ত বিপদজনক সব কথা বলছ।

কিন্তু নিকিতা গুমোট ঘরে মাকড়সার মতো কথার জাল বুনেই যাচ্ছেঃ যে কোনো চিন্তাভাবনাই বিপদজনক বিশেষতঃ সহজ সরল ভাবনা। টিখনের কথাই ধরো না কেন।

টিখনটা তো আধপাগলা। পিওতর মন্তব্য করে।

মোটেই তা নয়, তুমি ভুল করছ। সে একজন স্থিতধী মানুষ। আগে আমিও তাকে পছন্দ করতাম না। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর আমি ওকে বুঝতে পারি। বাবার মৃত্যুর পিছনে যে অন্যায় ছিল তা তোমরা বোঝনি, টিখন বুঝেছিল।

পিওতর বলে, তুমি আজ যা-তা বকছ। বেশি খেয়ে ফেলেছ। নিকিতা কিন্তু থামে না। টিখন বলে ঈশ্বর যদি বিশ্বের প্রভু তবে মানুষের যখন প্রয়োজন বৃষ্টির তখন দেন না কেন? আর আত্মনের কথা যদি বল, সব

ক্ষেত্রেই মানুষের দোষে লাগে না, বাজ পড়েও আগুন লাগে! বলতে পারো কি কারণে বিকলাঙ্গদের সৃষ্টি করেছেন তিনি। একটা কুঁজ তার কোনো কাজে লাগবে?

পিওতর এতক্ষণে যেন স্বস্তি পায়। তাহলে এই কথা। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আত্মীয়স্বজনদের বিরুদ্ধে নয়। পিওতর বলে, এসব কথা তুমি আগে কোনোদিন বলনি তো। নিকিতা বলে, সব কথা বলা উচিত নয়, হয়তো সারা জীবনই চুপ করে থাকতাম যদি না এই তীর্থযাত্রীরা আমার বিবেককে দংশন করতো। টিখনের কথাগুলো মনে পড়লে কিছুটা সান্ত্বনা পাই। ও কিন্তু তোমার কথাও ভাবে। ও বলে, একজন মানুষ সারাজীবন ছেলেদের জন্যে খেটে গেল কিন্তু ছেলেরা পরই রয়ে গেল।

পিওতর দপ করে জ্বলে ওঠে। রাগে চিৎকার করে বলে, ও এসবের কি জানে? ওকে আমি তাড়িয়ে দেব। ও বড্ড বেশি আমাদের সংসারের কথা জেনে ফেলেছে।

ঘন্টা বাজার শব্দ শোনা যায়। পিওতর বলে, তুমি প্রার্থনায় যাবে না?

নিকিতা বলে, না, আজকাল যাই না, পায়ে এত ব্যথা দাঁড়াতে পারি না।

পিওতর বলল, আমি এবার শুতে যাবো, খুব ক্লান্ত লাগছে।

নিকিতা লজ্জা পায়, বলে, কিছু মনে করো না, তোমাকে একা একা গেস্ট হাউসে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলব বলে পরিচারককে সরিয়ে দিয়েছিলাম। ওরা আমার বিরুদ্ধে গোয়েন্দার কাজ করে।

রাতে ঘুম হয় না পিওতরের। মনের মধ্যে বিরুদ্ধ চিন্তাভাবনার সংঘাত, তার ওপর মশার কামড়। ভোর ভোর উঠে সে রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হয়। নিকিতা বিস্মিত না হলেও মুখে বলে, আমি ভেবেছিলাম কয়েকটা দিন থাকবে।

না ভাই, অনেক কাজ পড়ে আছে।

চা খেতে খেতে দুই ভাইয়ের কথা হচ্ছিল।

তুমি তাহলে এখান থেকে চলে যাবে?

যেতে তো চাই কিন্তু এরা যেতে দেবে না।

কেন?

আমি যে ওদের আয়ের উৎস।

ও, তাহলে কোথায় যাবে ভেবেছ?

তীর্থ ভ্রমণে বেরোবার ইচ্ছে।

তোমার পায়ে যে ব্যথা।

পঙ্গুরাও তো তীর্থে যায়।

তা অবশ্য ঠিক।

অনেকক্ষণ নীরবতার পর পিওতর বলে. তুমি আলেক্সি সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে না তো?

কি আর জানতে চাইব? আমি জানি ও বাঁচতে জানে।

বিদায় মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। নিকিতা বলে, কাল যদি কিছু অন্যায় বলে থাকি ক্ষমা করো।

পিওতর বলে, না না, তুমি আমার ভাই তো।

বিদায়। আসি তাহলে।

মঠের সীমানা ছাড়াতেই পিছন ফিরে তাকিয়ে পিওতর দেখে গেস্ট হাউসের সাদা দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো নিকিতাকে মনে হচ্ছে পাথরের মূর্তির মতো।

তৃতীয় খণ্ড

মেলার সেই বাঁধন-ছেঁড়া উন্মত্ত দিনগুলোর কথা মনে পড়লে ভয়ে বিস্ময়ে পিওতর উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করে। যে দৃশ্যগুলো স্মৃতিতে জেগে উঠছে সত্যিই কি সে সব ঘটেছিল? ওই যে পাথরের প্রকাণ্ড কটাহ—যার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ গান, চিৎকার, মত্ত প্রলাপ, নারকীয় সব কাণ্ডকারখানার ঘূর্ণাবর্তে সত্যিই কি সে তলিয়ে গিয়েছিল?

সেই যে বিশাল পিয়ানোর কালো চকচকে ঢাকনার ওপর শুয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক নারী, শাঁখের মতো শুভ্র তার গায়ের রঙ। তার নির্লজ্জ নগ্নতায় শরীর হিম হয়ে যায়। বাহুতে হাত রেখে সে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে। লা মেনোত্তি সেই নারীর নাম। সেই বিশাল পিয়ানোটি কাছে আনা হলে সেই নারীর শরীরের সব রেখা, বিপদজনক বাঁকগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পিওতর ভেবেছিল সবাই বুঝি হেসে উঠবে। কিন্তু ড্রামের প্রবল শব্দের মধ্যে সবাই উঠে দাঁড়াল এবং নিঃশব্দে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখতে লাগল চোখের সামনের অভাবনীয় সেই দৃশ্য।

সেই নারী এমন ভাবে পিয়ানো থেকে মেঝেতে নেমে এল যেন সদ্য ঘুম ভেঙেছে তার। বেহালার তীক্ষ্ণ ধ্বনি পিয়ানোর গম্ভীর সুরের সঙ্গে মিশে গিয়ে সেই নারী শরীর টান টান করে দাঁড়ায়, ঝাঁকিয়ে দেয় মাথা আর চুলের বন্যায় ঢেকে দেয় তার সুউচ্চ বুক। তারপর নাকি সুরে সে গান ধরে, শরীরে ঝড় তুলে নাচতে থাকে।

পিওতর এর আগে এমন তনুদেহী, এমন বিহ্বল-করা সৌন্দর্য দেখেনি। তবু এই নারী তার মনে মুহূর্তের জন্যেও কামনা জাগায়নি, জাগিয়েছে শুধু ভয়। ওই নারীর অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত যাদুকরী প্রভাবে ভয়ে আর লজ্জায় তাকে কেমন যেন বিবশ করে তোলে।

একজন তার কানে ফিসফিসিয়ে বলে, 'চারুসা'।

'চারুসা' পিওতর জানে এর মানে কি। জলার ওপর এক রমণীয় তৃণভূমি। রেশমের মতো নরম সবুজ ঘাসে পা দিলেই অতল জলে তলিয়ে যেতে হবে। তবু পিওতর মন্ত্রমুগ্ধের মতো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। কে যেন তার পায়ে শিকল পরিয়ে বেঁধে রেখেছে। নারীর নগ্নতার সে কী দুর্নিবার আকর্ষণ! ওই নারীর বিলোল কটাক্ষ তার ওপর পড়তেই সে

অস্বস্তিতে ঘাড় ফিরিয়ে নেয়, চারপাশের মন্ত্রমুগ্ধ মানুষদের দিকে তাকিয়ে দেখে। অর্ধোন্মত্ত মানুষগুলো বোবা বিস্ময়ে সেই নারীর নগ্ন রূপের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক যেভাবে একদিন ড্রায়ামোভের লোকেরা গির্জার ছাদ থেকে রঙ-মিস্ত্রীর পড়ে মরে যাওয়া দেখেছিল।

নগ্ন নারীর অঙ্গভঙ্গি ইতিমধ্যে আরো দ্রুত, আরো আক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তার মাংসপেশীর প্রবল আলোড়ন দেখে মনে হয় এখুনি বুঝি সে পিয়ানো থেকে লাফিয়ে পড়বে। তার গানের নাকি সুর আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। শূন্যে পা ছুঁড়ে দেওয়া, মাথার ঝাঁকানি, কাঁধ বুক পিঠের ওপর ঘন ঘন চুলের ঝাপটা—সব মিলিয়ে ভয়ের শিহরণ জাগায়।

হঠাৎ বাজনা থেমে যায়। সেই নারী মেঝেতে লাফিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠানের পরিচালক স্তিয়োপা সোনালী রঙের পোশাকে তাকে জড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সমবেত দর্শকরা ভেঙে পড়ে প্রচণ্ড চিৎকার, করতালি আর ধাক্কাধাক্কিতে। সাদা কাপড়ে আবৃত মড়ার মতো খানসামাদের দ্রুত যাওয়া আসা, গেলাসের টুংটাং শব্দে ঘর ভরে ওঠে। প্রবল গ্রীষ্মে তৃষ্ণার্ত মানুষের মতো লোকগুলো মদ গিলতে থাকে। শুয়োরগুলো পাত্রের মধ্যে নাক ডুবিয়ে যেমন করে খায় লোকগুলোর পান-ভোজনের দৃশ্যটিও তেমনি অশালীন, জান্তব।

একদল বেদেনী নাচতে নাচতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। তাদের নাচগানে বিরক্ত হয়ে দর্শকরা শশার টুকরো, রুমাল ছুঁড়ে মারতে থাকে। ওরা চলে যায় তার বদলে স্তিয়োপা ঢোকায় আর একদল মেয়েমানুষকে। এদেরই মধ্যে লাল পোশাক পরা মোটাসোটা একটি মেয়ে এসে পিওতরের কোলে বসে। সশব্দে পিওতরের গেলাসের সঙ্গে নিজের শ্যাম্পেনের গেলাস ঠেকিয়ে সে বলে, এস, আমরা মিত্যার স্বাস্থ্য পান করি।

মেয়েটি মোটা হলেও প্রজাপতির মতো হালকা, নাম তার পাওলা। গীটার বাজিয়ে সে গেয়ে ওঠে :

আমি এক স্বচ্ছ নীল দিনের স্বপ্ন দেখেছিলাম।

এরপর কিছুটা কারুণ্যের ছোঁয়া দিয়ে গুনগুন করতে থাকে :

যৌবনের দিনগুলি স্বপ্নে দেখি আমি। তারা আর ফিরবে না কোনোদিন।

পিওতর পিতৃসুলভ স্নেহে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কেঁদ না, তুমি এখনো পূর্ণ যুবতী, ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু রাত্তিরে তাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকার সময়ে চোখ বন্ধ করে থাকে পিওতর যাতে পলা মিনোত্তিকে স্পষ্ট দেখতে পায়।

যখন পিওতর তার মনের স্থৈর্য ফিরে পায় (অবশ্য তেমন মুহূর্ত খুবই বিরল) তখন তার মনে হয় এই দুশ্চরিত্রা পাশুতার জন্যে তার অনেক টাকা খরচ হচ্ছে।

ছোট্ট একটা প্রজাপতি। পিওতর মনে মনে বলে।

পিওতরের চমক লাগে মেলার এই মেয়েগুলোর খদ্দেরদের দোহন করার বিস্ময়কর ক্ষমতা দেখে। তার চেয়েও অবাক লাগে তারা নিজেরা যখন রোজগারের টাকা একটি রাতের বিকৃত সুখের বিনিময়ে খোলামকুচির মতো খরচ করে। সে শুনেছে ওই যে কুকুরমুখো পশমের পোশাক ব্যবসায়ী সে নাকি পলা মিনোভ্তির নগ্ন রূপ দেখার জন্যে প্রতিবারেই হাজার হাজার রুবল খরচ করে। আর ওই বেগনী রঙের কানওয়ালা লোকটি একশো রুবলের নোট জ্বালিয়ে সিগারেট খায় আর নোটের বাণ্ডিল মেয়েদের বুকের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলে : নাও হে জার্মান, আমার অনেক আছে।

পিওতরের এখন মনে হয় সব মেয়ের মধ্যেই পলা মিনোভ্তির মতো গায়ে পড়া ভাব আছে। বোকাই হোক কিংবা ধূর্ত হোক, নিরীহ কিংবা মুখরা সব মেয়েই তার প্রতি বৈরীভাবাপন্ন। নিজের স্ত্রীর মধ্যেও একটা গোপন শত্রুতার মনোভাব সে লক্ষ্য করেছে।

প্রজাপতিই বটে! অসংখ্য সুসজ্জিতা সুন্দরী নারী তার কল্পনায় দেখা দিয়ে মনকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু বড়ই ধন্দ লাগে যখন সে ভাবতে বসে। কাজের দাসত্ব করে মানুষ টাকা জমায় আর সেই টাকা কি না তারা পোড়ায়, মেয়েদের পায়ের তলায় মুঠো মুঠো ছুঁড়ে দেয়, কেমন করে এটা হয়? অথচ এরা সবাই সমাজের ওপরতলার মানুষ, বিশাল বিশাল কারখানার মালিক, স্বামী এবং পিতা।

পিওতরের অনুমান তার বাবাও এই ধরনের জীবন যাপন করতো। সে নিজেকে কিন্তু এই আমোদ উন্মাদনার জীবনের শরিক মনে করে না। সে এক আকস্মিক অনিচ্ছুক দর্শক মাত্র। তবে এই চিন্তাগুলো মদের চেয়েও বেশি নেশা ধরায় আর মদ ছাড়া এইসব চিন্তাগুলোকে ডোবানোও যায় না। এই ভাবেই তিনটি সপ্তাহ সে কাটিয়ে দিল প্রমোদের মত্ততায়।

আলেক্সির আকস্মিক আবির্ভাবেই এই ঘোর তার কাটলো।

মেঝেতে শক্ত তোশকের ওপর টান টান হয়ে শুয়েছিল পিওতর। পাশে একটি ছোট বালতিতে বরফের টুকরো, কয়েক বোতল মদ ও মূলোর স্যালাড। বিছানার আর এক পাশে সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়েছে পাশুতা। তার মুখ হাঁ করা, নাতালিয়ার মতো ভুরু ওপরের দিকে তোলা আর

মেঝেতে ঝুলছে নীল শিরায় ভরা একটি সাদা পা। পায়ের আঙুলের নখগুলো মাছের আঁশের মতো চকচক করছে। বাইরে তখন হাটের হাজার হাজার মানুষের কোলাহলে মুখর।

ঝিম ধরা মস্তিষ্ক আর বিষিয়ে যাওয়া শরীরের ব্যথা নিয়ে পিওতর যখন গত রাতের মত্ততার স্মৃতি রোমন্থন করছিল ঠিক তখনই যেন দেওয়াল ফুঁড়ে আলেক্সির আবির্ভাব। মাটিতে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কাছে এসে সে বলল, ব্যাপারটা কী, তুমি এভাবে মেঝেতে পড়ে আছ কেন? কাল সারা দিন রাত তোমার খোঁজ করেছি: সকালের দিকে অবশ্য আমি নিজেও মজে গিয়েছিলাম।

আলেক্সি ওয়েটারকে ডেকে লেমনেড, ব্রাণ্ডি ও বরফ আনার অর্ডার দিয়েই এক লাফে সোফার পাশে গিয়ে পাশুতার কাঁধে এক চাপড় মেরে বলল, ওহে সুন্দরী তরুণী, এবার উঠে পড়!

কিন্তু সুন্দরী তরুণী তখনই চোখ খুলল না। খানিকটা বিড়বিড় করে বলল, জাহান্নামে যাও! আমাকে একা থাকতে দাও।

জাহান্নামে তোমাকেই পাঠাচ্ছি! মেজাজ দেখিয়ে বলল আলেক্সি। পরক্ষণেই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল আলেক্সি তারপর দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, যাও, কেটে পড়।

ওকে এভাবে তাড়িয়ে দিও না। পিওতর জড়িয়ে জড়িয়ে বলল।

আলেক্সি হেসে ভাইকে সান্ত্বনা দিল: ঘাবড়াবার কিছু নেই, ওকে ডাকলেই আবার আসবে।

'উচ্ছন্নে যাও' বলেই কিন্তু পাশুতা ব্লাউজের বোতাম লাগাতে থাকে।

আলেক্সি এবার ডাক্তারের মতো হুকুম দেয় ভাইকে, উঠে পড় পিওতর। জামাটা খুলে বরফ দিয়ে গা ঘষে নাও।

দোমড়ানো টুপিটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে পাশুতা আলুথালু মাথার ওপর চাপিয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করে, আহা রাণীর মতো দেখাচ্ছে।

আড়মোড়া ভেঙে সোফা ছেড়ে যেতে যেতে সে বলে, তাহলে বিদায় মিতা। আমাকে মনে রেখো কিন্তু। মনে আছে তো সিমানস্কির লজিং হাউস, রুম নম্বর তেরো।

মেয়েটির জন্যে পিওতরের মায়া হয়। ভাইকে সে বলে, ওকে কিছু দিয়ে দাও।

কত?

এই···পঞ্চাশ রুবল।

সে তো অনেক।

আলেক্সি মেয়েটির হাতে একটি নোট গুঁজে দিয়ে ঠেলে বার করে দেয় তারপর দরজায় খিল এঁটে দেয়।

তুমি বড় কিপটে। গতকাল টুপিটা কিনতেই এর চেয়ে বেশি ওর খরচ হয়েছিল।

পিওতর ঝগড়ার মেজাজ নিয়ে বলে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ছড়িখানার ওপর থুতনি রেখে বসে আলেক্সি। তারপর ওপরওলার মতো ভঙ্গিতে ভাইকে প্রশ্ন করে, এতদিন এখানে কি করছিলে?

উঠে বসে বরফ দিয়ে গা ঘষতে ঘষতে পিওতর মেজাজ দেখিয়ে বলে, মদ খাচ্ছিলাম।

মদ খাও ভালো কথা, মাথাটি খেও না।

তাতে তোমার কি?

আলেক্সি আরো কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে ভাইকে অনেকক্ষণ দেখে তারপর ফিসফিসিয়ে বলে, মনে পড়ছে না বুঝি একজন ব্যারিস্টারকে তুমি মেরেছ, আর একজন পুলিসকে ধাক্কা দিয়ে খানায় ফেলে দিয়েছ: তোমার নামে এইসব অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

আলেক্সি একের পর এক পিওতরের গর্হিত কাজের ফিরিস্তি দিতে থাকে। পিওতর মনে মনে বলে, সব মিথ্যে কথা, আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। মুখে বলল, কোন্ ব্যারিস্টারের কথা বলছ? সব বাজে কথা।

মোটেই বাজে কথা নয়। ওই যে কালো কোট পরা লোকটা। কী যেন নাম ভুলে যাচ্ছি।

পিওতর কিছুটা নরম হয়ে যায়। বলে, হ্যাঁ, মারপিট একটা হয়েছিল বটে।

আলেক্সি আবার প্রশ্ন করে, তা ছাড়া সম্ভ্রান্ত লোকদের গালিগালাজ করেছ কেন? এমন কি নিজের পরিবারের সকলকেই?

কে, আমি?

হ্যাঁ, তুমি। স্ত্রী, টিখন ও আমার সম্পর্কে গালিগালাজ করেছ তুমি। এ ছাড়া কোনো একটি ছেলের উল্লেখ করে বলেছ—আব্রাহাম, আইজ্যাক, ভেড়া। এ সবের মানে কি?

পিওতর এবারে খানিকটা ভয় পেল। চেয়ারে উঠে বসে সে বলল,

আমার কিছু মনে নেই। মাতাল হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

আলেক্সি ~~পিওতর~~ ফুঁসতে ফুঁসতে বলে, মোটেই তা নয়, এর পিছনে নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণ আছে। স্থিতধী মানুষ যে কথা মনের মধ্যে রেখে দিতে পারে মাতাল তা পারে না। ভাটিখানায় বসে কেউ পরিবারের কেচ্ছা করে? আমাদের ব্যবসার সুনামের ওপর এবং আমার সম্পর্কে কালি ছিটিয়েছ তুমি। স্নানঘরে যেভাবে মানুষ নগ্ন হয়ে যায় তুমি ঠিক সেইভাবেই সব আবরণ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ। আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে আমার বন্ধু লোকতিয়েভ এখানে ছিল। সে তোমাকে প্রচুর মদ খাইয়ে সম্পূর্ণ অচেতন করে রেখেছিল। সে-ই আমাকে টেলিগ্রাম করে সবকিছু জানায়। গোড়ার দিকে লোকেরা তোমার কথা শুনে হাসছিল পরে তারা তোমার প্রলাপের মানে বোঝার চেষ্টা করছিল।

পিওতর মিনমিনে স্বরে বলল, প্রলাপ তো সবাই বকছিল।

প্রত্যেকে একটি বিষয়েই প্রলাপ বকছিল আর তুমি যাবতীয় বিষয় নিয়েই বকছিলে। লোকতিয়েভ চালাকি করে সবাইকে অচেতন করে রেখেছিল তাই রক্ষে। হয়তো সবাই ভুলে যাবে সবকিছু কিন্তু তোমার মনে রাখা উচিত যে আমাদের ব্যবসাও রাজনীতির মতোই। আজ লোকতিয়েভ আমাদের বন্ধু, কে বলতে পারে আগামীকাল সে-ই আমাদের পরম শত্রু হয়ে উঠবে না?

দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে পিওতর একটি আরাম-কেদারায় শুয়ে ছিল। ঘরের বাইরে রাস্তায় তখন জনতার সম্মিলিত কোলাহলে ঘরের দেয়ালও যেন কাঁপছে থরথর করে। পিওতর একটিও কথা বলছে না, সে শুধু অপেক্ষা করে আছে, দেয়ালের কাঁপুনি প্রবলতর হলে তার মাথার ঝিমধরা ভাবটা কেটে যাবে, ভয়টাও কেটে যাবে। আলেক্সি যেসব কথা বলে গেল তার কিছুই সে মনে করতে পারছে না। তাছাড়া ভাইয়ের কথা বলার ভঙ্গিটাও তার কাছে অপমানকর মনে হচ্ছে। সে যেন বিচারক কিংবা বয়সে ও মান-মর্যাদায় তার চেয়ে বড়।

আলেক্সি উত্তেজিত ভাবে আবার প্রশ্ন করল, তোমার কি হয়েছিল বল তো? নিকিতার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ এই বলে তো বেরোলে।

হ্যাঁ, নিকিতার কাছেই তো প্রথমে যাই।

আমিও গিয়েছিলাম। টেলিগ্রাম করে উত্তর না পেয়ে তোমার খবর নিতে গিয়েছিলাম। আমরা সবাই খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। বোঝ না কেন যে পরিবেশে আমরা বাস করি সেখানে যে-কোনো সময়ে

যে-কেউ খুন হয়ে যেতে পারে।

পিওতর খানিকটা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, আমার মনের মধ্যে অনেক দুঃখ জমে উঠেছিল!

তাই বলে বাইরের লোকের কাছে তা প্রকাশ করে ফেলবে? আমাদের ব্যবসার ক্ষতি হয় তাও বোঝ না! কী স্বার্থত্যাগ করেছ তুমি ব্যবসার জন্যে?

পিওতর কপালের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দু হাতে দাড়ি শক্ত করে ধরে বলল, ইলিয়া…ইলিয়াই আমার সব গোলমাল করে দিয়েছে।

অন্ধকারে লোকে যেভাবে ফুটপাথ ধরে হাঁটে সেইভাবে খুব ধীরে পিওতর ইলিয়ার সঙ্গে তার ঝগড়ার বিবরণ ভাইকে সবিস্তারে বলে গেল।

আলেক্সি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ও, এই ব্যাপার। লোকটিয়েভ ভেবেছিল কোনো কেলেঙ্কারির ব্যাপার। তাহলে ইলিয়াকে কটাক্ষ করেই… আমি ভুল বুঝেছিলাম, আমায় ক্ষমা করো। তবে সচেতন থেকো ভবিষ্যতে যেন এ-জাতীয় ঘটনা না ঘটে। আমরা ব্যবসায়ী, যে কোনো সংকটে উপযুক্ত মানসিকতা নিয়ে যেন দাঁড়াতে পারি সেইভাবেই আমাদের তৈরি থাকতে হবে।

আলেক্সি আবেগের বশে বক্তৃতার ঢঙে কথা বলে যাচ্ছিল। আমাদের মতো শিল্পপতিদের ছেলেদের হওয়া উচিত ইঞ্জিনিয়ার, বড় আমলা কিংবা আর্মি অফিসার।

বাইরে তখন পাঁচমেশালী চিৎকার কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে। পিওতর এক হাত দিয়ে কান চেপে ধরে অন্য হাতে ব্রাণ্ডির বোতল থেকে গেলাসে ঢালতে যাচ্ছিল। আলেক্সি এগিয়ে এসে হাত চেপে ধরে বলল, আর খেও না, আবার মাতাল হয়ে যাবে।

আলেক্সিকে আজ কথায় পেয়েছে। সে আবার বলতে শুরু করল, আমার মীরনের কথাই ধর। ও ইঞ্জিনীয়ার হতে চায়, বিদেশে যেতে চায়। কিন্তু আমাদের ঘরের ছেলেদের ঘরেই থাকা উচিত, বিদেশে নয়। আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের শ্রেণীর মানুষেরাই সমাজের মূল শক্তি।

নতুন করে কিছু বোঝার মানসিকতা আজ পিওতরের নেই। সে নিজের দুর্দশার কথাই চিন্তা করছিল।

এই লোকটি তার চেয়েও ধনী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদেরও সম্ভ্রম ও বন্ধুত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমার আর এক ভাই মঠে আত্মগোপন করে আছে। সাধু ব্যক্তি হিসেবে লোকের শ্রদ্ধা অর্জন করছে, খ্যাতিও হচ্ছে

তার। আর আমি? সকলের ঘৃণা কুড়িয়ে ভাগ্যের হাতে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছি। কিন্তু কেন?

ইতিমধ্যে আলেক্সির কণ্ঠস্বর অনেক নমনীয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সে ভাইকে বুঝিয়ে বলতে থাকে, তুমি আবিলতায় ডুবে ছিলে বলে সম্ভ্রান্ত লোকদের অপমান করেছ একথা ভাববার কোনো কারণ নেই। অতিরিক্ত প্রাণশক্তিরই প্রকাশ এসব। ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে যে প্রবল প্রাণশক্তি-জনিত উচ্ছ্বাস দেখতে পাই বৃদ্ধদের মধ্যেও তার প্রকাশ কখনো কখনো দেখা যায়। তাছাড়া আমাদের ঘরের মেয়েমানুষগুলোও তো একেবারে রসকষহীন জোলো। আমি অবশ্য ওর্লোভার কথা বলছি না। একরকম বোকা-বুদ্ধিমান মানুষ থাকে যারা কোথাও কোনো খারাপ দেখতে পায় না ও হচ্ছে সেই প্রকৃতির মেয়ে। ওকে তুমি দুঃখ দিতেই পারবে না কারণ ও বিশ্বাসই করে না খারাপ কাজ কেউ করতে পারে। মন্দে ওর কোনো বিশ্বাসই নেই। নাতালিয়া সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না। ওকে 'গৃহস্থালীর যন্ত্র' বলে তুমি উল্লেখ করেছিলে। ঠিকই বলেছিলে।

পিওতর অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, আমি কি তাই বলেছি নাকি?

লোকতিয়েভ নিশ্চয়ই বানিয়ে বলেনি।

পিওতরের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল আর কি কি সে করেছে কিংবা বলেছে। কিন্তু তাতে হয়তো ও যা ভুলে গিয়েছে তা মনে পড়ে যাবে। ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে তার প্রবৃত্তিও তেমন হচ্ছে না। ধীরে ধীরে ভাইয়ের প্রতি তার মনে ঘৃণা ও শত্রুভাব অনুভূতি জেগে উঠছে। দিনে দিনে ও আরো ধূর্ত হচ্ছে, শয়তান কোথাকার!

আলেক্সির মধ্যে একটা অতিরিক্ত তৎপরতা, শৃগালসুলভ প্রতারণার মানসিকতার গন্ধ পায় সে। বাজপাখির মতো চোখ, ঠোঁটের পিছনে সোনার দাঁত, সৈন্যদের মতো পাকানো গোঁফ দাড়ি সব কিছুই পিওতরের বিরক্তি ধরায়। বিশেষ করে ওই ইস্পাত রঙের জ্যাকেট পরা আলেক্সিকে দেখাচ্ছে একটা ঠগ অ্যাটর্নির মতো। আলেক্সি এখান থেকে চলে যাক এই ইচ্ছাটা তার মনে হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠল। চোখ বুজে সে বলল, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।

সে তো খুব ভালো কথা। তবে আজ আর অন্য কোথাও বেরিও না।

আলেক্সি চলে গেলে পিওতর স্বগতোক্তি করল, আমি যেন ছেলেমানুষ সেই ভাবে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। হাত মুখ ধোওয়ার জন্যে সে বেসিনের

একজন লোক বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে। শোচনীয় তার কাপড়চোপড়ের অবস্থা, মুখ তুবড়ে গেছে, চোখ বসে গেছে। লোকটি যে আয়নায় তারই প্রতিফলন এটা বুঝতে বেশ কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। ক্লান্ত হাসি হেসে আবার পিওতর বরফ দিয়ে ঘাড়, বুক আর মুখ ঘষতে থাকে।

'একটা গাড়ি ডেকে শহর থেকে ঘুরে আসি' মনস্থ করেই জামাকাপড় পাল্টাতে যায়। কিন্তু জ্যাকেটটা অর্ধেক পরেই খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই বোতাম টিপে ওয়েটারকে ডাকে।

চা নিয়ে এস তো বেশ কড়া চা আর কিছু নোনতা খাবার। ব্রাণ্ডিও আনবে।

ওয়েটারকে অর্ডার দিয়ে সে জানলার পাশে এসে দাঁড়ায়। রাস্তার বড় বড় দোকানগুলো ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফুটপাথের অন্ধকারে লোক-জনকে গুটিগুটি হাঁটতে দেখা যায়। অন্য দিকে রঙ্গমঞ্চের প্রবেশপথে একটা আলোর দ্যুতি, আর কাছাকাছি কোথাও মেয়েরা গান করছে।

প্রজাপতিরা! মৃদু হেসে স্বগতোক্তি করে পিওতর।

ঘরটা পরিষ্কার করতে পারি,—কে একজন তার পিছন থেকে বলে উঠল। ঘাড় ফেরাতেই পিওতর দেখে ঝাঁটা হাতে এক বুড়ি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি দালানে বেরিয়ে আসতেই কালো চশমা, কালো টুপি পরা একটি লোকের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগল। লোকটা কাকে যেন বলছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওতেই হবে।

সব কিছুই উল্টো বইছে। একটার পর একটা অপ্রিয় ঘটনা তাকে ভাবতে বাধা করছে যে, যা সে শুনছে তার পিছনে কোনো গোপন অর্থ লুকিয়ে আছে। এর পর যখন একটা টেবিলের সামনে এসে বসেছিল তখন কেৎলির শিসের শব্দ, মাথার ওপর আলোর চিমনিও যেন কার অদৃশ্য হাতের স্পর্শে টুংটাং শব্দ করে চলেছে। ভাইয়ের মুরুব্বীর মতো কথাবার্তার কিছু টুকরো কানে ভেসে আসছে, চোখের সামনে ভেসে উঠছে ঝকঝকে তুটি চোখ। কোনো কিছুই স্পষ্ট করে তার মাথায় ঢুকছে না। বিশাল এক শূন্যতা যেন তাকে পেয়ে বসেছে। মাঝে মাঝে সেই শূন্যতা ভেদ করে একটি কম্পিত আলোর রেখা দেখা দিচ্ছে, সেই আলোর রেখায় অসংখ্য মানুষ নাচছে, ঘুরপাক খাচ্ছে। অসংখ্য ধূলিকণার মতো এইসব মূর্তি ও দৃশ্যগুলি কোনো জরুরী বিষয়ে মনোনিবেশ করায় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

গরম কড়া চা আর মদ্যপানে তার জিভ পুড়ে যায় কিন্তু নেশা হয় না। কি রকম যেন একটা অস্থিরতায় ছটফট করে সে। অন্য কোথাও চলে যেতে

ইচ্ছে করে। পিওতর ঘণ্টা বাজায়। অদ্ভুতদর্শন একটি মানুষ এসে হাজির হয়। তার না আছে মুখ, না আছে চুল। তাকে দেখে হাড়ের গোল মাথাওলা বেড়াবার ছড়ির কথাই মনে পড়ে যায়।

ওহে ভান্কা, কিছুটা সবুজ মদ নিয়ে এস তো। সবুজ। কি বলছি বুঝতে পারছো তো?

পারছি স্যার। আপনি চারট্রিউজের কথা বলছেন।

তোমার নাম ভান্কা নাকি?

না স্যার, আমার নাম কন্সটানটিন।

আচ্ছা বেশ, তাড়াতাড়ি নিয়ে এস। তুমি কি সৈনিক নাকি?

না স্যার।

তোমার কথাবার্তা, চালচলন তো সৈনিকের মতোই।

কাজের ধরনটা একই রকম কি না। হুকুম মেনে চলা।

একটু ভেবে নিয়ে পিওতর লোকটিকে একটি রুবল ও কিছু উপদেশ দিল।

না, সব সময় হুকুম মেনে চলবে না।

মদটা চটচটে আর ঝাঁজটা অ্যামোনিয়ার মতো উগ্র। মাথার মধ্যে যখন মদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে তখন বাইরের কোলাহল শান্ত হয়ে এসেছে। সামান্য গোলমালের শব্দ তাও দূরে ভেসে যাচ্ছে, পিছনে রেখে যাচ্ছে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। মাথাটা বেশ হালকা ও পরিষ্কার হয়ে গেলে নতুন এক চিন্তায় তাকে পেয়ে বসল।

হুকুম মেনে চলা উচিত নাকি? যদি মানতেই হয় তবে কার হুকুম? আমি তো মনিব, ওয়েটার তো নই। আমি একজন মনিব কি না?

কিন্তু এই চিন্তাধারা হঠাৎ বাধা পায় এবং ভয়ে রূপান্তরিত হয়। হঠাৎই সে দেখতে পায় তার সামনে একটি লোক দাঁড়িয়ে। এই লোকটিই তাকে আলেক্সি কিংবা অন্য কারো মতো সহজ জীবনের পথে এগুতে দিচ্ছে না। লোকটির মুখখানা বেশ বড়, দাড়িও আছে, ঠিক তার বিপরীত দিকে বসে আছে। তালুর ওপর থুতনি রেখে করুণ মুখ করে তারই দিকে তাকিয়ে আছে লোকটি, যেন সে তাকে বিদায় জানাচ্ছে। তার তাকানোর ভাবখানা যেন এই, কখনো ভর্ৎসনা, কখনো সহানুভূতি। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে কেঁদে ফেলল। চোখের জল গড়িয়ে পড়ল তার চোখের লালচে পাতার নিচ থেকে। একটা বড় মাছি তার দাড়ির প্রান্ত বেয়ে বাঁ চোখের কাছে উঠে আসে। যেন মৃত মানুষের মুখ সেইভাবে মাছিটা তার কপালের ওপর উঠে ভুরুর ওপর থেকে চোখের মধ্যে উঁকি দিতে থাকে।

এই ইতর, কে তুই ? পিওতর শত্রুকে প্রশ্ন করে। কিন্তু শত্রু কোনো উত্তর দেয় না শুধু তার ঠোঁট দুটি সামান্য কেঁপে ওঠে।

আমাকে ঝামেলার মধ্যে ফেলে দিয়ে কাঁদা হচ্ছে এখন ? কেন, আমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে বুঝি ? পিওতর খুশি-খুশি ভাবে প্রশ্ন করে। পাশ থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে সে লোকটার টাক মাথা লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে মারে। ঝন্‌ঝন্ করে আয়নার কাঁচটা ভেঙে যায়, টেবিল থেকে চায়ের বাসনপত্রও মেঝেতে পড়ে রাত্রির নৈঃশব্দ খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে। কয়েকজন লোক ছুটে আসে।

কিছুক্ষণ পরে পিওতর কার যেন ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, এখন গভীর রাত, সবাই ঘুমোচ্ছে···আয়নার কাঁচটা ভেঙে গেল···এ কী ধরনের আচরণ ?

পিওতর বিড়বিড় করে বলে, ওই মাছিটাই তো···।

পরের দিন বিকেলে আলেক্সি এসে এমন উদ্বেগ নিয়ে তাকে দেখতে থাকে যেমন করে ডাক্তার তার রোগীকে দেখে কিংবা সহিস যেমন করে তার ঘোড়াকে দেখে। ভাইকে অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে গোঁফে একটা মোচড় দিয়ে সে বলে, চেহারাখানা কি বানিয়েছ খেয়াল আছে ? এইভাবে বাড়ি ফেরা যায় না। তাছাড়া এখানেই তোমাকে আমার একটা কাজে লাগবে। দাড়িটা কাটা দরকার আর একজোড়া জুতো কেনা দরকার। তোমার জুতোর যা অবস্থা হয়েছে, ও জুতো গাড়োয়ানদের পায়েতেই মানায় ভালো।

দাঁতে দাঁত চেপে নিরীহ ছেলের মতো সে ভাইয়ের পিছনে পিছনে সেলুনে গিয়ে উঠল। ভাইয়ের নির্দেশমতো নাপিত তার চুল দাড়ি কেটে দিল। তারপর তারা গেল জুতোর দোকানে। সেখানেও আলেক্সির পছন্দ-মতো জুতো কেনা হলো। সাজগোজ সমাধা হলে পিওতরের দৃষ্টি আয়নাতে পড়তেই মনে হলো তাকে দেখাচ্ছে ঠিক দোকানদারের মতো। তবু আলেক্সি ঠিক কাজই করছে এটা সে বুঝতে পেরেছে তাই আপত্তি করে না। তাছাড়া নোংরা গ্লানিকর জীবনটাকে ঝেড়ে ফেলার সময়ও হয়েছে এখন।

অবসাদ ও ক্লান্তি এখনো পিওতরের মস্তিষ্ককে কুয়াশার মতো আচ্ছন্ন করে রেখেছে তবু সেই ক্লান্ত শরীর-মন নিয়ে সে ভাইকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে থাকে। ভাইয়ের প্রতি তার একটা মিশ্র অনুভূতি জাগে—কিছুটা শ্রদ্ধা, কিছুটা ঈর্ষা, ঘৃণা ও শত্রুতা। ওর চোখের শ্যেন দৃষ্টি, হাতের ছড়ি, জুয়াড়ী মনোবৃত্তি পিওতরের মনে অজানা এক আশঙ্কা জাগায়। মেলার সবচাইতে ভালো রেস্তোরাঁর নিভৃত কামরায় বসে দেশের বড় বড়

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পানভোজন করতে করতে পিওত্‌র লক্ষ্য করে আলেক্সি ভাঁড়ামি করে সবাইকে তুষ্ট করার চেষ্টা করছে। ধনী ব্যক্তিরা কিন্তু ভাঁড়ামিটুকু লক্ষ্য করছে না, তারা বরং শ্রদ্ধার সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনে যাচ্ছে।

কাপড়ের কলের মালিক কোমোলোভ আঙুল তুলে ভয় দেখাতে গিয়েও নরম সুরেই বলে, আলেক্সি, তুমি একটি ধূর্ত শিয়াল আমার মতো লোককেও তুমি কাবু করে ফেলেছ।

আলেক্সি হাসতে হাসতে বলে এর নাম তো প্রতিযোগিতা, ঠিক কি না?

কোমোলোভ বলে, তা ঠিক। চোখ খোলা রাখো আর সময়মতো তুরুপের তাসটি ফেলো।

আমি তো এটাই শেখার চেষ্টা করছি।

কোমোলোভ স্বীকার করে এতে দোষের কিছু নেই।

আলেক্সি কাঁটা-চামচটা নাড়াতে নাড়াতে আরো উদ্দীপনার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

তাহলে আপনাদের একটা গল্প শোনাই গল্পটা শুনিয়েছিল আমার ছেলে মীরন। ও তো ইঞ্জিনিয়ার হতে চলেছে জানেন বোধহয়। যাই হোক গল্পটা বলি। সিরাকিউজের এক বিখ্যাত দার্শনিক একবার রাজাকে বলেছিলেন, 'আমাকে একটা কিছুর ওপর দাঁড়াতে দিন, আপনার পছন্দমাফিক আমি পৃথিবীটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি।'

গল্প শুনে সোল্লাসে সবাই আলেক্সিকে বাহবা দিল।

'পৃথিবীটাকে ঘুরিয়ে দেবো'—বলেছিল সে। ভদ্রমহোদয়গণ, তলিয়ে ভেবে দেখুন। হ্যাঁ, আমাদের শ্রেণীর মানুষদেরও একটা কিছুর ওপর দাঁড়াতে হবে। সেটি আর কিছু নয়—কেবল। পৃথিবীটাকে ঘোরাবার জন্যে আমাদের কোনো জ্ঞানীগুণীর প্রয়োজন নেই। আমরা নিজেরাই তা করে নিতে পারি। আমাদের এখন একটি জিনিসেরই প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজন অন্য জাতের সরকারী আমলা। জমিদার শ্রেণী এখন পতনের মুখে, ওরা আর এখন আমাদের পথের কাঁটা নয় সরকারী আমলাদের মধ্যে বেশির ভাগই থাকা চাই আমাদের শ্রেণীর নিজস্ব লোক। সহজ করে বলি, এমন লোক আমাদের দরকার যারা ব্যবসায়ীদের স্বার্থ বুঝবে।

সাদা মাথা, টাক মাথা, ভুঁড়িওলা সবাই সমস্বরে বলে ওঠে, ঠিক কথা, ঠিক কথা। একেবারে খাঁটি কথা বলেছে আমাদের আলেক্সি।

হাড়-জিরজিরে বুড়ো লোসেব খোঁচা দিয়ে বলল, আমাদের আলেক্সির ছোট্ট মাথাটি ইঁদুরের বুদ্ধিতে ভরা। কোথায় মাংস আছে ও ঠিক টের পায় আর খুবলে খুবলে বার করে আনে। যেখানে প্রায় কিছুই নেই সেখান থেকেও কিছু না কিছু ও বের করে আনবেই। আসুন আমরা সবাই ওর স্বাস্থ্য পান করি।

সবাই গেলাস উঁচু করে ধরে আর আলেক্সি সকলের গেলাসের সঙ্গেই নিজের গেলাস ঠেকিয়ে আসে। লোসেব তার শিশুর মতো সরু হাতখানি দিয়ে কোমোলোভের চওড়া ঘাড় জড়িয়ে ধরে বলে, আমাদের মধ্যে কিছু বুদ্ধিমান লোক জেগে উঠছে।

কোমোলোভ গর্বের সঙ্গে উত্তর দেয়, সব সময়েই এটা হয়েছে। আমার বাবা স্টিভেডর হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন, তারপর···।

লোসেব বলে, তোমার বাবা তো শুনেছি এক ধনী আর্মেনিয়ানের গলা কেটে কাজ গুছিয়ে নেয়।

কী সব বাজে বকবকানি হচ্ছে! কোমোলোভ বিরক্ত হয়ে বলে। লোকের এই দোষ। নীরেট মাথা সব। কোনো লোক শীর্ষে উঠলেই তারা ধরে নেয় লোকটা পাজি। তোমার সম্পর্কেও কিছু খারাপ কথা শোনা যায়।

লোসেব দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, তা ঠিক, গুজব হচ্ছে ঠিক মাছির মতো।

পিওতর এদের কথাবার্তা সবই শুনছে আর বিরক্ত হচ্ছে। তার মনে হচ্ছে সে ঠিক এদের জাতের নয়। এরা সবাই একদিন ছিল চাষা, এখন এদের রক্তেও এসেছে দস্যু জমিদারের রক্তের চমকানি। দস্যুবৃত্তির দিক থেকে এদের সকলের মধ্যেই একটা মিল আছে, আবার জীবনকে উপভোগ করার রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিরও মিল। তার বাবাও ছিলেন এদের মতোই। এরা টাকা জমায় দুর্বার গতিতে শোষণ আর শাসনের পথে, তারপর টাকা ওড়ায় খোলামকুচির মতো। আবার নিজেদের মধ্যে এদের রেষারেষিও কম নয়।

পিওতর আলেক্সিকে যতই অপছন্দ করুক তবু আজ তার মনে হচ্ছে তার ভাই এদের তুলনায় অনেক কূটবুদ্ধিসম্পন্ন আর সেই কারণেই আরো বিপজ্জনক।

আলেক্সি আবার উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা ভেবে দেখুন। আমাদের অফুরন্ত শক্তির উৎস কোথায়! লাখো লাখো কৃষকরাই আমাদের শ্রমশক্তি, এরা আমাদের উৎপাদনে সাহায্য করে আবার এরাই আমাদের জিনিস কেনে। আর কোথায় এদের মতো

মানুষ এত বেশি সংখ্যায় পাওয়া যাবে? সুতরাং বিদেশের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের।

মাতালরা সমস্বরে সায় দিয়ে বলে, ঠিক কথা

আলেক্সি আরো অনেক কথা বলে যায়। যেমন আমদানীর ওপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করা উচিত, জমিদারের কাছ থেকে সব জমি কিনে নেওয়া, জমিদারের দখলে ব্যাঙ্ক থাকায় ব্যবসাদারদের ক্ষতি ইত্যাদি ইত্যাদি। সে যেন সবই জানে। পিওতরের খুব আশ্চর্য লাগে যখন দেখে সবাই তাকে সমর্থন করছে। ঈর্ষান্বিত হয়ে সে ভাবতে থাকে, নাকতো ঠিকই বলেছিল। আলেক্সি বাঁচতে জানে।

স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া সত্ত্বেও আলেক্সি লাম্পট্যের জীবন যাপন করে। পিওতর জানে আলেক্সির একজন স্থায়ী রক্ষিতা আছে মস্কোতে। মস্কোতে সেই মহিলা একটি মেয়েদের গানের দল চালায়। বিশাল বপু হলেও কণ্ঠস্বর তার মধুর, চোখের দৃষ্টিও দীপ্ত। তার বয়স নাকি চল্লিশ কিন্তু তার ত্বকের মসৃণতা ও রক্তিম আভা দেখে ত্রিরিশের বেশি মনে হয় না। শেয়ালের মতো তীক্ষ্ণ দাঁত বের করে সে আলেক্সিকে আদর করে ডাকে, আলেওসিন্দা, আমার বাজপাখি! মা যেমন করে ছেলেকে আদর করে সেইভাবেই সে আলেক্সিকে জড়িয়ে ধরে। তার দলের মেয়েদের ওপরেও আলেক্সির নজর আছে এসব জানা সত্ত্বেও মহিলার সঙ্গে আলেক্সির সম্পর্ক একটুকু ভাঙেন ধরেনি। পিওতর আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছে আলেক্সি অনেক বিষয়েই এই মহিলার পরামর্শ চায়। এদের দেখে বাবার সঙ্গে উলিয়ানা বাইমাকোভের সম্পর্কের কথাই পিওতরের মনে পড়ে যায়।

আলেক্সিকে যতই দেখে ততই তার মনে হয় ও একটা আস্ত শয়তান। আলেক্সির বজ্জাতিগুলোর মধ্যে আশ্চর্য এক অভিনবত্ব আছে। মেয়ার নামে এক জার্মান সার্কাসে একটি শুয়োরের খেলা দেখিয়েছিল। শুয়োরটাকে সাজানো হয়েছিল কারখানার মালিকের মতো। সবাই খুব মজা উপভোগ করেছিল এমনকি ব্যবসায়ীরাও হেসেছিল। কিন্তু আলেক্সি ব্যাপারটাকে ভালো মনে নিতে পারেনি। সে চটে গিয়ে ঠিক করল শুয়োরটাকে শেষ করতে হবে। কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে সে পালককে ঘুষ খাইয়ে শুয়োরটাকে চুরি করে আনে তারপর বারবাটিরেস্কো হোটেলের পাচককে দিয়ে রান্না করিয়ে সেই শুয়োরের মাংস শিল্পপতিদের খাইয়েছিল। পিওতর শুনেছিল ক্লাউন মেয়ার নাকি শোকে পরে আত্মহত্যা করেছিল।

পিওতর মনে মনে ভাবে, ও একটা প্রতারক। ওর কোনো বিবেক নেই।

কিছু বোঝার আগেই ও একদিন আমাকে পথে বসাবে। হয়তো শত্রুতা বশে নয়, নেহাৎই খেয়ালের বশে ধ্বংস করে ছাড়বে আমায়।

বিপদের আশঙ্কার গন্ধ পেয়েই সে মনের স্থৈর্য ফিরিয়ে আনল। আবার নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে স্থির সংকল্প নিল। পিওতর একাই বাড়ি ফিরে আসে। আলেক্সি চলে যায় মস্কোতে। তখন সেপ্টেম্বর মাস, আবহাওয়া ভিজে, বাতাসে সাগুর আমেজ। ধূসর মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে ঠিক পিওতরের মাথার ভিতরটা যেমন। অন্তরঙ্গ একজনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে ফিরে আসছে এমনই মনে হল পিওতরের। মৃত ব্যক্তির জন্যে তার দুঃখ হচ্ছে ঠিকই আবার স্বস্তিও পাচ্ছে এই ভেবে যে লোকটির সঙ্গে তার আর দেখা হবে না। স্বস্তির আরো কারণ হচ্ছে কেউ আর উদ্ভট দাবী নিয়ে তার কাছে আসবে না, তিরস্কার করবে না। এক কথায় সুস্থ জীবন যাপন করায় আর কেউ বাধা দিতে আসবে না।

যার যা কাজ সে শুধু তাই করে যাবে, ব্যাস আর কিছু নয়। কাজের মধ্যেই সবাই বেঁচে আছে, আর কি! পিওতর এইভাবে মনকে সান্ত্বনা দেয়।

সমস্ত শক্তি নিয়ে সে আবার কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শেষ গ্রীষ্মের উজ্জ্বল দিনগুলো তার শান্তিতেই কাটল।

মুক্তোর মতো স্বচ্ছ শরতের সকালে ঘুম ভাঙার পর সে শুনতে পায় কারখানার বাঁশির একটানা সুর। আধঘন্টা পরে শুরু হয়ে যায় সেই ক্লান্তিকর ফিসফাস গুনগুন শব্দ, একঘেয়ে শ্রমের অবিশ্রান্ত শব্দ। শনের জট খুলতে খুলতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গুদাম ঘরের কাছে শ্রমিকদের চিৎকার কানে তালা ধরিয়ে দেয়। অসংখ্য মোরোজোভদের মধ্যে কে একজন সরাইখানা খুলেছে। সেখান থেকে তীক্ষ্ণ বাজনার সঙ্গে মত্ত গান ভেসে আসে বাতাসে। উঠোনে যন্ত্রের মতো নিখুঁত গতিতে ঘুরছে টিখন। কখনো হাতে কোদাল নয়তো কুড়ুল। নিকিতা চলে যাবার পর তার কাজ টিখন নিজের হাতে তুলে নিয়েছে অর্থাৎ প্রধানতঃ বাগান পরিচর্যার কাজ। যন্ত্রের মতো নিখুঁত তার কাজ। আগের মতোই অন্যদের প্রতি ব্যবহারেও সে রুক্ষ। সেরাফিমও পরিচ্ছন্ন নীল পোশাকে কখনো দেখা দেয় কখনো অদৃশ্য হয়ে যায়। অন্যদিকে সংসারের ক্ষেত্রে নাতালিয়াও যন্ত্রের মতো কাজ করে যাচ্ছে, কারো সেবাযত্নে এতটুকু ত্রুটি নেই। মেলা থেকে স্বামী নানাবিধ উপহার এনে দেওয়ায় তার মন মেজাজও এখন খুব ভালো। তার খুশির আর একটি কারণ হচ্ছে স্বামীর শান্ত আচরণ। সব কিছুই স্বচ্ছন্দ গতিতে

চলেছে, মনে হয় আবহমানকালই এমনি ভালোর দিকে সব চলবে। ভাসমান মেঘের মতো মাসগুলো বেশ তাড়াতাড়ি কেটে যাচ্ছে। এইভাবেই বছরের পর বছর কেটে গেল।

পিওত্রের চেহারা এখন ঘাড়েগর্দানে যা হয়েছে তাতে যখন সে মাথা নিচু করে কারখানা ভবন কিংবা চত্বরে ঘুরে বেড়ায় তখন তাকে ষাঁড়ের মতোই দেখায়। ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে দেখে ভয়ই পায়। পিওত্রের আজকাল এক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হয়েছে তা হলো এই বিরাট ব্যবসায়ে তার উপস্থিতির আর কোনো মূল্য নেই। তার স্থান যেন এখন নিছক দর্শকের ভূমিকায়। আশার কথা এই যে ইয়াকভ ব্যবসা বুঝে নিতে শুরু করেছে এবং এ ব্যাপারে তার আগ্রহও লক্ষণীয়। ইয়াকভের আচরণ পিওত্রের মনে ইলিয়ার অভাববোধ অনেকখানি পূরণ করে দিয়েছে

হ্যাঁ, তুমি পড়াশোনা নিয়েই থাকো। তোমাকে ছাড়াই আমার চলবে। এই ভাবেই পিওত্র অনেক সময় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে।

ইয়াকভ দেখতে হয়েছে মোটাসোটা গোলগাল মেয়েদের মতো গালে গোলাপী আভা। চোখ দুটি সুন্দর, যখন হাসে তখন সাবানের ফেনার মতো নানা রঙের ছটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কাছ থেকে তাকে দেখায় পায়রার মতো কিন্তু দূর থেকে মনে হয় একজন ঝানু মিল মালিক। নারী শ্রমিকেরা তার দিকে সরস ভঙ্গিতে তাকায়, সেও চোখের তারা নাচিয়ে তাদের জবাব দেয়। মোদ্দা কথা যৌবনসুলভ উত্তেজনা ও চাপল্য দমনে যে সে অসমর্থ তা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হয় না। পিওত্র কান টানতে টানতে মুচকি হেসে মনে মনে বলে, বোকা ছেলে, পলা মিনোত্তিকে দেখলে তুই কি করতিস?

কাকার বাড়িতে মীরন আর তার বাক্যবাগীশ বন্ধু গোরিংসভিয়েতভের অফুরান তর্ক-বিতর্কে ইয়াকভ যে অংশ নেয় না এতে পিওত্র বেশ খুশি। ঝানু ব্যবসাদারের ছেলের মতোই মীরন গড়ে উঠেছে। লম্বা নাক তাতে চশমা, গিল্টিকরা বোতামওলা জ্যাকেট, সব মিলিয়ে তাকে দেখে মনে হয় একজন জাস্টিস অফ্ পীস। তার টান-টান হয়ে বসা কিংবা হাঁটা এবং কথা বলার উগ্র ভঙ্গি দেখে আবার একজন সৈনিকের সঙ্গেই তুলনা করতে মন চায়। ওর সব কথার মধ্যেই একটা অতিরিক্ত চালাকির ভাব থাকে। পিওত্র মোটেই ভাইপোটিকে সহ্য করতে পারছে না।

জ্যাকেটের পকেটে একটি হাত ঢুকিয়ে, অন্য হাতটি সামনের দিকে বাড়িয়ে সে ব্যঙ্গ করে বলতে থাকে, বন্ধু, এর নাম দেওয়া যায় ফিলোসফি।

ফিলসফিকে বিকৃত করে সে বলে ফুলোসফি। তারপর ব্যাখ্যা করে বলে, অজ্ঞতা আর মূর্খামির ফলশ্রুতি এইসব দর্শন।

মীরনের চাইতে তবু ওর ওই বেরসিক বন্ধুর কথার মধ্যেই পিওতর কিছু মানে খুঁজে পায়। হাত নাড়াতে নাড়াতে কণ্ঠস্বর উচ্চতম গ্রামে পৌঁছে দিয়ে সে চিৎকার করে বলতে থাকে, তোমার যুক্তি তো সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কারখানার বাঁশির শব্দ আর যন্ত্রের একঘেয়ে ঘরঘর শব্দ পর্যন্ত গিয়েই থেমে যায় কিন্তু মানুষ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি?

মীরন বলে, এই জন্যেই তো তোমার যুক্তিকে আমি বলি ফুলোসফি, সেকালের দর্শন। জীবনটা হচ্ছে একটা সংগ্রাম, এখানে কবিতা কিংবা ভাবালুতার কোনো স্থান নেই।'

অন্য সকলের আলোচনার মাঝে এদের কথাবার্তা এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়ায় যে কারোর সঙ্গে মেলে না। যেন এক ঝাঁক নীল পায়রার মাঝে দুটি সাদা পায়রা। পিওতর মনে মনে বলে, হ্যাঁ, ওরা হচ্ছে নতুন পাখি সুতরাং ওরা তো নতুন গান গাইবেই। তবে ইয়াকভের ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি দেখে সে খুশিই হয়। ইলিয়া এখানে থাকলে কি বলতো কে জানে। সে নিজে ওই দুই বন্ধুর তর্ক-বিতর্কের মূল বিষয় ভাসা ভাসা মাত্র বুঝতে পারে।

বিশ্বকে এবং মানুষকে তোমরা লোহার খাঁচায় বন্দী করে রেখেছ। মনুষ্যত্বকে করেছ যন্ত্রের দাস,—গোরিৎসভিয়েৎভ চিৎকার করে বলে।

মীরন জবাব দেয়, যেসব মানুষদের দাসত্বের জন্যে তোমার এত মাথা-ব্যথা তারা আসলে অলস। শিল্পের প্রসারের সঙ্গেই ওদের ভালোমন্দ জড়িত এই সহজ সত্যটি ওরা যদি না বোঝে তাহলে ওদের ধ্বংস অনিবার্য।

পিওতর বুঝতে পারে না এদের দুজনের মধ্যে কার মতবাদ ঠিক। তবে একথা ঠিক ভাইপোর চেয়েও এই ছেলেটিকে সে বেশি অপছন্দ করে। বাঙালদের মতো ওর আচরণ অশালীন। খাবার টেবিলে ও সব সময়েই গৃহকর্তার পাশে গিয়ে বসবে, কাঁটা চামচ নিয়ে ঠুং ঠাং শব্দ করবে। বয়স্কদের সঙ্গে তার ব্যবহারে সৌজন্যের অভাবও প্রকট হয়ে ওঠে। পিওতর আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে আলেক্সি এই দুই ছাত্রের তর্ক-বিতর্কের সময়ে নীরব থাকে। কদাচিৎ যখন কথা বলে তখন ছেলের পক্ষই সমর্থন করে।

'শক্তি যেখানে ক্ষমতাও সেখানেই, বলা বাহুল্য ইণ্ডাস্ট্রীতেই যখন শক্তি...।

বাড়ি ফেরার পথে পিওতর ইয়াকভকে প্রশ্ন করে ওই দুজনের

আলোচনার মর্ম সে বুঝেছে কি না। ইয়াকভ সংক্ষেপে উত্তর দেয়, হ্যাঁ, সে বুঝেছে।

পিওতর নিজে যে কিছু বোঝেনি সে কথা গোপন করে ছেলের কাছ থেকেই জেনে নিতে চায়।

কি বুঝেছ বল?

ইয়াকভের বক্তব্য থেকে বোঝা গেল যে মীরনের মতে গোটা ইউরোপ যে পথ অবলম্বন করছে রাশিয়াকেও সেই পথ অবলম্বন করতে হবে। অন্য দিকে গোরিৎসভিয়েতভ মনে করে রাশিয়ার উচিত তার নিজস্ব স্বতন্ত্র পথে চলা।

কিন্তু ইয়াকভ হঠাৎ এমন একটি মন্তব্য করে বসল যে আলোচনা আর এগোল না।

সুখে থাকার জন্যে মেধার অত কসরৎ না করলেও চলে।

কিছুদিন ধরেই পিওতর অনুভব করছে এক ধরনের আকস্মিক বাধা ও প্রত্যাখ্যান যা তাকে ঠেলতে ঠেলতে অনেক দূরে সরিয়ে দিচ্ছে; নিছক দর্শক হিসেবেই সে শুধু দেখছে আর ভাবছে। তার কোনো সক্রিয় ভূমিকাই নেই। অবোধ্য কিন্তু দ্রুত এক রূপান্তরের পর্ব চলেছে তার চারদিকে; কাজে ও কথায় অশান্ত মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

ওর্লোভা একদিন বলছিল, মন পরিপূর্ণ থাকলেই সত্যকে পাওয়া যায় কারণ তখন আর কিছু চাইবার থাকে না। 'ঠিক কথা'— পিওতর বলল।

কিন্তু মীরন মায়ের দিকে তাকিয়ে উদ্ধত ভাবে বলে উঠল, যত সব বাজে কথা। তুমি যাকে সত্য বলছ তা আসলে মৃত্যু। একমাত্র কাজের মধ্যেই, সচলতার মধ্যেই সত্যকে পাওয়া যায়।

মীরন চলে গেলে পিওতর ওর্লোভাকে বলল, মীরন তোমার সঙ্গে বড় রূঢ় ব্যবহার করে।

না না।

কিন্তু আমি তো সব সময়েই দেখি।

না। আসলে আমার তুলনায় ওর বিদ্যাবুদ্ধি অনেক বেশি। আমি তো লেখাপড়া শিখিনি তাই অনেক সময় বোকার মতো কথা বলে ফেলি। ছেলেপুলেরা আজকাল বাপ-মায়ের তুলনায় অনেক বুদ্ধি ধরে।

বাপ-মায়ের তুলনায় ছেলেপুলেরা অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে, ওর্লোভার এই মন্তব্যে পিওতর মনে মনে খুব চটে যায়। যদিও সে বুঝতে পারে

ওর্লোভার এই মন্তব্যের পিছনে ইঙ্গিত রয়েছে ইলিয়ার প্রতি।

পিওতর জানে আলেক্সি ইলিয়াকে নিয়মিত টাকা পাঠায়, মীরনও চিঠি লেখে। ইলিয়া কোথায় আছে, কি করছে, কেমন আছে এসব জানার জন্যে বাপের মন উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে কিন্তু পিতৃত্বের আহত অভিমান প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। মুখ ফুটে প্রশ্ন করে উঠতে পারে না। ওর্লোভা বুঝতে পারে তাই সে নিজে থেকেই জানায় ইলিয়া এতদিন আরেঙ্গেল নামে একটা জায়গায় ছিল। কি কারণে তা কেউ জানে না। বর্তমানে সে দেশের বাইরে কোথাও আছে।

থাকুক যেখানে খুশি। জ্ঞান-বুদ্ধি হলেই বুঝতে পারবে, কী বোকামি করেছে। মনে মনেই বলে পিওতর। ইলিয়ার কথা একান্তে যখন সে ভাবে তখন সত্যিই সে আশ্চর্য হয়ে যায়। ছেলেটা কেন এত একগুঁয়ে? চারপাশের সকলেরই সাংসারিক বুদ্ধি হয়েছে, সবাই গুছিয়ে নেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে আর ও কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে?

আলেক্সির বাড়িতে প্রায়ই পোপোভার সঙ্গে তার দেখা হয়। ভদ্রমহিলা ঠিক আগের মতোই সুন্দরী আছেন কিন্তু বিষণ্ণতা ও একান্ত আত্মশীল ভাবটাও রয়ে গেছে। ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার কথাবার্তা প্রায় হয়ই না তবু একান্ত নির্জন মুহূর্তে তার দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে এই মহিলার মুখখানি। নিজেকেই সে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে—কেন এই মহিলাকে তুমি চাও তা তো জানো না তবু কেন সে তোমার মন এমন ভাবে অধিকার করে রয়েছে? ওর সঙ্গে কথা বলাও যা আর একজন বোবা-কালার সঙ্গে কথা বলাও একই ব্যাপার।

হ্যাঁ, সবই বদলে যাচ্ছে। কারখানার শ্রমিকরা ক্রমশই বদমেজাজী হয়ে উঠছে। শ্রমিক মেয়েরা হয়েছে অত্যন্ত মুখরা। শ্রমিক বস্তিতে ঝগড়া মারপিট তো লেগেই আছে। সন্ধ্যার পর মনে হয় বস্তিতে নেকড়েরা খেয়োখেয়ি করছে!

মজুরদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা দেখা দিয়েছে, ছেলেছোকরাদের মধ্যে ভবঘুরে মনোবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রায়ই ওরা কাজে ইস্তফা দিতে আসে। বলে, মাইনে চুকিয়ে দিন, চলে যাই।

পিওতর প্রশ্ন করে, কোথায় যাবে?

ওরা বলে, দেখি অন্য জায়গায় কি হচ্ছে।

কি কারণে এরা এমন উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে? পিওতর ভাইকে

প্রশ্ন করে। আলেক্সি শান্ত অবিচল ভঙ্গিতে বলে, শ্রমিক অসন্তোষ সর্বত্রই, এখানে তবু পরিস্থিতি অনেক ভালো, যদি তুমি পিটসবার্গে যেতে তো···। সরকারী আমলারা ও মন্ত্রীরাই এর জন্যে দায়ী। ওদের আমরা চাই না।

আলেক্সি এমন বিপজ্জনক কথা বলতে থাকে যে পিওতর তাকে কিছু কড়া কথা না বলে পারে না।

দেখো, বোকার মতো কথা বলো না। জমিদারদের রেস্তয় টান পড়েছে বলে তারা জারকে সরিয়ে দিতে চায়। আমাদের ক্ষমতার কি দরকার? টাকা তো আসছেই, আসবেও। তোমার বাবা ছুটির দিনেও ছেঁড়া জুতো পরে বেরোতেন আর তুমি পরেছ সুদৃশ্য বিদেশী জুতো আর সিল্কের নেকটাই। আমাদের উচিত জারের অনুগত শ্রমিকের মতো চলা। জার হচ্ছেন আমাদের কাছে কল্পবৃক্ষের মতো। তাঁর কাছ থেকেই তো আমরা সোনার ফল পাচ্ছি।

আলেক্সি চুপ করে শুনছিল আর মৃদু মৃদু হাসছিল। এতে পিওতরের রাগ আরো বেড়ে যায়। আজকাল লোকে বড় বেশি হাসে, এ এক নতুন কায়দা হয়েছে। বোকামি এবং বিরক্তিকর এই হাসি। নীতিহীন হলেও একমাত্র সেরাফিমই তার হাসি-গান ও কথা দিয়ে যথার্থ নির্মল আনন্দ পরিবেশন করতে পারে।

সম্প্রতি সেরাফিমের সঙ্গেই তার ভাব বেশ জমে উঠেছে। যখনই একঘেয়েমি ক্লান্তি ও অবসাদ তাকে পেয়ে বসে তখনই সুরা পিপাসা তার তীব্র হয়ে ওঠে। আলেক্সির বাড়িতে সে অত্যন্ত সংযত হয়ে মদ্য পান করে কারণ সেখানে তো একে অপরিচিত লোকের ভিড় তার ওপর পোপোভার সামনে সে মাতাল হয়ে উঠতে চায় না। নিজের বাড়িতে সব সময় একটা গুমোট ভাব। নাতালিয়া অভিমানে ঘাড় নিচু করে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকে। যদি সে ঝগড়া করতো, অভিযোগ করতো তাহলে পরিবর্তে সেও রাগ দেখাতে পারতো। নাতালিয়া এমন ভাব দেখায় যেন তাকে নিঃস্ব করে ফেলা হয়েছে, তাকে দেখলে তাই রাগের পরিবর্তে করুণাই জাগে। এইসব কারণেই পিওতর চলে যায় সেরাফিমের কাছে।

ও হে, আমি খুব তৃষ্ণার্ত।

অনুমোদনের ভঙ্গিতে সদা হাস্যময় সেরাফিম বলে, সে তো খুব স্বাভাবিক। তার মানে আপনি খুবই ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। আপনার ব্যবসাটি তো আর গালের আঁচিলের মতো ক্ষুদ্র ব্যাপার নয়।

প্রভুর জন্যে সে বিশেষ ধরনের মদ ঘরে মজুত রাখতো। রঙবেরঙের

বোতল বের করে সে গর্ব ভরে বলতো, এটা আমার নিজের আবিষ্কার। এখানে মাত্র একজন মহিলাই এটি তৈরি করতে পারে। এক পুরুতের বিধবা স্ত্রী। একবার চেখে দেখুন জিনিসটা কেমন। বার্চের কুঁড়ির সঙ্গে বসন্তের ফলের রস মেশানো।

শালগমের মদ খেতে খেতে বুড়ো একনাগাড়ে বকে যায়। বুঝলেন মহিলাটির ভাগ্যটা বড়ই খারাপ। যাকে ভালোবাসে সে-ই চোর হয়ে যায়। ও আবার প্রেমিক ছাড়া থাকতেই পারে না।

পিওতর বলে, হ্যাঁ, মেলাতেও এই ধরনের একটি মেয়েকে আমি দেখেছিলাম।

সেরাফিম সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলে, হ্যাঁ, জগতের সেরা মাল তো ওখানেই দেখতে পাবেন।

সেরাফিম বহু লোকের হাঁড়ির খবর রাখে। রসিয়ে রসিয়ে কেচ্ছাকাহিনী সে প্রভুকে শোনায়। নিজের মেয়েকেও বাদ দেয় না। মেয়ের সম্পর্কে এমন ভাবে বলে যেন অচেনা কেউ।

সঙ্গীটা এবারে স্থিতু হয়েছে মনে হয়। মেকানিক সিয়োডোভের সঙ্গে এখন ঘর করছে। যে যেমন জীব সে ঠিক নিজের মতো আস্তানা খুঁজে নেয়। বুঝলেন তো মানেটা?

সেরাফিমের ছোট্ট পরিচ্ছন্ন ঘরে পিওতরের সময় বেশ কেটে যায়। বেশ কিছুটা পান করার পর নেশা জমে উঠলে পিওতর তার নিজের মানুষজন সম্পর্কে বিষোদ্গার করতে শুরু করে। সেরাফিম তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, আপনি অত ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আসলে অনেকদিন চুপটি করে থাকার পর মানুষ এখন ছুটতে শুরু করেছে কি না তাই আপনার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে অত মাথা ঘামাবেন না। মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখুন। বলি নিজেকে তো আপনি বিশ্বাস করেন? করেন কি না?

পিওতর ভাবতে থাকে সত্যিই তার নিজের ওপর আস্থা আছে কি না। এদিকে বুড়ো সেরাফিম বকবক করতেই থাকে।

কে ভালো কে মন্দ এই নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবেন না। ওতে কোনো লাভ নেই। কাল যা ভালো ছিল আজ আর তা ভালো নেই। ভালো খারাপ দুই-ই অনেক দেখেছি পিওতর ইলিচ। এই দেখি একজন ভালো মানুষ, পরের মুহূর্তেই দেখি সে আর নেই। সবই যেন ধুলোর ঝড়ে উড়ে যায়। এই যে আমি, আমি কি? একটা মাছি ছাড়া আর কি? মানুষের ভিড়ে আমাকে দেখাই যায় না। আবার এখানে আপনিও আছেন।

অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতে একটি আঙুল তুলে ধরে সেরাফিম চুপ করে যায়।

সেরাফিমের বকবকানির মধ্যে পিওতর দু রকমের আনন্দ পায়। একদিকে ওর কথাগুলো সত্যিই আনন্দদায়ক, সান্ত্বনাদায়ক। অন্যদিকে সে বুঝতে পারে বুড়ো একটিও সত্যি কথা বলছে না। চতুর পেশাদার সান্ত্বনাদায়কের মতো সে শুধু অভিনয় করে চলেছে, কোনোটাই তার মনের কথা নয়। তবু লোকটির আনন্দ দেবার ক্ষমতাকে সে তারিফ করে, নিকিতার এ ক্ষমতা নেই

পিওতরের একে একে মনে পড়ে কোথায় কোথায় সান্ত্বনাদায়কদের দেখেছে: মেলায় নির্লজ্জ মেয়েদের, সার্কাসে ভাঁড়দের, গায়ক-গায়িকা ও যন্ত্রবাদকদের, পশু বশকারীদের আর মানুষের বন্ধু স্টিয়োপাকে। এদের সকলের সঙ্গেই আলেক্সির কিছু মিল আছে কিন্তু টিখনের মধ্যে কিছুই নেই।

মত্ত অবস্থায় সে সেরাফিমকে ধমকে বলে, এই বুড়ো শয়তান, তুই মিথ্যে কথা বলছিস!

কি করে মিথ্যে বলবো, সত্য কি তা কি আমি জানি?

তবে চুপ করে থাক্।

তা কি করে হয়, আমি তো আর বোবা নই।

ছোট্ট মুখখানায় হাসি ফুটিয়ে সেরাফিম বলতে থাকে, আমি বুড়ো হয়েছি, যে কটা দিন বাঁচবো সত্যকে না জানলেও চলবে। সত্যকে জানার আগ্রহ তরুণদের। তাই ওদের নাকের ওপর চশমা ঝোলে। এই ধরুন মীরনের কথা। চশমার ভিতর দিয়ে ও প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখে।

সেরাফিম যে মীরনকে দেখতে পারে না এতে পিওতর খুশী হয়।

সেরাফিম বাজনা বাজিয়ে গান ধরে। গানের ভাষায় মীরনের বিদ্রূপ তারপর ইয়াকভের প্রশস্তি।

পিওতর খুশীতে বলে ওঠে, ঠিক কথা!

এমনিভাবেই কোনো কোনোদিন মজা উপভোগ করতে করতে ভোর হয়ে যায়। টিখন এসে দরজায় কড়া নেড়ে প্রভুর ঘুম ভাঙায়।—এবারে আপনার বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। একটু পরেই কারখানার বাঁশি বেজে উঠবে আর শ্রমিকেরা আপনাকে এখানে দেখবে। নিশ্চয়ই সেটা কাম্য নয়।

পিওতর রাগে চিৎকার করে বলে, কি ভালো নয়? তুমি আমায় জ্ঞান দিতে এসেছ? আমি এখানকার মনিব তা জানো?

রাগ দেখালেও টিখনের কথা শুনে সে কিন্তু টলতে টলতে বাড়ি ফিরে যায়। বাড়ি ফিরে ঘুমোয়। বিকেল পর্যন্ত ঘুমোয় তারপর আবার রাতে চলে যায় সেরাফিমের কুটিরে।

হাসিখুশি ছুতোরটা একদিন কাজ করতে করতে মারা পড়ল। ডাক্তার মোরোজোভের ছেলেটি জলে ডুবে মারা গিয়েছিল। তারই জন্যে শবাধার তৈরি করতে করতে সে হঠাৎ পড়ে যায় আর ওঠে না। পিওতর স্থির করে সে শবানুগমন করবে। কবরখানায় প্রবেশ করে দেখে জায়গাটা ভরে উঠেছে শ্রমিকদের ন পুরোহিত আলেকজান্ডার কঠোরভাবে সংকারের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করায়। কারখানার স্কুলের শিক্ষক গ্রেবনেভ পরিচালনায় ছোট ছেলেমেয়েরা চমৎকার গান গায়।

এত লোকের জমায়েত হবার কারণ পিওতর মনে মনে ব্যাখ্যা করে বলে, আজ রবিবার কি না।

ছোট্ট হালকা শবাধারটি বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এগিয়ে আসে ছোকরা শ্রমিকেরা। যাদের পদমর্যাদা একটু বেশি তারা কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে। এই উপলক্ষ্যে বেমানান একটি রঙচঙে ব্লাউজ পরে মুখ গম্ভীর করে ঝিনাইদা শবাধারের ঠিক পিছনে পিছনে হাঁটতে থাকে। তার চোখে অবশ্য জল নেই। তার পাশে রয়েছে মেকানিক সিয়োডোভ। তার পরনে ধোপ-দুরস্ত পোশাক। টিখন চলেছে ধুলো ওড়াতে ওড়াতে। আকাশে উজ্জ্বল রোদ আর শবাধারবাহীদের কণ্ঠে গান। সব মিলিয়ে এই শোকানুষ্ঠানে বিষাদের নামগন্ধ নেই।

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে পিওতর টিখনকে বলল, কারখানার সবাই এসেছে। সহকর্মীরা ওকে সুন্দর বিদায় জানাল।

টিখন পায়ের আঙুলের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, ওকে লোকে এত ভালোবাসে জানলে ও খুশি হতো। ওর মেয়ে যেমন, ও-ও তেমনি সবাইকে মজায় মাতিয়ে রাখতো।

শূন্যে হাত ঘুরিয়ে টিখন আবার বলে, যখন ঝিনাইদা ছোট ছিল তখন সেরাফিম ওকে কোলে করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো আর ছোট্ট ঝিনাইদা সবাইকে গান শোনাতো। চিরদিনই ও সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছে।

হঠাৎই টিখন মাথা তুলে শ্রদ্ধাহীন দৃষ্টিতে পিওতরের দিকে তাকিয়ে বলে, সেরাফিম লোককে বিভ্রান্ত করতো। যদিও কারো ওপর কোনোদিন অন্যায় করেনি তবু সৎ জীবন যাপন করতো না।

চরম বিরক্তিতে পিওতর বলে ওঠে, 'সৎ জীবন যাপন' 'সৎ পথে

জীবন যাপন' তোমার মাথার মধ্যে এই ধারণাগুলো শেকলের মতো জড়িয়ে গেছে। কুকুর তুলুনের মতো পাগল হয়ে যাবে তুমি একদিন।

বিরক্তিভরে টিখনের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে পিওতর সোজা বাড়ি চলে যায়।

দুপুরের অনেক আগে থেকেই আবহাওয়া গরম হয়ে ওঠে। দিনটা ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিকেলের দিকে হাওয়া চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সারাটা দিন গুমোটের মধ্যে কাটিয়ে বিকেলের দিকে পিওতর বাগানে কিছুক্ষণ পায়চারি করে ফটক দিয়ে উঠোনের দিকে বেরিয়ে যায়। সেখানে টিখনের সঙ্গে দেখা। বৃষ্টিতে লোহার গেটগুলোয় মরচে ধরে গিয়েছিল; টিখন সেখানে আলকাতরা মাখাচ্ছিল। পিওতর বিশ্রাম নেবার জন্যে একটি বেঞ্চিতে এসে বসলো।

হালকাভাবেই পিওতর বলল, ছুটির দিনেও তুমি কাজ করছো কেন?

টিখন সাদা চোখ তুলে তেরছা দৃষ্টিতে তাকে একবার দেখে নিয়ে নিচু স্বরে বলল, সেরাফিম লোকটা বিপজ্জনক ছিল।

কেন?

একঝাঁক কালো বোলতা যেন চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পিওতরের মেজাজ তিক্ত হয়ে উঠল টিখনের উত্তর শুনে।

ওর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রবল। যা একবার দেখতো ভুলতো না কোনোদিন। কী বা দেখতো? দেখতো মানুষের যা কিছু খারাপ, যতো সব নোংরা কাণ্ডকারখানা। সেগুলোই রসিয়ে রসিয়ে লোকের কাছে পরিবেশন করতো। আমার তো মনে হয় বুড়ো হয়ে গেলে লোকে মরে যাবে আর তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু খারাপ তাও বিলীন হয়ে যাবে। আবার নতুন প্রজন্ম দেখা দেবে, তারা বাপ-পিতামহের পাপের কথা কিছু জানবে না, তারা শুধু মনে রাখবে যা কিছু ভালো। স্মৃতির ভারে আমিও যন্ত্রণা ভোগ করছি। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, এখন আমার দরকার বিশ্রাম ও শান্তির। কিন্তু শান্তি কোথায় পাব? বিস্মৃতিই একমাত্র শান্তির পথ।

এর আগে কোনোদিন টিখনকে এত কথা একসঙ্গে বলতে শোনা যায়নি। এত উত্তেজিতভাবেও কথা বলেনি কোনোদিন। দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে পিওতর গভীরভাবে চিন্তা করছিল। লোকটা চিরকালই বোকার মতো মন্তব্য করে কিন্তু আজ ওর কথার মধ্যে যেন শত্রুতার ঝাঁজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ওর জট পাকানো দাড়ি, কপালের কঠিন ভাঁজ, মুখের চামড়ার

কুঞ্চন, সব মিলিয়ে লোকটাকে ভীষণ কুৎসিত দেখাচ্ছে। বয়সের ভারে হাড়-সর্বস্ব মুখখানা দেখতে হয়েছে ঝামার মতো।

ওকে জরায় পেয়েছে, ভীমরতি হয়েছে ওর। ওকে আর কাজে রাখা চলে না। ওকে বরখাস্ত করব আমি। অবশ্য ক্ষতিপূরণ দেব। পিওতর মনে মনে স্থির করে নেয়।

এক হাতে আলকাতরার বালতি অন্য হাতে ব্রাশ নিয়ে টিখন পিওতরের কাছে এগিয়ে আসে। কারখানার মাংসের রঙের দেওয়ালের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলতে থাকে টিখন : ওরা সব সময় কি বলাবলি করে তা আপনার জানা উচিত। ওই যে ঢেঙা সিয়োডোভ, একচোখো মনোজোভ, আরো অনেকে এমন কি ঝিনাইদাও খোলাখুলি বলে, যে ব্যবসা একজনের জন্যে অপরে গড়ে দেয়, তা হল পাপের ব্যবসা। এ ব্যবসার ধ্বংস হওয়াই উচিত।

পিওতর ঘৃণাভরে বলে, এসব তোমার কথারই প্রতিধ্বনি।

আমার? মাথা নেড়ে টিখন বলে, না না, ওসব কথা আমার নয়; এসবের সঙ্গে আমার কোনো সংস্রব নেই। কারো কোনো ক্ষতি না করে প্রতিটি লোক নিজের নিজের কাজ করে যাবে এই হলো আমার নিজস্ব ধারণা। কিন্তু ওরা বলে এ সবই আমাদের দান সুতরাং আমরাই মনিব। পিওতর ইলিচ, যদি ওদের কথাগুলো ভালো করে ভেবে দেখেন তবে দেখবেন ওরা ঠিক কথাই বলে। আজ আপনার যা ঐশ্বর্য সব কিছুই ওদের পরিশ্রমের ফসল।

পিওতর জড়তা ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। পকেটের মধ্যে হাত দুটি ঢুকিয়ে কথা খুঁজে বেড়ায়। বারকয়েক কথা আটকে যায় তারপর দৃঢ়-স্বরে বলতে শুরু করে, অবস্থাটা তাহলে এই দাঁড়িয়েছে। অবশ্য আমি স্বীকার করি সারাটা জীবন তুমি আমার সঙ্গে কাটিয়েছ। তবু তুমি এখন বৃদ্ধ হয়েছ, তোমার পক্ষে কঠিন এখন···

মনিব কি বলছে সেদিকে কান না দিয়ে টিখন আবার বলে, ওরা যা বলে সেরাফিমেরও তাতে সায় ছিল।

থামো! তোমার বিশ্রাম নেবার এখন সময় হয়েছে।

একটা সময় আসে যখন প্রত্যেককেই বিশ্রাম নিতে হয় তাই নয় কি?

থামো! তোমাকে নিয়ে চলা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে দেখছি।

টিখন ভায়ালোভ তার বরখাস্তের আদেশ শুনে এতটুকু বিস্ময় প্রকাশ না করে বলল, ভালো কথা, ওতে কী এসে যায়।

বরখাস্তের আদেশ এত সহজ ভাবে গ্রহণ করায় পিওতর খানিকটা

হোঁচট খেল। তাই সুর নরম করে বলল, অবশ্য তোমাকে আমি ক্ষতি-পূরণ দেব।

টিখন কিছুই বলল না। ছেঁড়া জুতোয় আলকাতরা লাগাতে থাকে সে।

পিওতর তার সব দৃঢ়তা একত্রিত করে বলে, তার মানে তোমাকে এখন বিদায় নিতে হয়।

ঠিক আছে। উত্তর দেয় টিখন।

নদীর ধারটায় ঠাণ্ডা হবে এই আশায় পিওতর হাঁটতে হাঁটতে নদীর পারে চলে যায়। পাইন গাছের ছায়ায় যেখানে ইলিয়ার সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল সেখানে বার্চ গাছের ডাল দিয়ে সেরাফিম তাকে একটি সিংহাসনের মতো তৈরি করে দিয়েছিল। এখানে বসে সে কারখানা থেকে আরম্ভ করে নিজেদের ঘরবাড়ি, গির্জা, হাসপাতাল, কবরখানা সব কিছুই দেখতে পায়।

কিছুদিন পরে এই বৃহৎ ব্যাপার তার মনে আনন্দ কিংবা গর্ব কিছুই জাগাতে পারছে না। তার এখন মনে হয় এ সবই হচ্ছে অপমানের উৎস। নানা দিক থেকে অপমান জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে অপমানকর মনে হয় যখন দেখে তার ভাই, ভাইপো বাজারের জিপসীদের মতো হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলে। তার উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কে মেতে ওঠে। ব্যবসার বয়োজ্যেষ্ঠ অংশীদারকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। এমনকি কারখানার কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যখন কথা ওঠে তখন তাকে নিজের উপস্থিতি ওদের স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। তারপর সে যখন কথা বলে তখন তারা এমন ভাব করে শোনে যেন কত মনোযোগ দিয়েই না শুনছে। তার বক্তব্যের সঙ্গে ওদের মতের মিল এমন ভাবটাই করে কিন্তু কাজের সময় নিজেরা যা ভালো বোঝে তাই করে যায়। এই জিনিসটা অনেকদিন ধরেই চলছে। তার আপত্তি অগ্রাহ্য করে কারখানায় ওরা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের যন্ত্র বসায়। পিওতর অবশ্য খুব তাড়াতাড়িই বুঝতে পেরেছিল যে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার নিরাপদ, খরচও কম তবু অপমানের জ্বালাটা বুকের মধ্যে রয়েই গেছে। এইভাবে অনেক অপমানই তাকে সহ্য করতে হয়েছে। দিনে দিনে অপমানের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এত অপমানের ভার বহন করতে সে আর যেন পেরে উঠছে না।

তার ভাইপো লেখাপড়ার পাট শেষ করেছে। তার চামড়ার বিদেশী জ্যাকেট থেকে পায়ের হলুদ রঙের জুতো সব কিছুই বিরক্তি ধরায়। তার

কথাবার্তার ধরন অত্যন্ত উদ্ধত, অপমানকর।

তার কথা বলার ভঙ্গিটা সব সময় এই রকম। জ্যাঠা, ওসব রাস্তা পুরনো হয়ে গিয়েছে। সময় বদলে গিয়েছে, ওসব এখন আর চলে না।

কড়া মনিবকে যেমন চাকর ভয় করে মীরন ঠিক তেমনি সময় অপচয়কে ভয় করে। এই একটি ব্যাপারেই তার ভয় আর অন্য সব ব্যাপারে তার ঔদ্ধত্য সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। একদিন সে স্পষ্টই বলেছিল, তুমি আর তোমার মতো লোকদের নিয়ে রাশিয়া টিকে থাকতে পারে না, একথা তোমার উপলব্ধি করা উচিত।

আঘাতটা এতই তীব্র হয়ে বেজেছিল যে পিওতর জিজ্ঞাসা করে দেখে নি কি কারণে অমন তিক্ত মন্তব্য সে করলো? কয়েকদিন সে ভাইয়ের বাড়িতে গেলই না, কারখানায় যতবার দেখা হয়েছে মীরনের সঙ্গে সে একবারও কথা বলেনি।

ভেরা পোপোভার মেয়েকে মীরন বিয়ে করতে চায়। মায়ের মতোই মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গী ও সুন্দরী। তারও চেপে হাসার অভ্যাস। সব কিছুর দিকে সে শুধু বড় বড় চোখ তুলে তাকায়। সেই দৃষ্টিতে সব কিছুর উপরেই যেন অবিশ্বাস। তার একটি অভ্যাস হচ্ছে দাঁতের ফাঁক দিয়ে গুনগুন করে গান গাওয়া। আর একটি বদ অভ্যাস হচ্ছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রঙীন পেন্সিল দিয়ে ছবি এঁকে টেবিল ক্লথ নষ্ট করা। থুতনির নিচে ফিতে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও টুপিটা তার পিঠের দিকেই ঝুলে থাকে। পোশাক পরাতেও পারিপাট্য নেই। স্কার্ট এত ছোট যে হাঁটু পর্যন্ত দেখা যায়।

অকমা গোরিৎসভিয়েতভও তার বিরক্তি ধরায়। কখন যে সে হাজির হয় আর কখন যে অদৃশ্য হয়ে যায় বোঝা ভার। এসেই খেঁকী কুকুরের মতো চিৎকার শুরু করে দেয়।

আত্মিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ রাশিয়াকে তোমরা প্রাণহীন আমেরিকায় পরিণত করার চেষ্টা করছো। মানুষের জন্যে তোমরা ইঁদুর ধরার ফাঁদ পাতছো।

কখনো কখনো ওর চিৎকার করে বলা কথার মধ্যে পিওতর সত্যের আভাস পায় কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই টিখনের নির্বোধ উক্তিরই প্রতিধ্বনি শুনতে পায় সে। কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে দুজনের মধ্যে তফাত আছে। একজন উন্মত্ত, অশান্ত, বাক্যবাগীশ, অন্যজন উদাসীন, গুরুগম্ভীর। গোরিৎসভিয়েতভ এলিজাভেটা পোপোভার কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলে, তোমার মতো প্রাণময়ী কেন মুখ বুজে থাকে

এলিজাভেটা ধূসর আবেগহীন চোখ দিয়ে শুধু স্মিত হাসে। তার দেহ গর্বভরে নিশ্চল হয়েই থাকে। নতুন নতুন কথাও শোনে পিওতর, যা সে জীবনে কোনোদিন শোনেনি, মানেও জানে না। যেমন মীরন মন্তব্য করে, এসব হচ্ছে রোমান্টিসিজমের বিষাদ।

আলেক্সি নিয়মিত মস্কো যাতায়াত করছে। ইয়াকভ মুটিয়েই চলেছে. সে সব সময়েই আড়ালে থাকে, কথা কম বলে তবে যখন বলে তখন মীরন ও তার বন্ধু চিড়বিড়িয়ে ওঠে। তাতারদের মতো ঘন মোটা গোঁফ ও লাল দাড়ি গজিয়েছে। লোকের সঙ্গে রঙ্গরসিকতাতেও সে বেশ দড় হয়ে উঠেছে।

একটা ঘটনায় পিওতর খুব আনন্দ পায়। ইয়াকভও যে খুব খুশী হয়েছে তা তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়। এলিজাভেটা পোপোভা হঠাৎ মস্কো গিয়ে গোরিৎসভিয়েতভকে বিয়ে করে বসে। মীরন তো রেগে আগুন। রাগ সে চেপে রাখতেও পারে না। সে এমন সূচোলো দাড়ি রেখেছে যা অন্য বণিকেরা রাখে না। সেই দাড়ি পাকাতে পাকাতে মীরন বলে, গোরিৎসভিয়েতভ যে জাতের লোক তারা এখন নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে; ওদের মতো অকর্মণ্য লোক পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

ইয়াকভ খোঁচা দিয়ে বলে, তবু তাদেরই একজন তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গেল। ভালোবাসার পাত্রীটিকে তোমার নাকের ডগা দিয়ে নিয়ে গেল।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মীরন বলে, আমি মোটেই রোমান্টিক নই।

কি নও? কার কথা বলছ তুমি? পিওতর জিজ্ঞেস করে।

মীরন এমন একটা ভাব দেখায় যেন জজ সাহেবের মতো রায় দিচ্ছে সে।

জ্যাঠা, রোমান্টিসিজম যে কী বস্তু তা কেউই বোঝে না। তুমি তো বুঝবেই না। এটা এক ধরনের সৌন্দর্যের প্রতীক, টাক মাথায় পরচুলোর মতো। কিংবা জুয়োচ্চোরের জাল দাড়ির মতো সাবধানতা বলতে পার।

পিওতর মনে মনে উল্লসিত হয়ে বলে, এতদিনে বাছাধনকে প্যাঁচে ফেলা গেছে।

যে দুর্বিনীত লোকগুলো তার হাত থেকে ব্যবসা ছিনিয়ে নিয়ে বাধ্যতামূলক নিঃসঙ্গ অবসর যাপনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এদের কাছে দিনের পর দিন যে অপমান তাকে সহ্য করতে হচ্ছে এসবের জ্বালা থেকে কিছুটা আত্মতৃপ্তি অনুভব করে সে এই জাতীয় ছোট ছোট ঘটনায়।

আবার এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে পিওতর এক বিষন্ন আনন্দের উৎসও আবিষ্কার করে। এক নতুন সত্তার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে যাকে সে আগে কোনোদিন চিনতো না। হয়তো তাকে ভাসাভাসা ভাবে চিনতো, এ এক অন্য পিওতর। অন্য ধাতের, অন্য চরিত্রের পিওতর আর্টামনোভ।

শান্তশিষ্ট ভালোমানুষ ছিল সে তবু জীবনে শুধু দুর্ব্যবহারই পেয়ে এসেছে। জীবন তার সঙ্গে চিরদিনই সৎমায়ের মতো ব্যবহার করে এসেছে। জীবন শুরু হল তার বাপের নিরীহ অনুগত চাকরের মতো। বাপের কাছে ভালোবাসা পায়নি কোনোদিন উল্টে তিনি ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন এক প্রাণহীন বউ ও বিশাল এক ব্যবসার ভার। একথা ঠিক বউয়ের কাছ থেকে সে ভালোবাসা পেয়েছে এবং বিবাহিত জীবনের প্রথম বছরটি তার মন্দ কাটেনি। তবে এতদিনে সে বুঝেছে যে ঝিনাইদার মতো স্বৈরিণীও ভালোবাসায় রসকষ দিতে জানে। আর মেলার সেই প্রেম-বিলাসিনীদের কথা তো স্মরণ না করাই ভালো। সারাটা জীবন নাতালিয়া শুধু ভয়ে ভয়েই কাটাচ্ছে। প্রথম দিকে সে ভয় পেত আলেক্সি ও কেরোসিন বাতিকে। পরের দিকে ভয় পেত বৈদ্যুতিক আলোকে। আলো জ্বললেই সে ঈশ্বরের নাম জপ করতে শুরু করে দেয়। গ্রামোফোনের দোকানে কি বিব্রতই না তাকে করে তুলেছিল সে।

না না ওটা কিনো না। ওর ভিতরে নিশ্চয়ই শয়তান লুকিয়ে আছে। বাক্সের মধ্য থেকে শয়তানটাই চেঁচামেচি করছে।

বর্তমানে সে ভয় করে মীরনকে, ডাক্তারকে ও মেয়ে তাতানিয়াকে। মেয়েটা দিনে দিনে বেধড়ক মোটা হয়ে চলেছে। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত সে শুধু খায়। ছেলেমেয়েরা কেউই তাকে মানে না। ইয়াকভকে বিয়ে করতে বলায় সে বিদ্রূপ করে বলেছিল, মা, তুমি আরো খেয়ে যাও।

নাতালিয়া খোঁচাটা কোথায় বুঝতে না পেরে অপরাধীর মতো বলে, না, আমি আর বেশি খাবো না।

যদিও আগের মতোই আবার সে খেতে শুরু করে।

একদিন ইয়াকভকে পিওতর প্রশ্ন করে, মাকে বিদ্রূপ কর কেন? বিয়ে করার সময় তো তোমার হয়েইছে।

ইয়াকভ যান্ত্রিক ভাবে উত্তর দেয়, বিয়ে করে সংসারে জড়িয়ে পড়ার এটা সময় নয়।

এই সময়টাকে তোমরা সবাই এত ভয় পাও কেন? পিওতর রাগত স্বরে প্রশ্ন করে।

ইয়াকভ শুধু ঘাড় ঝাঁকায়, কিছু বলে না।

অন্য সময়ে সে বলে, বাবা, তুমি বুঝবে না। অবশ্য সে বিনীত ভাবেই বলে। পিওতর আশ্চর্য হয়ে ভাবে ছেলের চেয়ে বাবা কম বোঝে এও কি কখনো হয়? মানুষ তো গতদিনের পরিবেশেই বাস করে, আগামী দিনের জন্যে তো নয়। কেউ তো বলে না আগামী দিনটা ভালো হবে বরং বলে অমন দিনটি আর আসবে না। এইভাবেই তো লোকে জীবন কাটায়।

বড় ছেলে এবং সবচেয়ে প্রিয় সন্তানটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। তারই জন্যে সে এমন একটি কাজ করে ফেলেছে যা সে কখনই মনে করতে চায় না।

বড় মেয়ে এলেনার চেহারা হয়েছে বেঢপ। যেমন মুখখানি বড় তেমনি গুরু নিতম্ব। মাতাল স্বামী আর ঐশ্বর্য তাকে নষ্ট করেছে। তাকে সম্পূর্ণ অপরিচিতাই মনে হয়। কদাচিৎ যখন সে বাপের বাড়িতে আসে, দামী পোশাক ও অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে আসে। গয়না বাজিয়ে হাই তুলতে তুলতে সে বলে, এখানকার আবহাওয়াটা কী বিশ্রী। সারা বাড়িতে দুর্গন্ধ। তোমাদের উচিত আর একটা বাড়ি তৈরি করে উঠে যাওয়া। তাছাড়া কারখানার লাগোয়া কেউ থাকে না কি?

একদিন পিওতর শুনতে পায় মেয়ে মাকে বলছে, বাবা দেখছি আগের মতোই আছেন। তোমার নিশ্চয়ই খুব একঘেয়ে লাগে। আমার স্বামী মাতাল হতে পারে কিন্তু খুব ফুর্তিবাজ।

এলেনার পরিচ্ছন্নতার বাতিকও সবাইকে অতিষ্ঠ করে তোলে। চেয়ারে বসতে গিয়ে আগে সে রুমাল দিয়ে ধুলো ঝেড়ে নেবে। তারপর রুমালটায় এত সেন্ট ঢালবে যে সকলের হাঁচি পাবে। সব কিছুর উপরেই সে এমন অশোভন ভাবে বিরক্তি প্রকাশ করে যে পিওতরের ইচ্ছে হয় একদিন মেয়েকে তিক্ত কথা শোনাতে। মেয়ে সামনে থাকলে ইচ্ছে করেই সে গেঞ্জির ওপর ছেঁড়া ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে নোংরা চটি পায়ে ঘুরে বেড়ায়। শুধু ঘরেই নয়, উঠোনেও চলে যায় ওই বেশে। খেতে বসে শব্দ করে চিবোয়, ঢেকুর তোলে।

মেয়ে রেগে গিয়ে বলে, বাবা, তুমি করছো কি?

এই রাগটাই পিওতর চাইছিল।

আমাকে মাফ করো রুচিশীলা মহিলা। জানোই তো আমি চাষাভুষো মানুষ।

এলেনা বিদেশে অনেক ঘুরেছে। সন্ধ্যাবেলায় সে হেঁড়ে গলায় মাকে

যতসব আজগুবি গল্প শোনায়।

জানো মা, একটা শহরে মেয়েরা ব্রাস ও সাবান দিয়ে বাইরের দেয়াল পরিষ্কার করে। আর একটা শহরে কি গরমে কি শীতে এত ঘন কুয়াশা থাকে যে রাতদিনই রাস্তায় আলো জ্বলে তবু কিচ্ছু দেখা যায় না। প্যারিসে সব দোকানেই তৈরি পোশাক বিক্রী হয় আর ওখানে এত উঁচু একটা টাওয়ার আছে যে সেই টাওয়ারের ওপরে উঠলে সাগরপারের শহরগুলোও স্পষ্ট দেখা যায়।

ছোট বোন তাতানিয়াকে এলেনা সব সময়েই হেনস্থা করে। তাতানিয়া রোগা এবং কালো। দেখতে ভালো নয় বলে তার মেজাজটাও খিটখিটে হয়েছে। ছোট বিনুনি, সমতল বুক, নীলচে নাক—কিজন্যে যেন তাকে দেখে গির্জার কেরানীর মতো লাগে। বোনের কাছেই সে শহরে থাকে। যে কোনো কারণেই হোক সে স্কুলের পড়া শেষ করতে পারেনি। ইঁদুরে তার খুব ভয়। মীরনের সঙ্গে সে একমত যে জারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। সম্প্রতি সে সিগারেট খাওয়াও ধরেছে। গরমের সময় যখন সে আসে তখন মায়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যেন মা তার বাড়ির ঝি। বাপের সঙ্গে কথা বলে এমন দুর্বোধ্য ভাষায় যে তার বক্তব্য যে কী পিওতর কিছুই বুঝতে পারে না। বিকেলে সে শহরে কাকার বাড়িতে বেড়াতে যায়। বাড়ি ফিরে সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো ডাক্তার ইয়াকোভলিয়েভের সঙ্গে। ঘুমটা তার খুবই প্রিয়। চটি দিয়ে দেয়ালের গায়ে মশা মারা তার একটি প্রিয় কাজ। এমন জোরে দেয়ালে মশা মারে মনে হয় পিস্তল ছুঁড়ছে।

পিওতরের জগৎটা ক্রমশই তার কাছে অপরিচিত হয়ে উঠছে। এত গোলমালে ভরা ও অর্থহীন কথাবার্তা ও ঘটনায় ভরা যে তার কাছে অসহ্য লাগে। মীরনের উদ্ধত কথাবার্তা থেকে বয়লারের কয়লা ঝাড়ে যে সেই ভাস্কার অর্থহীন গান সব কিছুই বিরক্তি ধরায়।

ওর্লোভা আজকাল আর ইলিয়ার সম্পর্কে কোনো খবর তাকে দেয় না। এই নতুন পিওতর জীবনে যে বারবার অবিচারের শিকার হয়েছে সে আরো বেশি করে ইলিয়ার কথা ভাবে। মনে হয় ছেলেটা এতদিনে তার এক-গুঁয়েমির ফল ভোগ করছে। আলেক্সির বাড়িতে তার পরিবর্তিত মনোভাব দেখে তাই মনে হয়। একদিন বিকেলে হলঘরে কোট খুলে রাখছে এমন সময় মীরনের কণ্ঠস্বর সে শুনতে পেল। মীরন তখন সদ্য মস্কো থেকে ফিরেছে। পিওতর শুনতে পেল মীরন বলছে: ইলিয়া হচ্ছে সেই জাতের মানুষ, যারা বইয়ের মধ্য দিয়ে জগৎটাকে দেখে। ওরা তাই গরু আর ঘোড়ার মধ্যে

তফাতটুকু বোঝে না।

পিওতর মনে মনে বলে, সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা।

আলেক্সি প্রশ্ন করে, ও আর গোরিৎসভিয়েতভ কি একই দলের ?

না, আরো কট্টর।

ঘরে ঢোকার মুখে পিওতর ওদের মনে মনে শাসায়, একটু সবুর কর, তোমাদের সবাইকে ও মজা দেখাবে।

জ্যাঠাকে দেখেই মীরন মস্কোর গল্প শুরু করে দেয়। সরকারের নির্বুদ্ধিতার সমালোচনা করে। ঠিক সেই সময়ে নাতালিয়া ও ইয়াকভ প্রবেশ করে। ওদের শুনিয়ে মীরন কাগজের ফ্যাক্টরী খোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। কিছুদিন ধরেই এই কাগজের কল খোলা নিয়ে সে সবাইকে উত্যক্ত করছে।

জ্যাঠা, আমাদের টাকাগুলো তো বেকার পড়ে আছে, এইটুকু শুনেই নাতালিয়ার কান লাল হয়ে উঠল। সে আঁতকে উঠে বলল, কোথায় বেকার পড়ে আছে ? কার কাছেই বা আছে ?

বিরক্তির একটা বড় ঢেউ যেন পিওতরের ওপর ভেঙে পড়ল। তার সামনে যেন এমন একটি ঘরের দরজা খুলে গেল যেখানকার মানুষজন, জিনিসপত্তর এতই পরিচিত যে ঘরটাকে শূন্য বলেই মনে হয়। দৈহিক অবসাদের এই অনুভূতির ওপর বাইরে থেকে যেন এক ঝলক কুয়াশা এসে তার চোখ কান সব বন্ধ করে দিল। নিঃসীম ক্লান্তিতে তার মনে অসুখ ও মৃত্যুর চিন্তা দেখা দেয়।

তোমাকে নিয়ে আমি আর পারছি না। কবে যে তোমার হাত থেকে মুক্তি পাবো।

ইয়াকভও বিরক্তি প্রকাশ করে বলে, এমনিতেই অশান্তির শেষ নেই।

নাতালিয়া আবার চিৎকার করে বলে, মজুরদের বিক্ষোভে তো বাড়ির বাইরে যাবার উপায় নেই, সব সময়েই মাতলামি আর মুখখিস্তি···

জানলার কাছে সরে গিয়ে পিওতর দেখে ফলের বাগানে কয়েকটি ছোট্ট মেয়েকে আপেল গাছ দেখাচ্ছে টিখন।

'নবযুগের আদম দেখছি'—ভাবে পিওতর। টিখনকে দেখে কিন্তু তার মানসিক অবসাদ যেন চলে যায়। অপ্রত্যাশিতকে চিরদিনই সে পছন্দ করে কারণ এরা চকিতে আসে, চকিতে চলে যায়, মনের ওপর কোনো দুশ্চিন্তার ভার রেখে যায় না।

টিখনের ক্ষেত্রে তাকে নিষ্ঠুর অপমান সহ্য করতে হয়েছে। চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর সে কোথায় চলে গিয়েছিল। এক বছর পরে যখন সে

ফিরে আসে আলেক্সি তখন তাকে পুনর্বহাল করে। টিখন একটি অপ্রিয় সংবাদ নিয়েও ফেরে। নিকিতা আশ্রম থেকে অন্তর্ধান করেছে এবং কোথায় গেছে তা কেউ জানে না। পিওতরের স্থির বিশ্বাস টিখন সব জানে কিন্তু নিজেকে অপ্রিয় করে তুলতে চায় বলেই সে কিছু প্রকাশ করছে না।

টিখনকে কেন্দ্র করে আলেক্সির সঙ্গে তার একচোট ঝগড়া হয়ে যায়। আলেক্সি অবশ্য জোরালো যুক্তিতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে।

ভেবে দেখ তো একজন লোক সারাটা জীবন আমাদের সেবা করে গেল, হঠাৎই তুমি তাকে দূর করে দিলে। কাজটা কি যুক্তিসঙ্গত হয়েছে?

যুক্তিসঙ্গত যে হয়নি তা পিওতরও বোঝে তবু টিখনের উপস্থিতি তার কাছে অস্বস্তিকর মনে হয়। নাতালিয়াও জীবনে এই প্রথম আলেক্সিকে সমর্থন করল। এমন দৃঢ়তার সঙ্গে সে কথা বলল যা তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

তুমি যাই বল পিওতর ইলিচ, কাজটা মোটেই ঠিক হয়নি। তুমি যদি আমাকে মারধোরও কর তবুও আমি চিৎকার করেই বলব কাজটা মোটেই ঠিক হয়নি।

ওর্লোভা এবং অন্যান্যরা পিওতরকে শান্ত করে তোলার চেষ্টা করে তবু তার ভিতরকার মানুষটি যেন বলে ওঠে, কী ভাবছো পিওতর? তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য কারো কাছে নেই। দেখতে পাচ্ছ কি না?

পিওতর যেন ক্রমেই অবিচারের শিকার এই আহত সত্তাটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়ছে। বিশাল ভারি দেহখানিকে টানতে টানতে সে চলে যায় টিবির ওপর পাইন গাছের নিচে, সেই আসনটিতে গিয়ে বসে। নিজের আহত সত্তাটিকে নিয়ে আবার ভাবতে বসে। করুণা হয় তার ওপর। যথার্থই ভালো একটি মানুষ, গুণও ছিল। কিন্তু কেউই তাকে বুঝল না, কেউ তার গুণের কদর করল না। তার এই কাল্পনিক সত্তাটি সহজেই রূপ পরিগ্রহ করে সেকথাও পিওতর অনুভব করল। রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনেও হঠাৎ কোথা থেকে একদল সাদা মেঘ এসে যেমন আকাশ ছেয়ে দেয় একান্ত আত্মমগ্ন মুহূর্তেও তেমনি সেই আহত সত্তাটি হঠাৎ আবির্ভূত হয়।

কারখানা ও তার সংলগ্ন আরো যা কিছু গড়ে উঠেছে সেদিকে তাকাতেই সেই সত্তাটি যেন বলে ওঠে, এই জিনিসগুলো বাদ দিয়েও তুমি জীবনটাকে অন্যভাবে গড়ে তুলতে পারতে।

এ তো দেখছি টিখনেরই কথার প্রতিধ্বনি—মিল মালিক পিওতর ভাবে।

হ্যাঁ ফাদার গ্লায়েব, গোরিৎসভিয়েতভও একই কথা বলছিল। মানুষও ঠিক মাছির মতোই। মাকড়সার জালে আটকে গিয়ে মুক্তির জন্যে আঁকুপাঁকু করে।

মিল মালিক উত্তর দেয়, সন্তার জীবন যাপন করতে তুমি পারতে না।

মাঝে মাঝে দুই সত্তার মধ্যে যখন কলহ উগ্র হয়ে ওঠে তখন সেই আহত সত্তাটি নির্মম ভাবে বলে ওঠেঃ মনে নেই মেলায় যখন তুমি আব্রাহামের আইজাককে বলি দেওয়ার কথা বলেছিলে তখন তোমার মনে ছিল পাভ-লুসকাকে নিধনের কথা। সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলাম বলে তুমি আমাকে বোতল ছুঁড়ে মেরেছিলে। আমাকেও তুমি খুন করতে চেয়েছিলে কিন্তু কার জন্যে? নিকিতা যে শিংওলা ভগবানের কথা বলেছিল তার কাছে কি?

এইসব তর্ক-বিতর্ক যখন উত্তপ্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন পিওতর জোর করে চোখ বন্ধ করে রাখে যাতে চোখ থেকে এক ফোঁটাও জল গড়িয়ে না পড়ে। তবু চোখের জলের বন্যা সে আটকাতে পারে না। তারপর চোখের জল মুছে নিয়ে বোতল থেকেই নির্জলা মদ গলায় ঢেলে নেয়।

দুঃখ পেলেও পিওতর তার ভিতরকার আহত সত্তাটিকে কিন্তু পছন্দ করে। ইচ্ছে করলেও তাকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে দিতে পারে না সে। স্নানের সময় সাবানটাকে যেমন পিঠের সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় না হাতও পৌঁছয় না বলে তেমনি তার ওই দ্বিতীয় সত্তাটিও নাগালের বাইরেই থেকে যায়। হঠাৎই এসে হাজির হয়।

হঠাৎ সুদূর সাইবেরিয়ার ওপার থেকে রাশিয়ার ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ নেমে এল। আলেক্সি উত্তেজিত হয়ে খবরের কাগজখানা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, ডাকাতি, লুঠেরা···আমরা ওদের উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব।

অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসা সোনা-বাঁধানো-দাঁত ডাক্তার বলে, সম্ভবত শিক্ষাটা ওরাই আমাদের দেবে।

অবশ্য তামাটে দাড়ির মোটা লোকটার মুখে বাঁকা হাসি খেলছিল। সব সময়েই ওর মুখে এই হাসিটা ফুটে ওঠে। তাস খেলায় হেরে গেলে কিংবা রোগী দেখার সময়েও ওর মুখে এই হাসিটা দেখা যায়। পিওতর এই লোকটাকে মোটেই পছন্দ করে না। ডাক্তারের প্রয়োজন হলে সে বরং জার্মান ডাক্তার ক্রনকেই খবর দেয়।

যেন মাথা ধরেছে সেইভাবে দাড়ি মোচড়াতে মোচড়াতে মীরন উপদেশ

দেবার ভঙ্গিতে বলে, ব্রিটিশদের সঙ্গে জোট বেঁধে এ কাজটা করা উচিত ছিল।

কোন্ কাজের কথা বলছ তুমি? পিওতর প্রশ্ন করে। কিন্তু কি তার ভাই কি তার চালাক ভাইপোটি কেউই বোঝাতে পারে না কেন হঠাৎ যুদ্ধ বাধলো। পিওতর বেশ মজা পায় ভাইয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে। তার ভাবখানা যেন এই, সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যার প্রভূত ক্ষতি হয়ে গেল এই অপ্রত্যাশিত যুদ্ধে। যেন বৃহৎ কোনো উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে এই যুদ্ধ।

একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রা পথ পরিক্রমায় বেরিয়েছে। তাদের সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে: 'হে প্রভু আমাদের রক্ষা কর।' প্রার্থনার সুরটা যদিও দাবির মতোই শোনাচ্ছে। ভুঁড়িওলা পুরোহিতদের পিছনে পিছনে চলেছে দাড়িওলা ব্যবসায়ীর দল। মহাত্মাদের ছবি ও পতাকা নিয়ে চলেছে তারা। শহরের মেয়র ভোরোপোনোভের কণ্ঠস্বর সবাইকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। বাপের সম্পত্তি চলে যাওয়ায় সে আর্টামনোভদের ওপর বৈরিভাব পোষণ করে। বিজাতীয় শত্রুতার ভাবটি সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।

আর্টামনোভ পরিবারের সাতজন চলেছে একসঙ্গে: প্রথমে স্ত্রীর কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে আলেক্সি। তাদের পিছনে ইয়াকভ তার মা ও বোন তাতানিয়া। তারপর মীরন ও ডাক্তার। সবশেষে একা পিওতর।

মীরন মন্তব্য করল, একটা জাতি চলেছে।

ডাক্তার বলল, সেই জাতির শক্তির প্রকাশ।

মীরন আবার বলল, কিছুই হবে না। এই ভিজে মাটিতে আগুন জ্বলবে না।

পিওতর তাকে ধমক দিয়ে বলে, তোমার বকবকানি থামাও।

শোভাযাত্রায় নাতালিয়ার পাশাপাশি চলেছে পমিয়ালোভের মেয়ে। বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেলেও শরীরের বাঁধুনি ঠিকই আছে, তেমনি ঝকঝকে, পিনস্তনী। এরই মধ্যে তিনবার সে বিধবা হয়েছে। শহরে সে মুক্ত জীবন যাপন করে।

পিওতর শুনতে পেল মেয়েটা তার স্ত্রীকে বলছে, তোমার স্বামীটিকে ভাই যুদ্ধে পাঠিয়ে দাও। ওকে দেখলেই শত্রুরা ভয়ে পালিয়ে যাবে।

ইয়াকভের দিকে ফিরে মেয়েটা বলে, এই ছেলে, বিয়ে করছিস না কেন?

পিওতর হাঁটার গতি শ্লথ করে দেয়। সে একটু দূরে দূরে থাকতে চায়। নিষ্কলঙ্ক শুভ্র তুষারের পটভূমিকায় লোকগুলোকে কালো বিন্দুর মতো মনে হয়।

ভেরা পোপোভাও স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে শোভাযাত্রার সামিল হয়েছে। তাকে দেখে পিওতরের মায়া হয়। মেয়েটা স্বেচ্ছায় গরু চরাবার দায়িত্ব নিয়েছে।

তারপর লেফটেনান্ট মারভিনের নেতৃত্বে এক কম্পানি সৈন্য যান্ত্রিকভাবে হেঁটে যায়। এর পর আসে দেমাকী চাল দেখাতে দেখাতে পুলিসের কর্তা নেস্তেরেংকা। শোভাযাত্রার শেষে রয়েছে শহরের লোকেরা।

শহরের লোকদের পিওতর মোটেই দেখতে পারে না। ব্যবসার কাজ ছাড়া শহরে সে খুব কমই যায়। শহরের লোকও তাকে দেখতে পারে না। তাদের ধারণা সে খুব দাম্ভিক। আলেক্সিকে কিন্তু তারা বেশ পছন্দ করে। শহরকে সুন্দর করে তুলবে, পার্ক তৈরি করে দেবে এসব প্রতিশ্রুতি সে দিয়েছে। মীরন ও ইয়াকভকেও ওরা পছন্দ করে না। ওদের মতে ওরা দুজন অত্যন্ত লোভী এবং সবকিছু নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়াই ওদের লক্ষ্য।

পিওতর ভুরু কুঁচকে শোভাযাত্রার মানুষদের পর্যবেক্ষণ করছিল। অনেক মুখই তার অচেনা। তবু সকলের চোখেই সে তার প্রতি অপছন্দের মনোভাব ব্যক্ত দেখতে পাচ্ছে।

আলেক্সির দরজার সামনে টিখন তাকে নমস্কার জানাল।

তাহলে আমরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লাম, কি বল বুড়ো?

আমার তো মনে হয় এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার। টিখন চটপট জবাব দেয়।

তোমার কাছে তো সবই তুচ্ছ।

তা নয়তো কি?

পিওতর আর কিছু না বলে বাড়ি ফিরে এল।

সেরাফিমের মৃত্যুর পর বৈচিত্র্যের আশায় পিওতর আজকাল বিধবা তাইসিয়া পারাক্লিতোভার ঘরে যায়। মহিলাটির ছোট্ট চেহারা, বয়স কত বোঝা মুশকিল। মহিলাটি বেশ শান্ত স্বভাবের এবং সব ব্যাপারেই সে পিওতরকে সমর্থন করে। 'ডিয়ার' বলে সম্বোধন করে বলে, ঠিকই বলেছ।

পিওতর যদিও একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করে তবুও আগের মতো তাড়াতাড়ি নেশা হয় না। নেশা হতে দেরি হওয়ায় তার বিষাদ ও

অপ্রিয় চিন্তাগুলো দূর হতেও দেরী হয়। জীবন ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে তিক্ত চিন্তাগুলো আরো তীব্র হয়ে ওঠে। রাগে তখন চিৎকার করে তাইসিয়াকে বলে, এই, তুই চুপ করে আছিস কেন, কিছু বল্ না?

ছাগলের মতো লাফিয়ে তাইসিয়া পিওত্তরের কোলে এসে বসে। মেয়েটা অদ্ভুত হালকা। কোলে বসে সে একখানা কাগজ থেকে শহরের সব কেচ্ছাকাহিনী পড়তে শুরু করে দেয়।

যত্তো সব নোংরা খবর। পিওত্তর বিরক্ত হয়ে বলে।

শহরের সব কদর্য কেচ্ছাকাহিনী শুনতে শুনতে পিওত্তরের সব গোলমাল হয়ে যায়। শহরের লোকগুলোর ওপর তার ঘৃণা আরো বেড়ে যায়। স্মৃতিতে তখন তার জেগে ওঠে মেলার সেই বাঁধন-ছেঁড়া হুল্লোড়ের দৃশ্যগুলো। উলঙ্গ মেয়েমানুষের জন্যে নোট পোড়ানো। ভাঙচুর…

নানা রঙের মদ খেতে খেতে পিওত্তর অনুভব করে তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতা হল মেলার ওই নির্লজ্জ নারী, টাকার জন্যে যে নিজের শরীর অনাবৃত করে দেখায়। আর তারই জন্যে দেশের নামীদামী লোকেরা বন্য আনন্দে মেতে ওঠে। মেলার ওই সরস মেয়েগুলোর পরিবর্তে তার কোলে কি না এখন বসে রয়েছে একটা কালো ছাগী।

এই জাতীয় আমোদপ্রমোদে অলক্ষ্যে দিন গড়িয়ে যায়। শুধু সময়ের এই পঙ্কিল স্রোতোপ্রবাহের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন দু'একটা ঘটনা ঘটে যা বোধের অগম্য। শীতের সময় খবর এল শ্রমিকরা সেন্ট পিট্সবার্গে জারের প্রাসাদ ভেঙে জারকে হত্যার চেষ্টা করেছিল।

ওরা এবার গির্জা ভাঙবে, কেনই বা ভাঙবে না? ওরাও তো রক্ত-মাংসের মানুষ, লোহা দিয়ে তৈরি নয় নিশ্চয়ই। টিখন মন্তব্য করে।

আবার মহাত্মাদের মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হল। ভোরোপোনোভ মরচেধরা লাল রঙের কোট গায়ে দিয়ে জারের ছবি মাথার ওপর উঁচু করে ধরে ধ্বনি তোলে:

হে প্রভু আমাদের রক্ষা করো!

যদিও সে আগের চাইতে জোরে এবং ক্রুদ্ধস্বরে ধ্বনি দিচ্ছিল তবু 'আমাদের' উচ্চারণের মধ্যে যেন উদ্বেগের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

মাতাল ঝিতাইকিন তার লাল টাক মাথা নিয়ে ও হাতে একটি দো-নলা বন্দুক নিয়ে চামড়ার কারখানার শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, আমাদের রাশিয়াকে ইহুদিদের হাতে তুলে দেব না। রাশিয়া কাদের? —আমাদের।

চামড়া-শ্রমিকেরা গলা মিলিয়ে বলে, 'আমাদের'। পুরনো শত্রু তাঁতিদের দেখে চামড়া-শ্রমিকেরা তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করে। ডাক্তার ইয়াকভলিয়েভকে তারা লাঠি দিয়ে আঘাত করে আর ওষুধের দোকান-গুলোকে ওকার জলে ফেলে দেয়। বুড়োর ছেলেকে ঝিভাইকিন সারা শহর তাড়া করে বেড়াল, দুবার গুলিও ছুঁড়ল যদিও গুলি তার গায়ে না লেগে এক দর্জিকে আহত করল।

কারখানার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। তরুণ শ্রমিকরা জামার আস্তিন গুটিয়ে ছুটল শহরের দিকে। মাঁরনের শাসানি, বিজ্ঞ লোকের পরামর্শ কিংবা মেয়ে-দের চোখের জল কোনোকিছুই তাদের আটকাতে পারল না।

প্রাণহীন মরুভূমির মধ্যে শূন্য হয়ে গেল কারখানা। মানুষের বিদ্রোহের মতো হাওয়া তীব্র বেগে দেয়ালে ছিটিয়ে দিচ্ছে বরফ। চিমনিগুলোকে বরফে ঢেকে দিচ্ছে পরমুহূর্তেই আবার বরফ গলে, জলে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিচ্ছে।

জানলার কাছে বসে শূন্য দৃষ্টিতে পিওতর দেখছিল কালো পিঁপড়ের মতো জনস্রোত। শহরে চলেছে সবাই। কাচের জানলার ফাঁক দিয়ে ওদের চিৎকারের শব্দ ভেসে আসে। মনে হয় ওরা বেশ খুশ মনেই আছে। বাতাসে বয়ে আনে শহরের চাপা কোলাহল। মনে হয় যেন কেটলিতে জল ফুটছে। বিশাল এক কেটলিতে হ্রদের সব জলটাই যেন ফুটছে।

এদিকে আলেক্সির ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ওর্লোভা শহর থেকে ফিরল। শালে গোটা দেহ আবৃত ওর্লোভার। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল সে। পায়ের ব্যথা ভুলে পিওতর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ওর্লোভার কাছে।

উদ্বেগে সে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

মুরগীর মতো ওর্লোভার সারা শরীরটা কেঁপে উঠল।

চামড়া-শ্রমিকেরা আমাদের জানলা ভেঙে দিয়েছে।

ওর্লোভাকে যাবার পথ করে দেয় পিওতর। তার মুখে বিচিত্র এক টুকরো হাসি খেলে যায়। মৃদু স্বরে বলে, আমার ওপর তো সবাই হম্বিতম্বি করতো। এখন ফলটা দেখ। না, জারের···

পিওতরকে থামিয়ে দিয়ে তার পক্ষে অস্বাভাবিক উঁচু গলায় ওর্লোভা বলতে থাকে, থামুন! জারের কথা আর বলবেন না। আপনার জার মোটেই ভালো লোক নন।

পিওতর বিরক্তি প্রকাশ করে বলে, তুমি দেখছি জার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানো।

শান্ত স্বভাব, পরের সমালোচনায় অনিচ্ছুক চশমা পরিহিতা ছোট্ট চেহারার ভ্রাতৃবধূর উষ্মা ও উত্তেজনা দেখে পিওতর অবাক হয়। তার কথার মধ্যে সততাও রয়েছে যদিও এ ক্রোধ প্রকাশ অর্থহীন। হাতীর পায়ের তলায় ইঁদুর চাপা পড়লে হাতীর কি করার আছে? আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে বসে পিওতর নীরবে চিন্তা করছিল।

অনেকদিন পর ওর্লোভার সঙ্গে তার দেখা হল। তার কারণ মীরনের সঙ্গে ঝগড়া হবার পর থেকে ওর মুখদর্শন করতে চায় না বলেই সে আলেক্সির বাড়ি যায়নি অনেকদিন।

ঘটনাটি ঘটেছিল এইভাবে।

গ্রীষ্মের শেষ দিকে যখন পা ফুলে যাওয়ায় সে শয্যাশায়ী ছিল সেই সময়ে একদিন শহরের মেয়র ভোরোপোনোভ তার কাছে সই সংগ্রহ করতে আসে। জারের কাছে এই মর্মে একটি আবেদন পত্র পাঠানো হবে যাতে তিনি তাঁর ক্ষমতা কারো কাছে হস্তান্তর না করেন। এই আবেদন পত্রে সই করার অনুরোধ নিয়েই ভোরোপোনোভ এসেছিল। পিওতর যদিও মেয়রের দুঃসাহস দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছিল তবু কিন্তু সে সই দিয়েছিল। সই দেবার কারণ কিন্তু ভাই এবং ভাইপোকে চটিয়ে দেওয়া। ভোরোপো-নোভও যে সেন্ট পিট্‌সবার্গ থেকে তিরস্কৃত হবে এ ব্যাপারেও পিওতর নিশ্চিত। মনে মনে সে বলল, মোটা ঠোঁট বোকাটা তোমার এসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

কাগজখানা পকেটের মধ্যে রেখে কোটের প্রত্যেকটি বোতাম আটকে মেয়র আলেক্সি, মীরন ও ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে। জ্ঞানতই হোক অথবা অজ্ঞতাবশতঃই হোক এরা জারের বিরুদ্ধাচরণ করছে। পিওতর এই অভিযোগগুলো বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল, মন খুশিতে ভরে উঠেছিল কিন্তু ভোরোপোনোভ যখন ভেরা পোপোভার বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনল তখন পিওতর আপত্তি জানাল।

না না, ভেরা পোপোভার এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

সম্পর্ক নেই বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? আমরা ভালো-ভাবেই জানি···

আপনি কিছুই জানেন না।

আপনি ঘোড়ায় চেপেছেন পড়ে যাবার জন্যে—মেয়র বিদায় নেবার সময় যেন শাসিয়ে গেল।

সেদিন বিকেলে মীরন আর মেয়ে তাতানিয়া কুকুরের মতো তার ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার বয়সকে এতটুকু সমীহ করল না তারা।

এ তুমি কী করেছ বাবা? তাতানিয়ার মুখখানা উন্মাদিনীর মতো কদর্য হয়ে উঠল। ইয়াকভ জানলার পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল। পিওতরের মনে হল ছেলেও বোধহয় তার বিপক্ষে।

মীরন উদ্ধত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল, আপনি কি পড়ে দেখেছেন কাগজটায় কি লেখা ছিল?

না, আমি পড়ে দেখিনি তবে আমি জানি ওতে লেখা ছিল যে এঁচড়ে-পাকা ছেলেদের বেশি বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

মীরন ও তাতানিয়াকে রাগে জ্বলতে দেখে তার ভালোই লাগছিল কিন্তু ইয়াকভের নীরবতাই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছেলের ব্যবসাবুদ্ধির ওপর তার আস্থা আছে তাই তার অনুমান সম্ভবতঃ সে হয়তো ছেলের স্বার্থে আঘাত দিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তার আত্মমর্যাদা বোধ বাধা দিচ্ছে ছেলেকে প্রশ্ন করতে। এই বিবাদের মধ্যে ছেলেকে সে জড়াতে চায় না। তাই মীরন যখন তার লম্বা নাকটি ওপরের দিকে যান্ত্রিক ভাবে অভিযোগ করে যাচ্ছিল তখন বিরক্তি প্রকাশ করা ছাড়া তার আর কিছুই করার ছিল না।

আপনার জানা উচিত যে জারকে ঘিরে রয়েছে কতকগুলো পাকা জোচ্চোর। এই লোকগুলোকে হটিয়ে তার জায়গায় সৎ লোক আনতে হবে।

পিওতর ভালোভাবেই জানে সৎ লোকেদের মধ্যে মীরন নিজেই একজন প্রার্থী। জারের পার্ষদদের একটি পদের দিকে মীরনের নজর রয়েছে। পিওতর এও জানে যে আলেক্সির ঘন ঘন মস্কো যাবার কারণ আর কিছুই নয় ছেলেকে রাজকীয় বিধান পরিষদের সদস্য করার জন্যে উমেদারী করতে যাওয়া। ওরা মোটেই জারের বিরুদ্ধবাদী নয়, জারের স্তাবক ও পরামর্শ-দাতাদের বিরুদ্ধেই ওদের ক্ষোভ। কিন্তু তার মতে ভাইপোকে অমন একটি পদ দেওয়া যেমন বিপজ্জনক তেমনি হাস্যকর।

আকস্মিকভাবে আলেক্সি আলুথালু বেশে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরে প্রবেশ করে পিওতরকে ধমকাতে শুরু করল। চাকরকে মনিব যেভাবে কৈফিয়ত তলব করে সেইভাবে আলেক্সি বলল, পাগলের মতো কি সব করে চলেছ এখানে বসে?

পিওতরও ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে চিৎকার করে বলল, কে হে তুমি আমাকে বক্তৃতা শোনাতে এসেছ! জাহান্নামে যাও সব! বেরিয়ে যাও এখান থেকে সবাই!

ভয়ঙ্কর এই ক্রোধের প্রকাশে পিওতর নিজেও খানিকটা ভয় পেল।

এখন ওর্লোভার সরস ভঙ্গিতে বলা শহরের দাঙ্গার খবর শুনতে শুনতে সে সেদিনের ঝগড়ার কথা ভাবছিল। সেদিনের অন্যায়টা কার? তার না ওদের?

গোড়ার দিকে ওর্লোভার শিশুসুলভ ক্রোধ তার বিরক্তি উৎপাদন করলেও এখন তার শান্ত কথা বলার ভঙ্গি তাকে স্পর্শ করল।

ওর্লোভা বলছিল, তাঁতিরা আমাদের প্রিয়জন। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন কি ভাবে ওরা ভোরোপোনোভের লোকদের ও চামড়া-শ্রমিকদের তাড়াতে সক্ষম হয়েছে। ওরাই এখন আমাদের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।

নাতালিয়া এমনিতেই ভয় পাওয়ার জীব। রাগে ফেটে পড়ল সে।

হাঙ্গামা তো শুধু তোমাদের বাড়িতেই হয়েছে। এটা তোমাদের পাওনা ছিল। এসব তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল।

হন্তদন্ত হয়ে মীরন ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে গুরুজনদের সম্বোধন করে সৌজন্যসূচক যে কথাটি বলতে হয় অর্থাৎ কেমন আছেন তা সে বলল না। এলোমেলোভাবে সে শুধু ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পায়চারি করতে লাগল :

ভোরোপোনোভ ও ঝিতাইকিন জাতীয় লোকদের দাঙ্গা বাধাবার জন্যে শাস্তি ভোগ করতে হবে বলে দিচ্ছি আমি। ওদের কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। ইলিয়া আর বন্ধুরা এমনিতেই যথেষ্ট বিপ্লবের উস্কানি দিচ্ছে তারপর যদি আবার…।

পিওতর মীরনের এইসব আস্ফালনের কোনো উত্তর দিল না। ভোরোপোনোভের আবেদন পত্রে সই দেবার পর যে তিক্ত ঘটনা ঘটেছিল তার পর থেকেই মীরন তার চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে যদিও সে জানে ব্যবসার কর্তৃত্ব এখন মীরনের হাতে চলে গিয়েছে। বড় বড় শহরের তুলনায় এখানকার শ্রমিক-অসন্তোষ কম হলেও ওদের সামলানো বেশ কঠিন। মীরন বেশ দক্ষতার সঙ্গে সব কিছু নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। শ্রমিকেরা ভয়েই হোক অথবা ভক্তিতেই হোক মীরনকে মান্য করে চলে।

বাতাস রুদ্ধ ফলে তুষারের ঘন স্তূপে সব কিছু ঢাকা পড়েছে। তীব্র বেগে নেমে আসছে তুষারের পুঞ্জ। মোটা সাদা কাপড়ের পর্দার মতো জানলার কাঁচ ঢেকে গেছে সাদা আবরণে। কারখানার উঠোনও আর দেখা যায় না। পিওতরের সঙ্গে কেউ এখন আর কথা বলে না। সে ভালো-

ভাবেই জানে সবাই তাকেই দায়ী করছে যা কিছু অঘটন ঘটছে তাদের জীবনে। একমাত্র ব্যতিক্রম তার স্ত্রী। জারের অবিচার, অদ্ভুত আচরণ এমন কি প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যেও যেন সে-ই দায়ী।

নাতালিয়া উদ্বেগে জিজ্ঞাসা করে, ইয়াকভ কোথায়?

জ্যাঠাইয়ের দিকে না তাকিয়েই মীরন ঘৃণায় নাক কুঁচকে বলে, কোথায় আবার থাকবে? আছে শহরের সেই মুরগীর খাঁচায়।

নাতালিয়ার উদ্বেগ আরো বেড়ে যায়। সরল মনেই সে প্রশ্ন করে, কি বললে তুমি? কোথায় আছে সে?

পিওতর মনে মনে বলে, বেচারা বোকা মেয়েমানুষ। ইয়াকভের যে একটি রক্ষিতা আছে সে খবরও রাখে না।

হঠাৎ সে দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠে, শোনো, তোমরা যার যেমন খুশি চলতে পারো। আমার সোজা কথা, তোমাদের আমি বুঝতে পারি না। আমি বৃদ্ধ হয়েছি···শয়তানের খেলায় আমার কোনো আগ্রহ নেই। সুদীর্ঘ সময় পার হয়ে এসেও আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

চতুর্থ খণ্ড

ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত ইয়াকভের জীবন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও স্বাস্থ্যে কেটেছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে অস্বস্তিকর কোনো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন তাকে হতে হয়নি। কিন্তু যে মানুষ শান্তিতে জীবন কাটাতে চায় একসময় তারও শত্রু এসে জীবনটাকে তছনছ করে দেয়। এক জটিল আবিলতায় ভরা খেলায় যুক্ত হতে হয় তাকে। শহরের সেই হাঙ্গামা যা জনজীবনে বিরাট আলোড়ন এনেছিল তার তিন বছর পরে এপ্রিল মাসের এক রাত থেকেই তার এই নতুন জীবনের শুরু।

পরিতৃপ্তির আমেজে ইয়াকভ সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে সিগারেট খাচ্ছে এবং [illegible] তার মন কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত। এ এক বিরল অনুভূতি। এই অনুভূতিটাকেই সে জীবনের পরম সম্পদ মনে করে। এরই মধ্যে যেন জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। সম্ভোগের ফলেই হোক কিংবা মনের মতো আহারের ফলেই হোক এই অনুভূতিটিকে ফিরে পেলে জীবনটা অবিমিশ্র আনন্দের আধার হয়ে ওঠে।

ঘরের ঠিক মাঝখানটায় টেবিলের পাশে বসে আছে এক তন্বী নারী। নিটোল তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কফির পাত্রের তলায় স্পিরিট ল্যাম্পের বেগুনী শিখার দিকে সে চিন্তামগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। লাল আবরণীর মধ্য দিয়ে আলো এসে পড়ায় তার নগ্ন বাহু ও ছেলেমানুষী মুখে লেগেছে পেস্ট্রীর রং। ছবির মতো তার গলায় ও ঘাড়ের ওপর অবিন্যস্ত চুল ঝুলে পড়েছে। মেয়েটির নাম পলিনা। নগ্ন দেহের ওপর সোনালী হলুদ রঙের বোখারা ড্রেসিং গাউন সে পরেছে আর পা ঢুকিয়ে দিয়েছে সবুজ মরক্কো চামড়ার চটিতে। ওর মধ্যে যেন এক আশ্চর্য অ-রুশীয় লঘুতা আছে। কিশোরের মতো নমনীয় তার মুখ, ঠোঁট দুটি রসসিক্ত আর চোখ দুটি চেরির মতো সুগোল ও আকর্ষণীয়। ইয়াকভ এ পর্যন্ত যত মেয়ের সংস্পর্শে এসেছে নিঃসন্দেহে পলিনা তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা। কিছু বোকামি না থাকলে ওকে অতুলনীয়াই বলা যেত।

ইয়াকভ তাকে আদর করে ডাকে 'আমার ছোট্ট কমলালেবু'। সিগারেটের ঘন ধোঁয়ার মধ্য থেকে পলিনাকে আদরের নাম ধরে ডেকে বলে, আমার এখন কফি চাই না।

ওর দিকে না তাকিয়েই পলিনা বলে, আর আমার ?

তোমার কি চাই তার আমি কি জানি ?

নিশ্চয়ই জানো। পলিনার তাৎক্ষণিক উত্তর। তারপর তার মুখ থেকে কথা বেরিয়ে আসে স্রোতের মতো। দু-এক মিনিট তার খোঁচা দেওয়া কথাগুলো শোনার পর ইয়াকভ সোজা হয়ে বসে সিগারেটটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জুতো দিয়ে ঘষতে ঘষতে বলে, আমার ভালো মুডটাকে নষ্ট করে দেওয়ার তোমার এই প্রবণতার মানে বুঝতে পারি না আমি। তুমি ভালো করেই জানো বাবার মৃত্যুর আগে তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারি না।

হ্যাঁ, খুশির মেজাজটাই শুধু তোমার কাম্য তা আমি জানি। মাকড়সা কোথাকার ! খুশির মেজাজের জন্যে তুমি আমাকে একজন তাতারের কাছেও বেচে দিতে পারো। আত্মসম্মান বোধ জিনিসটাই তোমার মধ্যে নেই।

ইয়াকভ তাকে এই মাকড়সা বলে ডাকাটাই সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে। মন ভালো থাকলে পলিনা তাকে আদর করে 'নুনের কণা' বলে ডাকে। আজ অন্ততঃ ইয়াকভ আশা করেছিল পলিনা তাকে ওই নামে ডাকবে এবং ঝগড়াঝাঁটি করবে না কারণ ঘন্টা দুই আগেই সে তাকে দুশো রুবল দিয়েছে।

যতই ঝগড়া কর না কেন আজ আর তুমি কিচ্ছু পাচ্ছ না।

শান্ত অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে কথা ক'টি বলে সে টুপিটা মাথায় চাপিয়ে বলল, চললাম আমি।

শুয়োর কোথাকার ! সারা ঘরে সিগারেটের টুকরো ছড়িয়ে গেল।

রাস্তায় জোলো বাতাস বইছিল। কালো মেঘের ছায়া পড়েছে রাস্তায়। বোধহয় ডোবাগুলো সব ভরে গিয়ে রাস্তা ভাসিয়ে দেবে। মাঝে মাঝেই মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ উঁকি মারছে। চাঁদের আলোয় বরফে ঢাকা ডোবাগুলো রূপোর মতো চকচক করছে। এ বছর শীত যেন জেদ ধরেছে বসন্তকে কিছুতেই সে আসতে দেবে না। কয়েকদিন আগেই ঘন তুষারপাত হয়েছে।

বগলের তলায় ছড়িখানা গুঁজে, দু হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ইয়াকভ ভাবছিল মানুষের কত রকম বোকামি হতে পারে। ওই পলিনার কথাই ধরা যাক। কিসে তার অভাব ? মাসে একশো রুবল খরচ করে। এটা সেটা উপহার তো পেয়েই চলেছে। চিন্তাভাবনাহীন মুক্ত জীবন যাপন করে চলেছে। আর কি চাওয়ার থাকতে পারে ? তবু কেন বিয়ের জন্যে এত তাগাদা ?

'আচারের পাত্রে বোকা নেংটি ইঁদুর সব।' তার নিজের আবিষ্কার আর সেই কারণেই এই বচনটি তার খুব প্রিয়। জীবনটা তার কাছে সহজ জিনিস। যা তার আছে তার চেয়ে বেশী দাবী করে না। সকলেরই জীবনের একটি লক্ষ্য এবং তা হচ্ছে পরিপূর্ণ শান্তি। দিনের কর্মব্যস্ততা আসলে রাত্রির প্রশান্তিরই ভূমিকা তবু যে তার কাছের মানুষগুলোর মধ্যে বোকামির প্রকাশ পাচ্ছে তার কারণ অপরের তুলনায় নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করার অহমিকা। এক রকম অন্ধতা সবাইকে পেয়ে বসেছে। নিজেকে অপরের চাইতে স্বতন্ত্র প্রমাণ করার চেষ্টা।

ইলিয়ার কথাই ধরা যাক। তার বোকামির কারণ সে বইয়ের পোকা, সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। বর্তমানে সে সাম্যবাদীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ইয়াকভকে তার কাছে কম অপমান সহ্য করতে হয়নি তবু কিছুদিন আগে বাধ্য হয়েই সাইবেরিয়ার কোনো এক জায়গায় ভাইকে টাকা পাঠাতে হয়েছে তাকে। মায়ের হাস্যকর বোকামি তো এক কথায় অসহ্য। আর মদ্যপ, স্থূল, অপরিচ্ছন্ন, কারো সঙ্গে বনিবনা নেই তার বাপকে তো একটা বুড়ো ভালুক মনে হয়। সদা ব্যস্ত তার কাকা রাজদরবারের সদস্য হবার জন্যে দুনিয়ার লোককে তোয়াজ করে চলেছে। বৃদ্ধা বেশ্যার মতো তার আচার-আচরণ। আর লম্বা নাক মীরনের বোকামি দেখে তো মনে হয় শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। নিজেকে সে রাশিয়ার সর্বোত্তম মানুষ মনে করে। একজন ভাবী মন্ত্রী হিসেবেও নিজেকে ভাবতে শুরু করেছে সে। শ্রমিকদের তোয়াজ করার জন্যে নিত্য নতুন আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করে যাচ্ছে। নেকড়েকে চুল্লু খাইয়ে বশ করার চেষ্টা আর কি।

শ্রমিকদের সম্পর্কে চিন্তাই তাকে বেশি উদ্বিগ্ন করে তুলেছে কারণ প্রায় প্রতিদিনই তাদের সঙ্গে তার সংঘর্ষ ঘটছে। সেই ছেলেবয়স থেকেই ওদের সঙ্গে তার একটা শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একটা সময় গেছে যখন নারীঘটিত ব্যাপার নিয়ে তরুণ শ্রমিকদের সঙ্গে তার তীব্র সংঘর্ষ ঘটত। রাতের অন্ধকারে বারকয়েক তাকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়া হয়েছে। দু'বার কেলেঙ্কারি চাপা দেওয়ার জন্যে মাকে টাকা খরচ করতে হয়েছে।

ছেলেকে শুধরোবার জন্যে নাতালিয়া বেশ কয়েকবার তিরস্কার করেছে। কেন তুমি এমন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছ? আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, বিয়ে হলেই তো একটি মেয়ের সঙ্গে ঘর করতে পারবে। এভাবে চললে তোমাকেও ইলিয়ার মতো দূর করে দেবেন তোমার বাবা।

হাঙ্গামা চলাকালীন ওই দু-তিন বছর সে নিজেদের কারখানায় কোনো

বিপদের সম্ভাবনা দেখেনি। তবু মীরনের বাগাড়ম্বর ও কাকার উদ্বিগ্ন হয়ে খবরের কাগজ পড়া দেখে একটা সন্দেহ তার মনে দানা বাঁধে। নিজে খবরের কাগজ পড়ায় আগ্রহী না হলেও সে জানতে পারে শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশই জোরদার হচ্ছে, বিধান পরিষদে শ্রমিক নেতাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা খবরের কাগজগুলো ছাপছে। এসব শুনে শ্রমিকদের সম্পর্কে তার শত্রু-মনোভাব আরো বেড়ে যায়। আরো অস্বস্তিকর ব্যাপার হচ্ছে কারখানা চালাতে গেলে এদের ওপর নির্ভর করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। তবে হাসিঠাট্টা দিয়ে অস্বস্তিকর মনোভাব চাপা দেওয়ায় সে নিজেকে বেশ পটু করে তুলেছে এই ভেবে সে কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। পরক্ষণেই কিন্তু তার মনে হয় ওপরদৃষ্টিতে সবকিছু মোটামুটি মন্দ নয় গোছের চললেও অদৃশ্যে কোথায় যেন ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছে, যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, জীবনের ওপরেও আঘাত নেমে আসতে পারে।

ইয়াকভের স্থির বিশ্বাস মানুষ আসলে সহজ সরল জীব। বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় জীবনকে সংক্ষুব্ধ করে তুলতে কেউ চায় না। এই বিষাক্ত ভাবনাগুলো মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরেরই জিনিস তবু কিভাবে যে তারা সংক্রামিত হয়ে ওঠে বোঝা ভার। এইসব ভাবনার সঙ্গে পরিচয় না থাকাই ভালো কিন্তু নিজে ভাবতে না চাইলেও অন্যেরা যে ভাবছে তা ইয়াকভ জানে। যদিও এগুলো তার মতে মানুষের বোকামি।

তার পরিচিতদের মধ্যে একমাত্র বুড়ো টিখনকেই বিজ্ঞ মনে হয়। তার সব কাজ ও আচার-আচরণের মধ্যে এমন একটা নির্বিকার ভাব রয়েছে যা মনে ঈর্ষা জাগায় এমন কি ঘুমোবার সময়েও টিখনের বিজ্ঞতা প্রকাশ পায়। বালিশের সঙ্গে কানটা এমন ভাবে চেপে রাখে যেন কোথাও কোনো শব্দ হলে তার কান ঠিক ধরে ফেলবে।

ইয়াকভ একদিন প্রশ্ন করেছিল, তুমি স্বপ্ন দেখ?

টিখন উত্তপ্ত হয়ে জবাব দিয়েছিল, কেন, স্বপ্ন দেখতে যাবো কেন? আমি কি মেয়েমানুষ?

এই উত্তরের মধ্যে ইয়াকভ অনুভব করে মানুষটার মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রচণ্ড শক্তি লুকিয়ে আছে যার ফলে কোনো অবস্থাতেই তাকে টলানো যায় না।

'মেয়েরাই স্বপ্ন দেখে—কথাটা মনে পড়লেই ইয়াকভের হাসি পায়। কাকা আলেক্সির বাড়িতে রাতদিন যে তর্ক-বিতর্ক চলে তাও তো স্বপ্ন দেখারই নামান্তর। তুলনার কথা মনে আসতেই সে বেশ মজা পায়।

তলিয়ে ভাবনা চিন্তা করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তাই যখনই সে কোনো অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখনই মাথা নিচু করে পায়ের দিকে চোখ রেখে হাঁটতে থাকে। দেখে মনে হয় একটা ভারী বোঝা বুঝি সে বহন করছে। পলিনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে এইভাবেই হাঁটছিল বলে সে খেয়াল করেনি যে একটি ধূসর মূর্তি তাকে অনুসরণ করছে। সেই ধূসর মূর্তির একখানা হাত ঠিক মাথার ওপর উঠে এলেই তার খেয়াল হয়। ঝপ করে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। মুহূর্তেই পকেট থেকে রিভলভার বের করে লোকটার পা লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। শব্দটা হল ক্ষীণ কিন্তু দেখা গেল লোকটা একটা বেড়ায় ধাক্কা খেয়ে গোঙাতে গোঙাতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

সে যে কতটা ভয় পেয়েছে এতক্ষণে সে বুঝল। সত্যি কথা বলতে কি সে চিৎকার করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। হাত দুটো তার ঠকঠক করে কাঁপছে। পা দুটো এতই অসাড় হয়ে গেছে যে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। ঠিক দু' গজ দূরে টুপিহীন কোঁকড়ানো চুলওলা লোকটাও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

রিভলভার তুলে রুক্ষ স্বরে ইয়াকভ বলে, শয়তান, তোকে আমি গুলি ছুঁড়ে শেষ করে দেব।

লোকটা গোঙাতে গোঙাতে বলল, গুলি তো আপনি ইতিমধ্যেই ছুঁড়ে ফেলেছেন।

এতক্ষণে ইয়াকভ লোকটাকে চিনে ফেলেছে। ও, তুমি সেই নচ্ছার নস্কভ!

ভয়টা খুব তাড়াতাড়ি দূর হয়ে যেতেই ইয়াকভ স্বস্তির আনন্দ উপভোগ করে। একই সঙ্গে দুটি চিন্তা তাকে খুশি করে। প্রথমতঃ লোকটা কারখানার কেউ নয়, দ্বিতীয়তঃ, অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পেরেছে। নস্কভ অবিবাহিত, শিকার আর বিবাহ উৎসবে বাজনা বাজানো তার পেশা। এই রাতের আগে পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ আছে শোনা যায়নি।

ইয়াকভ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তোমার মতলবটা কি শুনি?

মতলব আবার কি? একটু মজা করতে গিয়েছিলাম। তোমাকে ভয় দেখাতে গিয়েছিলাম। আর তুমি কি না সোজা গুলি করে বসলে? আমি নিজেই তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

বিজয়ীর হাসি হেসে ইয়াকভ বলল, ভয় পেয়ে গিয়েছিলে? চল, এবার

থানায় যাই।

কি করে যাব ? তুমি তো আমাকে খোঁড়া করে দিয়েছ।

টুপিটা তুলে নিয়ে টুপির ভেতরটা একবার দেখে নিয়ে নস্কভ বলল, তবে আমি পুলিসকে ভয় পাই না।

দেখা যাবে থানায় গেলে কি হয়। উঠে পড় এবার।

নস্কভ আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলল, পুলিসকে আমি ভয় পাই না। কি করে তুমি প্রমাণ করবে যে আমি তোমাকে আক্রমণ করেছিলাম। এমন তো হতে পারে যে তুমিই ভয় পেয়ে আমাকে গুলি করেছ। ব্যাপারটা ভালো করে ভেবে দেখা দরকার।

ইয়াকভ নস্কভের স্থৈর্য দেখে বিস্মিত হয় তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে ব্যঙ্গ করে বলে, প্রথম কারণটি তো বুঝলাম। দ্বিতীয় কিছু আছে না কি ?

হ্যাঁ, আছে। আমি তোমার কাজে লাগতে পারি।

রূপকথার গল্প শোনাচ্ছ নাকি ? রিভলভারটি নস্কভের মুখের কাছে এনে ইয়াকভ বলে, তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

নস্কভ একবার চোখ তুলে আবার নামিয়ে নিয়ে বলতে থাকে, গণ্ডগোল পাকিয়ে লাভ নেই তো কিছু। তোমার টাকার জোর থাকলেও কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। আমি তো স্রেফ মজা করছিলাম। তোমার বাবাকেও আমি চিনি। তাঁকে অনেকবার বাজনা শুনিয়েছি।

নস্কভ নিচু হয়ে প্যান্টের পা গুটিয়ে ওপরে তুলতে থাকে তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে হাঁটুর ওপর আঘাতের জায়গাটা বাঁধতে শুরু করে। পিস্তলের নলের মুখে দাঁড়িয়ে নস্কভের শান্ত নির্বিকার ভাব দেখে ইয়াকভ বিস্মিত হয়। ওর এই অদ্ভুত আচরণে ইয়াকভের সাহসও কমে যায়।

ইয়াকভ ভাবছিল চৌকিদারকে ডেকে লোকটার দিকে নজর রাখতে বলবে আর নিজে চলে যাবে থানায়। কিন্তু সিদ্ধান্তটি সঠিক কি না তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। নস্কভ যদি থানায় গিয়ে বাবার সঙ্গে বিধবা মহিলার সম্পর্কের কথা বলে দেয় তাতে কেলেঙ্কারি বাড়বে বই কমবে না।

এদিকে রাত গভীর হচ্ছে, শীত বাড়ছে। থানা এখান থেকে অনেক দূর। সেখানে সবাই এখন হয়তো গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। কী করা উচিত স্থির করতে না পারায় ইয়াকভ ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে।

হঠাৎ নস্কভের এক কথার ধাক্কায় ইয়াকভ চমকে ওঠে।

আপনাকে তাহলে আসল কথাটা বলেই ফেলছি যদিও কথাটা গোপনীয়। আমি যে এখানে বাস করছি তা তোমারই ভালোর জন্যে কারণ

কারখানার শ্রমিকদের গতিবিধির ওপর নজর রাখাই আমার কাজ। ওদেরই একজনকে আমি ধরতে গিয়েছিলাম কিন্তু ভুল করে তোমাকেই···

মিথ্যে কথা। ওদের ওপর নজর রাখার তোমার দরকারটা কি?

তুমি কিছুই খবর রাখ না। তোমার বাবা যে বিধবাটির কাছে যান তারই স্নানবাড়িতে রোজ সাম্যবাদীরা মিলিত হয়। সেখানে তারা নানা বিষয়ে আলোচনা করে এবং বিপ্লব সংক্রান্ত বই পড়াশোনা করে।

নস্কভের কথা মনে মনে বিশ্বাস করলেও ইয়াকভ বলে, সব বানানো কথা। কারা জড়ো হয় সেখানে?

তাদের নাম আমি বলব না। যখন ধরা পড়বে তখনই জানতে পারবে। আপাততঃ আমার ছড়িটা তুলে দাও আর পাটা সারাবার জন্যে কিছু টাকা দিও।

ছড়িতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নস্কভ শহরতলীর অন্ধকার ঘরগুলোর দিকে এগুতে লাগল। কয়েক পা গিয়ে সে ঘনিষ্ঠ সুরে ডাকে, ইয়াকভ পেত্রোভিচ!

ইয়াকভ এগিয়ে যায়। নস্কভ তখন বলে, আজকের ঘটনাটা যেন কেউ জানতে না পারে···বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই।

ইয়াকভকে প্রচণ্ড ধাঁধার মধ্যে ফেলে রেখে নস্কভ ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে চলে গেল। ইয়াকভকে এখন একসঙ্গে অনেকগুলো দিকে ভেবে নিতে হচ্ছে। প্রথমতঃ এখনই বোঝা দরকার তার চালে কোনো ভুল হয়নি। যদি নস্কভ সত্যি সত্যিই সোস্যালিস্টদের ওপর নজর রাখার কাজ করে তাহলে ওকে আমাদের খুবই প্রয়োজন। কিন্তু যদি পালাবার জন্যে এই কথাগুলো ও বানিয়ে বলে থাকে তাহলে তো পরে প্রতিশোধও নিতে পারে। এমনও হতে পারে তাকে খুন করার জন্যে শ্রমিকরা ওকে লাগিয়েছিল। শ্রমিকদের মধ্যে গুণ্ডা বদমায়েস অবশ্যই অনেক আছে কিন্তু ওদের মধ্যে কেউ কেউ সোস্যালিস্ট বিশ্বাস করা শক্ত। শ্রমিকদের মধ্যে যারা সম্ভ্রান্ত যেমন সিয়েডভ, ক্রিকুনভ, ম্যাসলভ তারা নিজেরাই তো একবার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিল একজন শ্রমিককে বরখাস্ত করতে কারণ প্রায়ই সে শান্তি ভঙ্গ করে। এখন তার মনে হচ্ছে নস্কভ মিথ্যা কথাই বলেছে। মীরনকে কি সব বলা উচিত?

মীরনকে বললে ফল কি দাঁড়াবে তা ভাবলেই ভয় লাগে। জজের মতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করবে মীরন তারপর বিদ্রূপের হাসি হাসবে। একটা না একটা ত্রুটি বের করে দুষবে তাকে। তাকে নিয়ে মজা করার একটা সুযোগ

মীরনের হাতে এইভাবে তুলে দেওয়া হবে। অতএব ইয়াকভ মুখ বন্ধ করে রাখাই স্থির করল তবে নস্কভকে মন থেকে দূর করতে না পেরে অসুস্থ ও বিমর্ষ হয়ে রইল। ছুটির পর কারখানা থেকে যখন শ্রমিকরা বেরিয়ে আসে তখন ইয়াকভ প্রত্যেককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আর ভাবে এদের মধ্যে কে কে সোস্যালিস্ট হতে পারে।

কয়েকদিন পরে গোয়েন্দা বিভাগের নেস্তেরেংকার সঙ্গে তার দেখা। ইয়াকভ তাকে বলে, আপনি যে এখানে আছেন জানতাম না তো।

নেস্তেরেংকা বলল, কয়েকদিন হলো এসেছি, বৌয়ের শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে কি না।

আপনি নস্কভকে চেনেন?

কে নস্কভ।

ওই যে শিকার করে বেড়ায়।

নেস্তেরেংকা বলল, হ্যাঁ, লোকটাকে দেখেছি বনে বনে ঘুরে বেড়াতে। বলেই গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ইয়াকভের দিকে তাকায়। ইয়াকভ তখন সেই রাতের ঘটনা সবিস্তারে বলে ফেলে।

পুলিসে খবর দাওনি কেন? তোমার কর্তব্য ছিল পুলিসকে জানানো।

তারপর ইয়াকভের কাঁধে সস্নেহে একখানা হাত রেখে বলে, তুমি আমাকে কথা দাও একথা তুমি আর কাউকে বলবে না। কথা দিচ্ছ তো? তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, বুঝতে পারছো তো?

ধরে নাও নস্কভ নিজের পায়ে নিজেই গুলি করেছে। ও নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার কি?

ইয়াকভ খুশি হয়ে ভাবছিল লোকটা কী দ্রুত মুখের চেহারা পাল্টাতে পারে। যাই হোক ইয়াকভ বেশ হালকা মন নিয়ে বাড়ি ফেরে। সেদিন সন্ধ্যায় কাকা যখন একটা কাজের জন্যে শহরে যেতে বলে তখন সে সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যায়।

আটদিন পরে ফিরে এসে এক সন্ধ্যায় সে কাকার বাড়িতে যায়। সেখানে মীরনের কথা শুনে আবার সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। মীরন সবাইকে শুনিয়ে বলছিল, নেস্তেরেংকাকে যা ভেবেছিলাম তা নয়, লোকটা কাজের আছে। ইতিমধ্যেই তিনজনকে উনি গ্রেপ্তার করিয়েছেন। এদের মধ্যে একজন স্কুল-মাস্টার, নাম মডেস্টব।

ইয়াকভ প্রশ্ন করে, কারখানার কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না।

হ্যাঁ, সিয়েড়ভ, ক্রিকুনভ, আব্রামভ ও আরো পাঁচজন কমবয়সী শ্রমিককে

গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের অবশ্য শহর থেকে পুলিস এসে ধরেছে তবে সবই নেস্তেরেংকার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে।

আলেক্সি মন্তব্য করল, ওরা আজকাল আর হত্যা করে না। মীরন বলল, হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, আরেকজনকেও গ্রেপ্তার করেছে ওই যে শিকার করে বেড়ায়।

ইয়াকভ কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, নস্কভকে কি?

আমি নামটা ঠিক জানি না। ওই যে বিধবাটা, হ্যাঁ, তাইসিয়ার বাড়িতে, লোকটা থাকে। ওখানেই বিপ্লবীদের সভা বসত। আর ওখানেই তাইসিয়াকে নিয়ে তোমার বাবা মজা উপভোগ করতেন। যোগাযোগটা মোটেই ভালো নয়…।

আলেক্সি টাক মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তবে ওকে নিয়ে কি আর করা যাবে বল?

ইয়াকভের চোখের আলো নিভে গিয়েছে, মাথা ঘুরছে সুতরাং তার কাকা আর খুড়তুতো ভাই কি বলছে তা শোনার মতো মানসিকতা আর তার নেই। সে ভাবছিল নস্কভের কথা। নস্কভ গ্রেপ্তার হয়েছে! তাহলে সেও একজন সোস্যালিস্ট!

শ্রমিকদের প্ররোচনায় নস্কভ তাকে হত্যা করতে এসেছিল! কিন্তু সিয়েডভ কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকে, হাসিখুশি ক্রিকুনভ আর আব্রামভ যে কি না মজার গান করে সবাইকে মাতিয়ে রাখে তারাও গ্রেপ্তার হলো! ভাবতে আশ্চর্য লাগছে এরাও তাহলে তার শত্রু!

ইয়াকভের মনে হলো কাকার বাড়িটা যেন একটা অশান্তির আখড়া হয়ে উঠেছে। ডাক্তার ইয়াকভলিয়েভ যে কখনো কারো সম্পর্কে ভালো কথা বলে না, জগৎ ও জীবনের কিছু ভালো দেখতে পায় না সে তার সোনার দাঁত ঝকমকিয়ে বলে, তাহলে আমরা জেগে উঠেছি।

মীরন মুখ বিকৃত করে বলে, ডাক্তার, আপানার ধোঁয়াটে কথা এখন বন্ধ রাখুন।

কিন্তু ডাক্তার আরো জোরালো গলায় কথা বলেই যায়। ইয়াকভের মনে উদ্বেগ বাড়তেই থাকে। সকলেই যেন কিসের আশঙ্কায় ভীত। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে দুর্ভাগ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করে ভয় দেখাচ্ছে। নিজেদের কাজ, চিন্তা ও কথাকেও তারা ভয় পাচ্ছে। ইয়াকভের মনে হয় ওদের মধ্যে বোকামির ভাবটা যেন আরো ঘনীভূত হচ্ছে। ইয়াকভের নিজের ভয়টা অবশ্য কাল্পনিক নয়। অত্যন্ত বাস্তব। ফাঁসির দড়ির গলায় স্পর্শ পাওয়ার

মতোই বাস্তব। দড়িটা অবশ্য অদৃশ্য কিন্তু ক্রমশই যেন বাঁধনটা শক্ত হতে হতে তাকে এক দুর্নিরোধ্য বিপদের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

ভয়টা আরো বেড়ে গেল যখন মাস দুই পরে নস্কভ ও আব্রামভ ফিরে এল। আব্রামভ খুব রোগা ও কেমন হলদেটে দেখতে হয়েছে। হাসতে হাসতে একদিন সে এসে বলল, কি, বুড়োকে কাজে ফিরিয়ে নেবেন না কি?

ইয়াকভ না বলে উঠতে পারল না। বরং হেসে জিজ্ঞেস করে, জেলের জীবন নিশ্চয়ই খুব কঠিন?

ভয়ানক ভিড়। মুখে তার হাসিটি লেগেই আছে। হাসিমুখেই আবার সে বলে, ভাগ্যিস টাইফয়েড দেখা দিয়েছিল নইলে কর্তৃপক্ষ এত লোককে কোথায় যে রাখত ভেবে পাই না।

আব্রামভ চলে যেতে ইয়াকভ মনে মনে বলল, হ্যাঁ, মুখে তো তোমার হাসি, মনের মধ্যে কি আছে কে জানে!

সেদিন বিকেলেই মীরন এমন হম্বিতম্বি করে বকাবকি শুরু করে দিল যেন ইয়াকভ তার চাকর। কালই ওকে তুমি বরখাস্ত করবে—চিৎকার করে মীরন বলে চলে গেল।

কয়েকদিন পরে ওকা নদীতে স্নান করতে গিয়ে নেস্তেরেংকার সঙ্গে তার দেখা হয়। নেস্তেরেংকা বলে, আব্রামভকে ছাড়িয়ে দিয়ে ভালো করনি। ওকে আমরা অন্যভাবে কাজে লাগাতে পারতাম। অবশ্য আমারই উচিত ছিল তোমাকে বলে দেওয়া।

আমি ছাড়াইনি. ওটা মীরনের কাজ।

ও, তাহলে তুমি দায়ী নও?

না।

জামাকাপড় খুলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নেস্তেরেংকা বলল, হ্যাঁ, তোমার বন্ধু সেই শিকারীর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে নেস্তেরেংকা আবার বলল, জানো, ও কিন্তু তোমাকে ভয় দেখাতেই গিয়েছিল। আসলে ওর একটা দো-নলা বন্দুক কেনার শখ অনেকদিনের। যাই হোক, তোমার ওপর ভুলটা করার জন্যে ও এখন আমার খপ্পরে এসে পড়েছে। এবার ওকে কাজে লাগাতে পারব।

ভুল? কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন···

হ্যাঁ হ্যাঁ, সবই ভুল—বলেই নেস্তেরেংকা জলে ঝাঁপ দিল, তারপর সাঁতার কাটতে কাটতে গভীর জলে চলে গেল।

ইয়াকভ মনে মনে বলল, শয়তানিতে পেয়েছে তোমাকে।

কোলাহলমুখর ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে সব কিছুকে স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটল।

মাঝরাতে মা এসে ইয়াকভকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, উঠে পড়, তোমার কাকা মারা গিয়েছেন।

কাঁদতে কাঁদতে মা বলল, টিখন এসে এখুনি খবর দিয়ে গেল।

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ে ইয়াকভ। বিড়বিড় করতে থাকে সে। কী করে হলো···হঠাৎ···অসুখ-বিসুখ তো কিছু ছিল না?

কষ্ট করে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পিওতর এসে দেখা দেয় দরজার সামনে। ক্কোভে বলে ওঠে, খারাপ খবর ছাড়া টিখন আর কিছু আনতে পারে না। হায়···এমন আকস্মিক···

পিওতরের গায়ের ওপর ড্রেসিং গাউন, পায়ে জুতো নেই। বারে বারেই সে শুধু হা-হুতাশ করে যাচ্ছে। এমন ভাবে সে তাকিয়ে আছে যেন ঘরখানা তার অপরিচিত।

বিমূঢ়ের মতো ইয়াকভ প্রশ্ন করল, কী করে এমন হলো?

*　　*　　*

একখানা খোলা গাড়িতে সবাই বেরিয়ে পড়ল। গাড়ি চালাচ্ছে ইয়াকভ। ইয়াকভ দেখল তার সামনে ঘোড়ার ওপর টাইখন উঠছে আর নামছে আর তার ছায়াটাও নাচছে ও রাস্তার ওপর এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে যেন ছায়াটা মাটির ভেতর ঢুকে যেতে চাইছে।

ফটক আর ছাউনি ঢাকা জায়গাটার মধ্যে পায়চারি করছিল ওর্লোভা। সেখানেই সকলের সঙ্গে তার দেখা হল। তার পরনে শুধুই রাত্রিবাস। চাঁদের আলোয় তাকে স্বচ্ছ নীল একটা রেখার মতো মনে হচ্ছে। ধীরে ধীরে সে বলল, আমার জীবন এইখানেই শেষ হয়ে গেল।

রান্নাঘরের পিছনে বেঞ্চির ওপর মীরন স্থির হয়ে বসে আছে। তার এক হাতে জ্বলছে সিগারেট অন্য হাতে দুলছে চশমা। চশমাহীন তার নাকটা আরো লম্বা দেখাচ্ছে। ইয়াকভ নিঃশব্দে মীরনের পাশে গিয়ে বসে। পিওতর উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খোলা জানলার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেমন করে ভিখারী ভিক্ষার আশায় তাকিয়ে থাকে। ওর্লোভার চোখ দুটি আকাশের দিকে নিবদ্ধ।

নাতালিয়া পাশে গিয়ে বসতেই ওর্লোভা বলল, কখন যে ঘটল আমি

কিছুই বুঝতে পারিনি। হঠাৎই ওর কাঁধটা দেখি ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা, মুখ খোলা। শেষবারের মতো আমাকে একটি কথাও বলে যেতে পারল না। গতকাল একবার বুকের ব্যথাটার কথা বলছিল।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ইয়াকভের কাঁধে মাথা রেখে মীরন কেঁদে ফেলে।

ইয়াকভ, তুমি জানো না বাবা কী ভালো মানুষ ছিলেন!

কি আর করা যাবে…। ইয়াকভের অন্য আর কোনো কথা যোগাল না। কাকীকেও কিছু বলা উচিত কিন্তু কী যে বলবে তা সে ভেবে পাচ্ছে না।

পিওতর ধীর পায়ে ঘরের ভিতরে ঢোকে। পিছনে পা টিপে টিপে ইয়াকভ। ধবধবে সাদা চাদর দিয়ে আলেক্সির শরীর ঢাকা। চোয়াল পাছে ঝুলে না পড়ে তাই মাথার ওপর ও চিবুকের তলা দিয়ে একখানা রুমাল বাঁধা। চাঁদের আলো জানলা দিয়ে এসে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। পর্দা কাঁপছে থরথর করে। বাইরে কুকুরের কান্নার শব্দ, তারই মাঝে পিওতর ক্রুশ চিহ্ন এঁকে বেশ উঁচু গলায় বলে, ওর জীবন ছিল সহজ বাঁধনহীন, মৃত্যুও তেমনি সহজ।

পিওতর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই নাতালিয়া বলে, নিকিতাকে একটা খবর দেওয়ার ব্যবস্থা কর, টিখন ওর ঠিকানা জানে।

একটু বিরক্ত হয়েই পিওতর নাতালিয়ার কথার পুনরাবৃত্তি করে বলে, টিখন জানে! তারপর মীরনকে বলে, নিকিতাকে খবর দাও।

মীরন চলে যাচ্ছে দেখে সে তাকে ডেকে বলে, ইলিয়াকেও খবর দিও।

মীরন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, ইলিয়া আসতে পারবে না।

ওর্লোভা জনে জনে বলে চলেছে, তিরিশটা বছর আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি, বিয়ের আগেও চার বছর পাশে পাশে থেকেছি। এখন আমার কি হবে?

পিওতর ইয়াকভের কাছে এসে প্রশ্ন করে, ইলিয়া কোথায়?

আমি জানি না।

মিথ্যে কথা বলছো তুমি।

ইলিয়ার প্রসঙ্গ আলোচনার সময় এটা নয় বাবা।

পিওতর আর কিছু বলে না।

এই শোকাচ্ছন্ন পরিবেশটা ইয়াকভকে বেশ কষ্ট দিচ্ছে অথচ একে পাশ কাটিয়েও যাওয়া যায় না। তার চারপাশে সবকিছুই যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিরানন্দময়। তার কাকিমা কত সুখী ছিলেন কান্নার আড়ালে

যেন এই নিয়ে অহঙ্কার করে বেড়াচ্ছেন, মা মিথ্যে ঘ্যানঘেনিয়ে চলেছেন। বাপের মুখখানা দেখাচ্ছে কাঠের মতো, চোখ দুটি স্থির। সত্যি কথা বলতে কি যতটুকু স্বাভাবিক তার চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক যেন সব কিছু।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন শবাধার যখন কবরে নামিয়ে হলুদ রঙের বালি চাপা দেওয়া হচ্ছে তখন নিকিতা এসে উপস্থিত।

নিজের হাতে পোঁতা বার্চগাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো সাধুবেশী কৃশকায় নিকিতার দিকে তাকিয়ে ইয়াকভ মনে মনে বলল, এই আরেকজন এলেন।

চোখের জল মুছতে মুছতে পিওতর ভাইয়ের কাছে গিয়ে বলল, তুমি একটু দেরি করে ফেলেছ। কচ্ছপের মতো নিকিতা মাথাটি কুঁজের তলায় টেনে নেয়। রোদ লেগে লেগে পোশাকের রঙ গিয়েছে জ্বলে। তাকে দেখতে হয়েছে ঠিক ভিখিরির মতো। গালগুলো ফোলা ফোলা, জুতোর গোড়ালি গেছে ক্ষয়ে। কবরের চারপাশে ঘিরে রয়েছে যে লোকজন তাদের দিকে ফিরে নিকিতা যেন পিওতরকে কি বলল শোনা গেল না। ইয়াকভ চারদিকটা একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। দেখতে পেল যে সবাই বিশেষ কৌতূহল নিয়ে নিকিতাকে দেখছে। সবাই জানে এই কুঁজওলা লোকটি ধনী মিল মালিকের ভাই। এই বিকলাঙ্গ অংশীদারের ব্যাপারটা সবাই বুঝতে চায়। একটা কেলেঙ্কারির আশঙ্কা করে ইয়াকভ কারণ লোকেদের স্থির বিশ্বাস যে পিতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যেই ষড়যন্ত্র করে ভাইরা তাকে আশ্রমে যেতে বাধ্য করেছে।

পুরোহিত নিকোলাই ওর্লোভাকে উপদেশ দেন, আমরা যেন কান্নাকাটি করে কিংবা অনুযোগ করে পরম পিতার অবমাননা না করি কারণ তাঁর ইচ্ছাই···

ওর্লোভা বলে, আমি কাঁদছিও না, অনুযোগও করছি না। তবু তার হাত দুটি কাঁপতে থাকে, স্কার্টের পকেট হাতড়ায় অশ্রুসিক্ত রুমালখানি লুকোবার জন্যে।

টিখন বেশ নিপুণ হাতে কবরস্থানের প্রহরীকে কবরটি ভরাতে সাহায্য করে। নিকিতা ধীর বিষাদ কণ্ঠে নাতালিয়াকে বলে, তুমি অনেক বদলে গিয়েছ, চেনাই যায় না। তারপর নিজের কুঁজের ওপর হাতখানা ছুঁইয়ে বলে, আমাকে অবশ্য চেনায় কোনো অসুবিধা নেই। এই বুঝি তোমার ইয়াকভ আর ওই লম্বা ছেলেটি তো মীরন। বেশ বেশ, তাহলে এবার যাওয়া যাক।

কবরস্থানে কিছুক্ষণ রয়ে গেল ইয়াকভ। শ্রমিকদের মাঝে নস্কভকে দেখতে পেল সে। অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে নস্কভ তার দিকে তাকাল। ইয়াকভের রক্ত হিম হয়ে গেল। যে লোক তার পায়ের মধ্যে গুলি চালিয়েছে নস্কভ তার সম্পর্কে নিশ্চয়ই শুভ চিন্তা করছে না।

কোটের বালি ঝাড়তে ঝাড়তে টিখন এগিয়ে এসে বলল, আলেক্সি কতই না সচেষ্ট ছিল তা তো তোমরা দেখেছ···তবু···আর নিকিতা কত দুর্বল···।

এখানে একজন···কি ভেবে ইয়াকভ কথা সম্পূর্ণ না করে থেমে যায়।

কি বলছিলে ?

কাকার জন্যে শ্রমিকরা বেশ দুঃখিত।

দুঃখিত হবে নাই বা কেন ?

এখানে নস্কভ নামে একজন শিকারী আছে। ওর সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলব। ইয়াকভ আবার অসম্পূর্ণ কথাটা বলার চেষ্টা করে।

টিখন কিন্তু নিজের কথার জের টেনে আপন মনেই বলতে থাকে : যে কোনো মৃত্যুই দুঃখের। একটা ঘোড়া মারা গেলেও লোকে দুঃখ পায়। আলেক্সি তো ছুটছিল, ছুটতে ছুটতেই মুখ থুবড়ে পড়ল। এইতো সেদিন সে আমায় বলছিল···

ইয়াকভ চুপ করে যায় কারণ তার মনে হয় টিখনের পক্ষে তার সমস্যা বোঝার নয়। অথচ নস্কভের ব্যাপারটা কাউকে না বলে সে শান্তি পাচ্ছে না। মনের মধ্যে একটা চিন্তা পুষে রাখা বড়ই অস্বস্তিকর। কয়েকদিন আগেই লোকটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। শহরের রাস্তায় টুপিটা খুলে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল : আমি আপনার কাছে কিছু পাব। আমার পায়ের চিকিৎসার জন্যে কিছু দেবেন বলেছিলেন। তাছাড়া একটা হারমোনিয়াম কিনবো। আপনার বাবাকে খুশি রাখার জন্যে ওটা লাগবে।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল ইয়াকভ।

নস্কভ তখন বিনয়ী ভঙ্গিতে কিন্তু বেশ জোর দিয়েই বলল, যেহেতু রাশিয়ার শত্রুদের বিরুদ্ধে কাজ করে আমি আপনার উপকারই করছি···

কত চাও ?

আপাততঃ পঁয়ত্রিশ রুবল।

পঁয়ত্রিশটা রুবল তাকে দিয়ে ইয়াকভ পা চালিয়ে চলে আসে। একই সঙ্গে ভয় ও রাগে তখন তার মন আচ্ছন্ন। মনে মনে সে বলে, শয়তানটা ভেবেছে আমি খুব বোকা। দেখাচ্ছি তোমায় মজা।

ধীর পায়ে এখন কবরখানা থেকে বাড়ি ফেরার পথে ইয়াকভ ভাবছিল

কি করে লোকটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ষাঁড়ের মতো সে যেন তাকে তাড়িয়ে কসাইখানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

মীরনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পিওতর ঝিতাইকিন, বাস্কি, ভোরোপোনোভ এবং শহরের আরো কয়েকজন গণ্যমান্য লোককে শ্রাদ্ধের ভোজের আসরে নিমন্ত্রণ করেছিল। মীরন তার রাগ গোপন করার কোনো চেষ্টাই করেনি, আসর থেকে সে সোজা উঠে চলে গিয়েছিল। একটু পরে ওর্লোভাও উঠে পড়ে। অর্ধোন্মত্ত লোকগুলোর তার আশ্রম-জীবন সম্পর্কে প্রশ্নে প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে নিকিতাও উঠে যায়। পিওতর যেন বেপরোয়া। সে আজ সবাইকেই চটাতে চায়। ইয়াকভ আশঙ্কা করে বাপের সঙ্গে আজ শহরের লোকদের একটা কলহ বাধবে।

সেদিন রাতে ভাইয়ের বসবার ঘরে পিওতর রাত কাটাতে মনস্থ করে। ইয়াকভ ঘণ্টা দুই একটা সোফায় শুয়ে বৃথাই ঘুমোবার চেষ্টা করে। অবশেষে সে উঠোনে বেরিয়ে আসে। সেখানে রান্নাঘরের জানলার পিছনের বেঞ্চিতে টিখনের পাশে বসে থাকতে দেখা যায় সাধুবেশী নিকিতাকে। ভাঙাচোরা একটা মেসিনের অংশবিশেষ বলেই দূর থেকে তাকে মনে হয়। তার হাতে একটি গেলাস ও বেঞ্চির ওপর এক বোতল মদ।

কে ওখানে? তারপর নিকিতা নিজেই উত্তর দেয়, ও, ইয়াকভ বুঝি! এস, বুড়োদের সঙ্গে একটু বসবে।

চাঁদের আলোয় গেলাস তুলে স্বচ্ছ আলোয় পানীয় নিরীক্ষণ করে নিকিতা। একটু পরে গির্জার চূড়োর পিছনে চাঁদ লুকোয়। আলেক্সির প্রিয় কুকুর কুচুম অনাথের মতো এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করতে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুলে সে নিচুস্বরে কেঁদে ওঠে আর কার কাছে যেন অভিযোগ জানায়।

টিখন শান্তকণ্ঠে কুচুমকে ডাকে। কুচুম এসে তার দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদে।

ইয়াকভ বলে, ও বুঝতে পেরেছে।

কেউ কিছু বলে না। ইয়াকভ তবু কথা বলতে চায় মনের ভার কমাবার জন্যে। তাই সে আবার বলে, আমি বলছিলাম, ও বুঝতে পেরেছে।

টিখন বলল, পারবে না কেন?

নিকিতা বলল, সুদজালের মঠের কুকুরটা গন্ধে গন্ধে চোর ধরে দিত।

তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছিলে? ইয়াকভ প্রশ্ন করে।

নিকিতা বলে, টিখন বলছিল এখানে আবার হাঙ্গামা হবে। আমারও

তাই মনে হয়। অস্থিরতা বাড়ছে মানুষের মধ্যে।

কুকুরের কান দুটো নিয়ে খেলা করতে করতে টিখন বলে, ওরা নিঃস্ব হয়ে পড়েছে।

এখানেও বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছে মনে হয়। সিয়েডভ ও তার বন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জানো কি ?

জানি বইকি। টিখন উত্তর দেয়।

নিকিতা এক টিপ নস্যি নিয়ে ভাইপোকে বলে, আজকাল নস্যি নিচ্ছি। চোখের উপকার করে, ভালো দেখতে পাই না তো।

তারপর হেঁচে নিয়ে বলে, গ্রামে গ্রামেও পুলিস অনেককে গ্রেপ্তার করছে।

এখানেও অনেক গোয়েন্দা আছে, সবার ওপরেই নজর রাখা হচ্ছে।

নজর না রাখলে তো কিছুই দেখতে পাবে না। টিখন মন্তব্য করল।

আমাদের নিজেদের মধ্যেও গোয়েন্দা আছে। নস্কভ সম্পর্কে তো লোকে অনেক কিছু বলে। সিয়েডভদের নাকি ওর রিপোর্টের ভিত্তিতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ওটা একটা গাধা। টিখন আবার কুকুরটাকে আদর করতে থাকে।

ইয়াকভ ভাবে টিখন ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছে না তাই সে সাবধান করার জন্যে বলল, ওর সম্পর্কে যেন কারো সঙ্গে আলোচনা করো না।

আমার কি দরকার ? ওর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ? তা ছাড়া বললেই বা লোকে বিশ্বাস করবে কেন ?

নিকিতা বলে ওঠে, তা ঠিক, আজকাল বিশ্বাসটাই কমে গেছে। যুদ্ধের পর কয়েকজন আহত সৈনিকের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম যে যুদ্ধে ওদের বিশ্বাস নেই। ইয়াকভ, এটা হচ্ছে লোহার যুগ। লোহা আর মেসিনই সত্য এ যুগে। আমাদের দরকার ছিল অন্য জাতের মানুষ অর্থাৎ লোহার মানুষ। অনেকের সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হয়েছে যন্ত্রের আদেশ মানতে গিয়ে তাদের মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত হচ্ছে।

টিখন মন্তব্য করল, ওরা ঘোড়ার আগে গাড়ি জুতে দিয়েছে।

নিকিতা আবার বলতে থাকে, তিন বছর ভবঘুরের মতো ঘুরে ঘুরে আমি অনেক দেখেছি অনেক জেনেছি। সবাই চটে আছে তবে রাগটা তাদের বিপথে চালিত হচ্ছে। ফাদার গ্লায়েব আমাকে একথা বলেছিলেন।

টিখন জিজ্ঞেস করে, পুরুত বেঁচে আছে ?

হ্যাঁ, বেঁচে আছেন তবে পুরুতগিরি আর করেন না। এখন মেলায় মেলায় বই বিক্রি করেন।

লোকটি বড় ভালো। আমি মাঝে মাঝে যেতাম অন্যায়ের স্বীকারোক্তি করতে। সত্যিই ভালো লোক। আমার তো মনে হয় গরীব বলেই উনি পুরুত হয়েছিলেন। ঈশ্বরে ওঁর মোটেই বিশ্বাস নেই।

না না, খৃষ্টের প্রতি ওঁর বিশ্বাস ছিল তবে মানুষভেদে বিশ্বাসের প্রকৃতি স্বতন্ত্র হয়।

এই জন্যেই তো বিভ্রান্তি দেখা দেয়।

রাত্রিবাস পরে খালি পায়ে নিঃশব্দে পিওতর এসে হাজির হল।

কিছুতেই ঘুমোতে পারলাম না। ওদিকে কুকুরটা সমানেই ডেকে চলেছে আর এদিকে তোমাদের বকবকানি। আর টিখন, তোমাকে বলি, তোমার পুরনো বুলিগুলো সমানেই কপচে যাচ্ছ। এবার থামাও। বুঝলে ইয়াকভ, ওর মাথায় কী যে একটা ধারণা ঢুকেছিল, সেই থেকেই নেকড়ের ফাঁদে ধরা পড়ল ও। তোমার ভাইয়ের অবস্থাও হয়েছে ঠিক তাই। নিকিতা, তুমি ইলিয়ার ব্যাপারটা জানো?

হ্যাঁ, আমি শুনেছি।

হ্যাঁ, ওকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। ও একটা ধার-করা ঘোড়ার ওপর চড়ে ছুটলো। কিন্তু যাবে কোথায়? অবশ্য একটা কথা স্বীকার করতেই হয় ধন-সম্পত্তির মায়া কাটানো সহজ নয়। জানি না কি ভাবে তার দিন কাটছে।

পিওতর বাগানের দিকে যেতে যেতে ইয়াকভকে বলল, আমাকে একখানা কম্বল ও কয়েকটা বালিশ দিয়ে যাও। বাগানঘরে ঘুমোবার চেষ্টা করে দেখি।

ঘুরে দাঁড়িয়ে পিওতর নিকিতাকে বলে, নিকিতা, মেসিন সম্পর্কে তুমি যা বলছিলে সব ভুল। যন্ত্রপাতি, ব্যবসা এসবের তুমি কি জানো? তোমার কাজ ও কথা ভগবান নিয়ে। ওই নিয়েই থাকো। যন্ত্রপাতি কোনো বাধা···

টিখন রূঢ়ভাবে বাধা দিয়ে বলে, কারখানার জীবন মানে ব্যয় বৃদ্ধি ও অশান্তি।

পিওতর পিছন ফিরে না তাকিয়ে বাগানের দিকে এগিয়ে যায়, পিছনে বালিশ ও কম্বল নিয়ে ইয়াকভ তাকে অনুসরণ করে।

পিওতর ভাইকে নিজের বাড়িতে এসে থাকার আমন্ত্রণ জানায়নি।

নিকিতা তাই ওর্লোভার বাড়ির চিলেকোঠায় আশ্রয় নেয়। অবশ্য সে আশ্বাস দেয় ওর্লোভাকে, আমি এখানে বেশিদিন থাকবো না শীগগিরই চলে যাবো।

চিলেকোঠায় লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকে নিকিতা। তাকে না ডাকলে নিজে থেকে সে কখনই বসার ঘরে আসে না। দিনের বেলায় সে বাগানের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। এইটিই তার মনের মতো কাজ। শরীর তার সম্পূর্ণই ভেঙে গিয়েছে. কণ্ঠস্বর হয়েছে অত্যন্ত ক্ষীণ। যখন কারো সঙ্গে কথা বলে মনে হয় কোনো বিষয়ে গোপনে পরামর্শ করছে বুঝি। সে গির্জায় যায় না, অজুহাত দেখায় শরীর খারাপ। ঈশ্বর সম্পর্কিত আলোচনা সে সযত্নে পরিহার করে।

ইয়াকভ লক্ষ্য করল তার এই কাকার সঙ্গে ওর্লোভা বেশ বন্ধুর মতো। ব্যবহার করে। এমন কি মীরনও বেশ শ্রদ্ধা দেখায় তাকে, আগ্রহসহকারে শোনে তার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। যদিও মীরন আগের চাইতেও উদ্ধত হয়ে উঠেছে। কারখানায় সে যখন আদেশ দেয় তখন মনে হয় সে-ই মালিকদের মধ্যে প্রবীণতম। ইয়াকভের সঙ্গে তার ব্যবহার তো মনিবের মতোই।

নাতালিয়ার দিকে নিকিতা একই প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকায় যেমন সে অন্যদের মুখের দিকে তাকায়। তবে নাতালিয়ার সঙ্গে সে খুব কমই কথা বলে। নাতালিয়াও বিশেষ প্রয়োজন না হলে কথা বলে না। নাতালিয়ার চোখের দৃষ্টিও অত্যন্ত শীতল। স্বামীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগ, মীরনকে ভয় পাওয়া আর ইয়াকভকে দেখলে প্রসন্ন হওয়া এ ছাড়া নাতালিয়ার আর কোনো জীবন নেই। এদিকে টিখনের সঙ্গে নিকিতার আর আগের মতো সদ্ভাব নেই।

কাকার কালো কৃশ মূর্তি ইয়াকভের মনে বিষণ্ণতা ঘনিয়ে আসে, মৃত্যু চিন্তা নিয়ে আসে। পরিবারে যা কিছু ঘটছে সবকিছুই সে একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। সেই দৃষ্টিকোণটি হল নিজের সমস্যাকণ্টকিত জীবন। সমস্যা কমা দূরে থাক ক্রমশ যেন বেড়েই যাচ্ছে। প্রেমের ব্যাপারে সে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। সেই অভিজ্ঞতাই যেন তাকে বলছে যে পলিনার ভালোবাসায় উত্তাপ কমে আসছে। সন্দেহ দৃঢ় হয় কঠিন-চিত্ত লেফটেনান্ট মাভরিনের ব্যবহারে। তার সঙ্গে দেখা হলে লোকটি এমনভাবে তাকায় যেন দূরের একটি ক্ষুদ্র জিনিস দেখছে। অথচ কিছুদিন আগে লোকটি জুয়ার আড্ডায় তার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে এবং সরসভাবে কথা বলেছে। গোলন্দাজবাহিনীতে যোগ দেবার মতো তোমার চেহারা—

এই ধরনের রসিকতা সে প্রায়ই করত।

ঠাণ্ডা মাথায় লোকের মুখের ওপর রূঢ় কথা অবশ্য সে বলতো তার ওপর তার শীত সহ্য করার ক্ষমতা, দৈহিক শক্তি, অসীম সাহসিকতা এইসব কারণে সকলেই তাকে ভয় করে এবং এড়িয়ে চলে। এমন একজন লোক তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে দেখে ইয়াকভ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। একটা সংঘর্ষ যে আসন্ন সে সম্পর্কেও সে নিশ্চিত হয়ে ওঠে। এ দিকে পলিনার আকর্ষণ তার কাছে দিনে দিনে আরো তীব্র হয়ে উঠছে। পলিনাকে সে কোনোমতেই ছাড়তে পারবে না। যদিও পলিনাকে সে শাসিয়ে রেখেছে, যদি মাভরিনের সঙ্গে বেশি মাখামাখি কর তাহলে তোমাকে আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব।

মাভরিনকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ছাড়াও নস্কভ সম্পর্কে আশঙ্কাজনক চিন্তাটা তো ইয়াকভের মনে রয়েইছে। পা-বাঁকা শিকারী নস্কভ একই জায়গা থেকে আকস্মিক ভাবে বেরিয়ে এসে হাতে পাতে টাকার জন্যে। লোকটাকে সঙ্গে সঙ্গেই শেষ করে না ফেলার জন্যে আক্ষেপে হাত কামড়ায় ইয়াকভ।

ইয়াকভের মনে হয় শ্রমিকদের ভয় দেখিয়ে অথবা তার কাছ থেকে যে টাকা নিচ্ছে সেই টাকায় কাউকে ঘুষ দিয়ে নস্কভ তাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবে। শ্রমিকদের তাকানো দেখে মনে হয় তার ওপর ওদের আক্রোশ বেড়েই চলেছে।

মীরন বলে শ্রমিকরা যে বিপ্লবের দিকে এগুচ্ছে তার মানে এই নয় যে ওরা ওদের জীবনধারণের মান উন্নত করতে চায়। এটা উদ্ভট আইডিয়া ওদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশের কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, সাধারণ প্রশাসন সব কিছুর কর্তৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর হাতে চলে আসবে বিপ্লবের উদ্দেশ্য এটাই। এইসব কথা বলার সময় ইয়াকভ উত্তেজিত হয়ে ঘরময় পায়চারি করতে থাকে।

ওরা নতুন নামকরণ করেছে, সোস্যালিজম নয়, কী যেন বলে শয়তানগুলো। আর তোমার ভাই কি না এদেরই সাকরেদ আর মন্ত্রীগুলোও হয়েছে এক-একটা ঠুঁটো জগন্নাথ।

ইয়াকভ জানে মীরনের এইসব কথার উদ্দেশ্য হল শ্রোতাদের বোঝানো যে 'ইম্পিরিয়াল ডুমা'র সদস্য হবার যোগ্যতা তার রয়েছে। তবু মীরনের এই ক্রুদ্ধ উচ্ছ্বাস ইয়াকভের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়, বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের মাঝে তার অসহায়ত্বের বোধটা আরো প্রবল হয়ে ওঠে। একদিন সকালে তো সন্ত্রাসের ভয়ঙ্কর মূর্তিটা সে প্রবলভাবে অনুভব করেছিল। কারখানার উঠোনে শ্রমিকদের চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে যায়। বালিশ থেকে মুখ তুলে

সে দেখে গুদাম ঘরের সাদা দেওয়ালের ঘা ঘেঁষে উত্তাল জন-তরঙ্গের ছায়া। ওরা হাত নেড়ে ধ্বনি দিচ্ছে আর গুদাম ঘরটাকেই যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে মাটির ওপর দিয়ে। মুহূর্তেই দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল তার সর্বশরীর দিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই সে চিৎকার করে উঠল—'বিপ্লব'।

যে কোনো কারণেই হোক জ্যান্ত মানুষের চাইতে এই ধাবমান ছায়াগুলো বেশি ভীতিপ্রদ। যদিও ভয়টা কাটতে দেরি হয় না কারণ কিছুক্ষণ পরেই ইয়াকভ বুঝতে পারে এই গণ্ডগোলটা সোমবারের স্বাভাবিক ব্যাপার। ছুটির পরের দিন রোজই কিছু ঝামেলা হয়। তবে ওই ধাবমান ছায়ামূর্তিগুলোর আতঙ্ক তার মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে যায়। সব মিলিয়ে এখানকার জীবন অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। খবরের কাগজ খুললেই শিউরে উঠতে হয়। ইয়াকভ অবশ্য খবরের কাগজ পড়তেই চায় না। সরলতা, সৌজন্য সবই অন্তর্হিত হয়েছে। প্রতিটি মুখে অপ্রসন্নতার ছায়া. প্রতিদিনই নতুন নতুন মুখের আবির্ভাব।

হঠাৎ তাতানিয়া ভোর্গোরোড থেকে বর জুটিয়ে নিয়ে এল। লোকটি রোগা, ছোটখাটো, মাথায় ইঞ্জিনিয়ারের টুপি। অত্যন্ত ফুর্তিবাজ লঘু মেজাজের এই মানুষটিকে সবাই মিত্যা বলে ডাকে। তাতানিয়ার চেয়ে সে দু বছরের ছোট। তাতানিয়া মিত্যা বলে ডাকে বলে মিত্যাই তার সর্বজনীন নাম হয়েছে। গীটার বাজিয়ে সে নানান রকম গান গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে তোলে। তার একটি প্রিয় গানের বাণী হচ্ছে,—'কবরে শায়িত আমার প্রিয়তমা পত্নী, হে প্রভু স্বর্গলোকে তুমি তাকে গ্রহণ করো।' ইয়াকভের মনে হয় এই গানটি গেয়ে মিত্যা তার ভগ্নীকে অপমানই করে। নাতালিয়াও খুব বিরক্ত হয়, তাতানিয়া কিন্তু রাগ করে না। মাঝে মাঝে সে বেশ বিগলিত হয়েও যায়।

খাওয়াতেও লোকটির বিশেষত্ব আছে। পায়রার মতো তার খাওয়া আর শেষ হয় না। শ্বশুরমশাই তো জামাইয়ের খাওয়া দেখে ভাবে বুঝি স্বপ্ন দেখছে। জামাইকে পিওতর জিজ্ঞেস করে, তোমার খাওয়ার ক্ষমতা দেখে মনে হচ্ছে পানেও তোমার দক্ষতা আছে। তাই না কি?

জামাই উত্তর দেয়, তা আছে। মধ্যাহ্নভোজের সময়ে মিত্যা প্রমাণ করে যথেষ্ট পরিমাণে মদ্যপানেও সে সক্ষম। বহু দেশ সে ঘুরেছে। ভল্গা, উরাল, ক্রিমিয়া, ককাসাস—আরো বহু জায়গায় সে গিয়েছে। লোকহাসানো গল্পের অফুরন্ত সঞ্চয় তার। মনে হয় কোনো ভাবনাহীন, চির-আনন্দময় দেশ থেকে বুঝি সে এসেছে।

তার মতে জীবন হচ্ছে সুন্দরী মেয়ের মতো। দেখতে দেখতে সেও অন্তহীন ব্যবসার ঘূর্ণিতে জড়িয়ে পড়ে। শ্রমিকদের ও ছেলেছোকরাদের মন সে অচিরেই জয় করে ফেলে। এমনকি মীরনও তাকে পছন্দ করে। ইয়াকভ ভগ্নীপতিকে পছন্দ করে এই কারণে যে লঘু রসিকতায় সে তার মনের ভার অনেক কমিয়ে দেয়। মিত্যার আর একটি গুণ তার লোভ আছে বলে মনেই হয় না। তাতানিয়ার যৌতুকের পরিমাণ কত তাও সে জানতে চায়নি। অবশ্য এটা তাতানিয়ার কৌশলও হতে পারে। পিওতর কিন্তু মাঝে মাঝে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে, আমার সারাজীবনের পরিশ্রম কি ওই রুগ্ন লাল মাথাটার জন্যে!

এদিকে মীরন মস্কো থেকে ফিরে এল, সঙ্গে নবপরিণীতা বধূ। গোলগাল, নীল-নয়নী, ঘাড় বাঁকা, কুঞ্চিতাকেশা মেয়েটিকে মীরন সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, আমার স্ত্রী, নাম অ্যানা, বয়স আঠারো কিন্তু গোপন করে গেল যৌতুকের কথাটা। আড়াই লক্ষ রুবল পেয়েছে সে যৌতুক হিসেবে। তা ছাড়া স্ত্রী হচ্ছে মস্কোর এক কাগজের মিল মালিকের একমাত্র কন্যা।

পিওতর চোখ লাল করে ছেলেকে বলে, দেখ ও কেমন বিয়ে করে এল। একমাত্র শয়তানই জানে তুমি কার পিছনে পড়ে আছ। আর ইলিয়া তো ধুলোর মতো কোথায় মিলিয়ে গেল।

বিশাল বপু নিয়ে পিওতরের আজকাল হাঁটতে অসুবিধা হয়। ইয়াকভের মনে হয় শরীরের অসামর্থ্যই তার বাবার খিটখিটে মেজাজের কারণ। সে যেন ইচ্ছে করেই বার্ধক্যের কুৎসিত মাংসস্তূপ সকলকে দেখিয়ে বেড়ায়। বড় মেয়েকে রাগাবার জন্যে এক সময় যেভাবে ঘুরে বেড়াতো আজকাল ঠিক সেইভাবেই অর্থাৎ ড্রেসিং গাউনের ফিতে না বেঁধে আর খোলা সার্টের তলায় চর্বিতে ভরা থলথলে বুক দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায় কোনো কোনোদিন অফিসেও চলে আসে পিওতর এবং বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকে। যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায়। ব্যবসার জন্যে জীবনপাত করেছে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছে, জীবনে এক ঘন্টার জন্যেও আনন্দ করার অবকাশ মেলেনি।

ইয়াকভ বুঝতে পারে এই অনুযোগগুলো বাবার বার্ধক্যের সান্ত্বনা। তাই সে প্রতিবাদ করে না, চুপচাপ বসে থাকে সে অবশ্য একটা সিদ্ধান্তে আসে যে বাবার মতো জীবন কাটানো অত্যন্ত বোকামির কাজ হবে।

ইয়াকভ বাবার আর একটি প্রবণতাও লক্ষ্য করেছে। সম্প্রতি অপরকে আঘাত করে সে এক ধরনের সুখ পায়। বৃদ্ধা স্ত্রীর কাছে গিয়ে তাকে

কটূক্তি করতে থাকে। বাগানের ধারে জানলায় নাতালিয়া অলস ভঙ্গিতে বসে আছে, হাত দুটি নেতিয়ে পড়েছে কোলের ওপর। ভাবলেশহীন চোখ শূন্যে ভাসমান।

ভাবছো কি বসে বসে? গায়ে তো বেশ মাংস লেগেছে। ছেলেমেয়েরা তো কেউ খোঁজও নেয় না মায়ের। তাতানিয়া তো রাঁধুনির সঙ্গে যা ব্যবহার করে তোমার সঙ্গে তাও করে না। এলেনা তো আসেই না। নতুন কোনো প্রেমিক জুটিয়েছে বোধহয়. আর ইলিয়ার তো পাত্তাই নেই:

কিন্তু বউকে খুঁচিয়ে লাভ হয় না কিছু। নাতালিয়া প্রতিবাদ করে না. তার দু চোখ দিয়ে শুধু জল গড়িয়ে পড়ে।

বিরক্ত হয়ে পিওতর বলে, একটা ফুটো পিপে। উঠে আসে পিওতর। ইয়াকভকে খোঁচায় না তবে ছেলে বুঝতে পারে বাপের দৃষ্টিটা অপমানসূচক। মীরনকে পিওতর ভয়ই পায় সুতরাং এড়িয়ে চলে তাকে। জামাইকে বিদ্রূপ করেও মজা পায় না পিওতর। কারণ মিত্যা নিজেই নিজেকে বিদ্রূপ করে সবাইকে মজায়.

কোথাও সুবিধা না করতে পেরে পিওতর শহরে চলে যায় ভাই আর টিখনকে অপমান করার চেষ্টায়।

নিকিতার পাশে গিয়ে বসে তাকে বলে, কি হে, পুরুতের টুপি-পরা ছাত্র ভগবানের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছ তো?

বিষাদভরা কণ্ঠে নিকিতা শুধু বলে, ওভাবে বলছো কেন?

বলবো না কেন? তুমি তো ভুল টুপি পরেছ। তোমার টুপি, পোশাক সবই ভুল। কেমন সাধু তুমি?

এগুলো আমার নিজস্ব ব্যাপার। নিকিতা ক্ষীণ প্রতিবাদ করে।

আজকাল আবার নস্যি নিচ্ছ। জীবনের মূল্যবান সময়গুলো বৃথাই নষ্ট করলে। গরীব ঘরের বাপ-মা-হারা একটি মেয়েকে বিয়ে করতে পারতে। সেও কৃতজ্ঞচিত্তে তোমার সন্তান ধারণ করতো। এতদিনে আমার মতো দাদু হয়ে উঠতে তুমি। তুমি কি না গেলে···মনে পড়ে?

নিকিতা কচ্ছপের মতো গুটিয়ে যায়। নিঃশব্দে একসময় সে চলে যায়। পিওতর তখন চলে যায় ওর্লোভার কাছে। মেলায় কি ভাবে আলেক্সি উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতো সেই গল্প ফেঁদে বসে ওর্লোভার কাছে। এখানেও কিন্তু পিওতর তার কাঙ্ক্ষিত সুখটি পায় না কারণ ওর্লোভা বয়সের ভারে এবং শোকে জীর্ণ হয়ে গেছে।

জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ওর্লোভা ক্ষীণ কণ্ঠে শুধু বলে, আলেক্সি

এখন নিন্দা এবং প্রশংসা দুয়েরই বাইরে। আপনি ইচ্ছে করলেও তাকে ছোটও করতে পারেন না, বড়ও করতে পারেন না।

পিওতর তখন বলে, আলেক্সি ঠিকই বলতো তোমার একটি চোখ বন্ধ।

এখন আমার দুটি চোখই বন্ধ। গতকালই আলেক্সির সাধের চীনে-মাটির মগটি ভেঙে ফেলেছি। কিছুই আর দেখতে পাই না।

পিওতর এবার সাধ্যমতো চেষ্টা করে টিখনকে খোঁচাতে। কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ নয়। টিখন কখনো রাগে না, উত্তেজিত হয় না। সে শুধু চারপাশে একবার তাকিয়ে নেয়, কাঁধের ঝাঁকুনি দেয় তারপর শান্তভাবে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়।

অনেকদিন তো বাঁচলে টিখন। পিওতর ব্যঙ্গ ভরে বলে।

আমার চাইতে বেশি বয়সের লোকও অনেকে বেঁচে আছে।

আচ্ছা কি জন্যে বেঁচে আছ বল ?

মানুষ তো বাঁচার জন্যেই জন্মায়।

তা ঠিক তবে তুমি সারাজীবন শুধু ঝাড়পোঁছই করে গেলে।

জন্মাবার পর মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ বেঁচে থাকে।

তা না হয় হল কিন্তু তুমি তো এখানে সারাটা জীবন হাতে একটা ঝাঁটা নিয়েই কাটিয়ে গেলে। বিয়ে-থা করলে না। না আছে স্ত্রী, না আছে সন্তান। জীবনে কোনোদিন দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হলে না। এর কী মানে হয় ? বাবা তোমাকে একসময় ভালো চাকরি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তুমি নাওনি। তোমার এই একগুঁয়েমির মানে কি ?

বড্ড দেরি করে ফেললেন। এ সব প্রশ্ন অনেক আগে করা উচিত ছিল।

পিওতরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। রেগে গিয়ে সে বলে, নিজের জীবনকালেই তো দেখলে কত লোক কত কিছু গুছিয়ে নিল। প্রত্যেকেই সুখ ভোগ করার জন্যে টাকা জমায় আর এর জন্যে তাদের সংগ্রামও করতে হয়।

হ্যাঁ, লোকে টাকা জমায়। জমাতে জমাতে শয়তানের প্রবেশের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

ইয়াকভ ভেবেছিল বাবা বুঝি খুব রেগে গিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করবে। কিন্তু বৃদ্ধ বিড়বিড় করে কিছু বলে একসময় উঠে পড়ে। টিখনকে ইয়াকভের খুব আশ্চর্য লাগে। শরীরকে সে বয়সের আক্রমণ থেকে আশ্চর্য-ভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে। তার ব্যক্তিত্ব গাম্ভীর্য এমনই যে তাকেই মালিক মনে হয়, পিওতরকে নয়।

ইয়াকভের নিজের কথা বলতে গেলে সংসারে প্রিয়জন বলতে তার কেউ নেই। এরই মধ্যে মিত্যাকেই সে কিছুটা পছন্দ করে। লোকটা বোকাও নয়, চালাকও নয় শ্রমিকদের সঙ্গে তার ব্যবহারের মধ্যে একরকম শৃগাল-সুলভ ধূর্ততা আছে। ভাই কিংবা বন্ধু সম্বোধন করে সে তাদের ভুল শুধরে দেয়। অন্যকে আনন্দ পরিবেশনের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে সেরাফিমের অনেক মিল।

ছুটির দিনে এক সন্ধ্যায় বাগানে চায়ের আসরে পিওতর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলছিল, আমার জীবনে ছুটি বলে কোনো জিনিস ছিল না।

মিত্যা শ্বশুরকে বাধা দিয়ে বলে, ভুল করেছেন আপনি। মানুষ নিজের প্রয়োজনেই ছুটির বন্দোবস্ত করেছে জীবন হচ্ছে সুন্দরী নারীর মত সেই নারীর দাবি অনেক। সে নিত্যনতুন উপহার চায়, আমোদপ্রমোদ চায় যাবতীয় রঙ্গরসে ডুবে থাকতে চায় সে।

মিত্যা কথা বলে দক্ষ বংশীবাদকের মতো অক্লান্তভাবে। শুনতে শুনতে কেউ কেউ ঘুমিয়েও পড়ে। ইয়াকভের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে: এমন অতি সাধারণ একটি বোকা মেয়েকে বিয়ে করলে কেন?

বউয়ের সঙ্গে তার আচরণের মধ্যে ভণ্ডামি চোখে পড়ে ইয়াকভের বউয়ের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তার উদ্বেগ কৃত্রিম বলেই মনে হয়। ইয়াকভের ধারণা তার বোনের কাছেও এই কৃত্রিমতা ধরা পড়ে যায়।

যাই হোক পরিবারের এবং কারখানার সকলের কাছেই মিত্যার জনপ্রিয়তা অস্বীকার করা যায় না। ব্যতিক্রম শুধু দুজন। নিকিতা এবং টিখন দুজনেই তাকে পছন্দ করে না। যদিও দুই বুড়োর মধ্যে আজকাল সদ্ভাব নেই তবু এই একটা ব্যাপারে তারা একমত

ইয়াকভের প্রশ্নের উত্তরে টিখন সরাসরি বলেছিল, এসব লোককে বিশ্বাস করা যায় না।

কেন?

ও হচ্ছে মাছির মতো, যেখানে ময়লা সেখানেই বসে।

ইয়াকভ টিখনকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আরো প্রশ্ন করে কিন্তু সদুত্তর পায় না। অনেক প্রশ্নের পর সংক্ষেপে সে শুধু বলল, ইয়াকভ, তুমি নিজের চোখ দিয়েই তো বিচার করতে পারো। ওর সবটাই ভান।

কাকা নিকিতাও একই কথা বলল।

ও লোকের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়ায়। ওর মতো বাক্‌পটু লোক আমি অনেক দেখেছি। কথার জালে ওরা লোকের মাথা ঘুরিয়ে দেয় আবার

নিজেরাই নিজেদের কথার জালে জড়িয়ে পড়ে।

নিকিতা মৃত্যুশয্যায়। ইয়াকভের ধারণা তার বাবাই যেন মৃত্যুটাকে ত্বরান্বিত করে দিলেন। দিনের পর দিন তিনি যেভাবে ভাইকে কটু কথা বলে উত্ত্যক্ত করেছেন তাতে তাই-ই মনে হয়।

সারাটা জীবন আমি ভারবাহী পশুর মতো জীবন কাটালাম আর তুমি কাটালে পোষা বিড়ালের মতো। সবাই তোমাকে সুখে রাখতে চায়, যত্ন করতে চায় এমনকি তোমার কুঁজটাও তারা যেন দেখতে পায় না। অন্যদিকে সবার ধারণা আমি নাকি বদমেজাজী। আমার বদমেজাজের পরিচয় কে কবে পেল? সারাটা জীবন···

কুঁজের মধ্যে মাথাটাকে টেনে কাশির বেগ সামলাতে সামলাতে নিকিতা অনুনয় করে বলে, রাগ করো না।

বাপের প্রতি ঘৃণায় ইয়াকভের মন বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। খোলা বুকে সাবানের ফেনার মতো একরাশ ধূসর চুল। এই ঘৃণার মনোভাব চেপে রাখা কঠিন তাই বারে বারেই ইয়াকভ নিজেকে বোঝায়, উনি আমার বাবা, আমার জন্মদাতা।

কিন্তু এতে বাপের চেহারাটা সুন্দর হয়ে ওঠে না, বিতৃষ্ণাও কিছু কমে না। রোজই একবার পিওতর শহরে যায়, ভাই মরলো কিনা সেই খবরটা নেবার আগ্রহেই যেন। হাঁফাতে হাঁফাতে সে সিঁড়ি ভেঙে চিলেকোঠায় উঠে ভাইয়ের বিছানার পাশে গিয়ে বসে। ফোলা ফোলা লাল চোখ নিয়ে সে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিকিতা কিছু বলে না। কাশতে কাশতে ভাবহীন দৃষ্টি মেলে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে কাশতে কাশতে হাঁফিয়ে পড়ে তখন উঠে বসার চেষ্টা করে।

বড় ভাই জিজ্ঞেস করে, কি, খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

ভাইয়ের পিঠে হাত রেখে, বিছানায়, চেয়ারের পিঠে হাত রেখে কোনোমতে উঠে দাঁড়ায় তারপর জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। হাড় জিরজিরে শরীরে সাধুর পোশাকটা ঝুলতে থাকে ভাঙা মাস্তুলের ওপর পালের মতো। জানলার কাছে বসে সে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকে কখনো দূরের অন্ধকার অরণ্যের দিকে।

মাংসল বড় বড় কান দুটো টানতে টানতে পিওতর বলে, তাহলে তুমি বিশ্রাম কর।

নিচে নেমে এসে ওর্লোভাকে জানায়, ও আর বেশিদিন নেই, হয়ে এসেছে।

এক মোটা সাধু নাম ফাদার মার্দারি এসে উপস্থিত হল। সে এসে জানাল নিকিতাকে মঠে পাঠিয়ে দিতে হবে কারণ মঠের আইন অনুসারে 'কে সেখানেই মরতে হবে। নিকিতার অনুরোধে ওর্লোভা ফাদার মার্দারির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

মরার পর আমার দেহটাকে ওখানে পাঠিয়ে দিতে পার। এই ছিল নিকিতার অনুরোধ।

ওর্লোভাকে নিকিতা আর একটা অনুরোধ বারকয়েক করেছিল,— 'কফিনের ডালাটা একটু উঁচু করো, শরীরটা যেন ভাঙচুর না করতে হয়।

যুদ্ধ বাধবার ঠিক চার দিন আগে নিকিতা মারা গেল। মৃত্যুর আগের দিন বিকেলে নিকিতা বলল, এবার মঠে খবর পাঠাতে পারো, ওরা আসতে আসতে আমি শেষ হয়ে যাব।

শেষদিন সকালে ইয়াকভ বাবাকে ধরে ধরে চিলেকোঠায় নিয়ে যায়। ক্রুশচিহ্ন এঁকে পিওতর ভাইয়ের ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে বসে যাওয়া মুখ তার আধবোজা চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অস্বাভাবিক জোরালো গলায় নিকিতা বলে, ক্ষমা করো আমায়।

ক্ষমা করতে যাবো কেন? কি করেছ তুমি?

আমার ঔদ্ধত্যের জন্যে।

তুমিই বরং আমাকে ক্ষমা করো। তোমাকে নিয়ে অনেক হাসি-ঠাট্টা করেছি।

হাসি-ঠাট্টাকে ঈশ্বর ক্ষমা করে দেবেন। নিকিতা যেন ভাইকে আশ্বাস দেয়।

এখন কেমন বোধ করছো?

ভাইয়ের কথার উত্তর না দিয়ে নিকিতা বলে, ও, একটা কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ইয়াকভ, টিখনকে বলো গ্রীষ্মাবাসের কাছে মেপ্‌ল গাছটা যেন কেটে ফেলে, ওটা আর বাঁচবে না…

এই অস্বাভাবিক স্পষ্ট কণ্ঠস্বর ইয়াকভকে বিচলিত করে।

মানুষের মতো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই ওই চেহারায়। কাকার জন্যে তার দুঃখ হয় তবু সে বুঝতে পারে না এ কেমন রীতি যে বৃদ্ধদের বাড়ির সকলের চোখের সামনে মরতে হবে।

ভাই আর কিছু বলে কি না শোনার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পিওতর নিচে নেমে আসে। মীরন ঢাউস একখানা খবরের কাগজ পড়ছিল। পিওতর যখন বলল নিকিতা মারা যাচ্ছে মীরন তখন খবরের কাগজের

পিছনে মুখ ঢেকে যান্ত্রিকভাবে বলল, তাই নাকি ?

শব শোভাযাত্রার দিন এক বিপত্তি ঘটলো। শোভাযাত্রা যখন স্কোয়ারে পৌঁছল তখন সেখানে সাধারণ মানুষ ও রিজার্ভ বাহিনীর সৈনিকে মাঠ একেবারে ভর্তি। লেফটেনান্ট মারভিন আদেশ দিল, পিওতর ইলিচ, দয়া করে একটু ঘুরে ওই গলিপথ দিয়ে আপনারা যান।

শোকের বিরক্তিকর রীতিনীতি পালনের পর ইয়াকভ যখন ছাড়া পেল তখন রাত ন'টা। পলিনার কাছে ছুটল সে তখনই। পথে তার নানা রকম দুর্ভাবনা হচ্ছিল। অনেক অজ্ঞাত দুর্ভাবনা। অসাধারণ কিছু একটা আজ ঘটবে তারই যেন পূর্বাভাস। ঘটলোও ঠিক তাই।

রান্নাঘরের পাশ দিয়ে ইয়াকভকে ঢুকতে দেখেই বুড়ি রাঁধুনি আতকে উঠে 'ও মা' বলে ধপ করে বেঞ্চিতে বসে পড়ে।

'হতচ্ছাড়ি কুটনী কোথাকার—' বলেই ইয়াকভ পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায় কিন্তু পলিনার ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। ঘরের ভেতর থেকে সৈনিকসুলভ পদচারণা আর পরিচিত সৈনিকের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

আপনাকে এখন ভেবে দেখতে হবে কি করবেন···ভাল করে ভাবুন।

এখনো 'আপনি' বলছে 'তুমি' নয়। তাহলে এখনো কিছু ঘটেনি।

কিন্তু চৌকাঠে পা দিয়েই মুহূর্তে সে বুঝে নেয় যা ঘটার তা ঘটে গেছে। গোঁয়ার লেফটেনান্ট ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, হাত পকেটে গোঁজা, ভুরু কুঞ্চিত। প্যান্টের বোতাম খোলা, তারই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার অধোবাসের দড়ি, এখনো সেটি প্যান্টের ওপর থেকে ঝুলছে। পায়ের ওপর পা রেখে পলিনা একটা কোচের ওপর বসে আছে। তার এক পায়ের মোজা গোড়ালি থেকে ঝুলছে। রক্তবর্ণ মুখখানি হঠাৎ বেগনী হয়ে গেল।

গোঁয়ার সেই লেফটেনান্ট এমন ভঙ্গিতে 'বেশ' বলল যাতে ইয়াকভের আশঙ্কা সত্য বলেই মনে হল। চেয়ারের ওপর টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এত কর্কশ কণ্ঠে ইয়াকভ কথা বলল যে নিজের গলার স্বরই তার কাছে অপরিচিত মনে হল।

আমি শ্রাদ্ধের কাজ সেরে এলাম।

সর্বময় কর্তার ভঙ্গিতে লেফটেনান্ট বলল, ও তাই বুঝি!

পলিনা সিগারেট টানতে টানতে কথা বলল। কণ্ঠস্বর নির্লিপ্ত, অপরাধের আভাস নেই।

ইপ্পোলিত সার্জিয়েভ আমাকে বলছেন, 'সিস্টার অফ মার্সি' হিসেবে যোগ দিতে।

ব্যঙ্গের হাসি হেসে ইয়াকভ বলে, ও, নার্স হতে বলছেন!

এ হাসির মানে কি? আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই বাড়াবাড়ি আমি পছন্দ করি না। বেয়াদপি আমি সহ্য করব না বলে দিচ্ছি। মাভরিন ধমকায় ইয়াকভকে।

ওই কয়েক মিনিটের মধ্যে ইয়াকভের রক্তের মধ্যে অপমানজনিত ক্রোধের একটা প্রবাহ বয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা অনুভূতি তাকে দমিয়ে দিল। এই বোধটি হল তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতোই ছোটখাটো এই মেয়েমানুষটি তার জীবনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। এই অনুভূতি থেকেই তার শরীরে রাগ আবার ফিরে এল। নির্মম কঠিন হয়ে উঠল তার মন। উঠে দাঁড়িয়ে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে চিৎকার করে বলল, আমি তোকে খুন করবো।

লেফটেনান্ট মাভরিন চকিতে এগিয়ে এসে ইয়াকভের কব্জি চেপে ধরে মুচড়ে দিতেই পকেট ভেদ করে গুলিটা বেরিয়ে যায়। ইয়াকভ যন্ত্রণায় পকেট থেকে হাত বের করে আনে। মনে হচ্ছে তার হাতটা বুঝি ভেঙে গিয়েছে। মাভরিন ইয়াকভের হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, কোনো লাভ নেই, বুঝলে?

ততক্ষণে পলিনা চাপা গলায় চিৎকার করে বলছে, ইয়াশা! ইপ্পোলিত সার্জিয়েভ তোমরা কি বিবেক বুদ্ধি সব হারিয়ে বসেছ না কি! এসব কী হচ্ছে? একটা কেলেঙ্কারি বাধাবে দেখছি।

ততক্ষণে সেই নির্মম কঠিন লেফটেনান্ট ইয়াকভের দাড়ি ধরে নমস্কার করার ভঙ্গিতে তার মাথাটাকে নোয়াচ্ছে আবার তুলছে।

লেফটেনান্টের কনুই ধরে টেনে পলিনা বলতে থাকে, এ কি করছেন, কী লজ্জার ব্যাপার!

ইয়াকভ ডান হাতটা নাড়াতেই পারছে না তবু দাঁতে দাঁত চেপে বাঁ হাত দিয়ে সে লেফটেনান্টকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে থাকে। গলা দিয়ে তখন তার গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসছে এবং অপমানে তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে আসছে।

আমাকে ধাক্কা দিস তোর এত সাহস? লেফটেনান্ট গর্জন করে ওঠে তারপর ধাক্কা দিয়ে ইয়াকভকে ফেলে দেয় সেই চেয়ারের ওপর যার ওপর রিভলভারটা পড়েছিল। ইয়াকভ চোখের জল ঢাকার জন্যে দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল। পলিনার ক্রুদ্ধস্বর শুনতে পায় সে, ছিঃ ছিঃ, এ কি কেলেঙ্কারি কাণ্ড করলে তুমি?

জাহান্নামে যাও তুমি, লেফটেনান্ট বজ্রকণ্ঠে গালাগালি দেয় পলিনাকে। এই নাও একটি রুবল, আনন্দ দেবার জন্যে ওই যথেষ্ট, তুমি একটি সাধারণ···! দড়াম করে দরজাটা ঠেলে দিয়ে গটমট করে বেরিয়ে যায় লেফটেনান্ট মাভরিন।

পলিনার ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা যায়। ইয়াকভের সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে, অতি কষ্টে সে উঠে দাঁড়াল। পলিনা বাতির তলায় ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, ময়লা নোটটার দিকে তাকিয়ে আছে।

ইয়াকভ চিৎকার করে উঠল, কেন এ কাজ করলি···তোকে অনেক আগেই আমার খুন করা উচিত ছিল।

পলিনা একবার চোখ তুলে তাকাল তারপর চকিতে চেয়ারের ওপর পড়ে থাকা রিভলভারের ওপর বসে পড়ল।

ইয়াকভ পলিনার কাঁধে ঘুষি মেরে বলল, অনেক হয়েছে, আমার রিভলভারটা দাও।

পলিনা একটুও নড়ল না বরং বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, তাহলে তুমি আমাকে ভালোবাসো?

না, আমি ঘৃণা করি।

মিথ্যে কথা। অন্ততঃ এই মুহূর্তে তুমি আমাকে ভালোবাসো।

আচমকা পলিনা ইয়াকভকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরল যে সে পলিনাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার কোনো অবকাশই পেল না। সুদৃঢ় বন্ধনে কণ্ঠলগ্না হয়ে পলিনা উত্তপ্ত চুম্বনে চুম্বনে ইয়াকভকে অধীর করে তোলে। পলিনার উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের পরশ লাগে ইয়াকভের চোখে, ঠোঁটে। এরই মাঝে সে মেয়ে বলে যায়, মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা। নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ভালোবাসো, আমিও তোমাকে ভালোবাসি, আমার আদরের 'নুনের কণা'।

নিগূঢ় ভালোবাসার মুহূর্তেই আমার আদরের 'নুনের কণা' বলে পলিনা নিজেকে উজাড় করে দেয়। আর ওই বিশেষ সম্বোধন শুনলেই ইয়াকভের মন প্রশান্তিতে ভরে যায়। এখনো ঠিক তাই-ই হল। তবু মুখে বলল, নীচ কোথাকার! তুমি নিশ্চয়ই জানতে···

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল কোচে বসে আছে ইয়াকভ আর তার কোলের ওপর আধশোয়া অবস্থায় পলিনা।

ক্লান্তস্বরে পলিনা বলে, তোমার ওপর খুব চটে গিয়েছিলাম, একবার ভেবেছিলাম তোমাকে ছেড়েই দেব। তুমি তো আত্মীয়স্বজনের শ্রাদ্ধশান্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকো, আমার যে কী একঘেয়ে লাগে তা কি তুমি বোঝ?

তা ছাড়া তুমি আমাকে সত্যিই ভালোবাসো কি না তাও তো জানি না। তবে এখন থেকে যে তুমি আমাকে ভালোবাসবে তাও আমি জানি কারণ আমার সম্পর্কে তোমার ঈর্ষা জেগেছে আর ঈর্ষা না থাকলে...

ইয়াকভ বলে, আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত।

হ্যাঁ হ্যাঁ চল, প্যারিস চলে যাই। আমি ফ্রেঞ্চ জানি।

ওরা আলো জ্বালেনি, ঘর অন্ধকার। যদিও মাঝরাত পার হয়ে গেছে শুধু বাইরে সৈন্যবাহিনীর চিৎকার আর মেয়েদের হল্লার শব্দ ভেসে আসছে। ইয়াকভ বলে, এখন বিদেশে যাওয়া সম্ভব নয়, যুদ্ধ বেধেছে।

পলিনা আবার নিজের কথাই বলা শুরু করল। কুকুরদের ভালোবাসাতেই শুধু জেলাসি নেই। উপন্যাস, নাটকের ভিত্তিই তো জেলাসি।

ইয়াকভের মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে কিন্তু পরমুহূর্তেই সে শিউরে উঠে বলে, খুব বেঁচে গিয়েছি, গুলিটা আমার পায়েও লাগতে পারতো। দেখ প্যান্টে শুধু একটা ফুটো হয়েছে।

পলিনা প্যান্টের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে বলে, ইস, কী অপমানটাই না করলে লোকটা আমায়। তুমি কেন গুলি করে ওর রবারের মতো ভুঁড়িটা ফাঁসিয়ে দিলে না!

ইয়াকভ বলল, চুপ কর।

পলিনা আবার দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তোমরা সব পুরুষমানুষই এক রকম। মেয়েমানুষের মন বোঝ না। একবার বিশ্বাসঘাতকতা করলেই প্রমাণ হয় না যে সেই পুরুষকে সে আর ভালোবাসে না।

চুপ কর বলছি,---বলেই ইয়াকভ পলিনাকে এমন চেপে ধরে যে সে ককিয়ে ওঠে।

ইয়াকভ ছেড়ে দিলে পলিনা সোল্লাসে বলে ওঠে, ঠিকই বুঝেছিলাম তুমি আমাকে ভালোবাসো। আমার আদরের 'নুনের কণা'।

ভোরের দিকে ইয়াকভ পলিনার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এমন হালকা মন নিয়ে অনেকদিন সে হাঁটেনি। তার মনের অবস্থা এখন অনেকটা সদ্য ট্রফি জয় করা একজন মানুষের মতো। বেরিয়ে আসার আগে পলিনার কাছে সে রিভলভারটি ফেরত চায়। পলিনা সেটিকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল। পলিনা রিভলভার ফেরত দিতে না চাওয়ায় ইয়াকভকে বাধ্য হয়েই নস্কভ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলতে হয়। রিভলভার ছাড়া রাস্তায় চলাফেরা করা যে তার পক্ষে নিরাপদ নয় একথা বলার পর পলিনার উদ্বেগ লক্ষ্য করে খুশি হয় ইয়াকভ। সত্যিই তাহলে ও আমাকে ভালোবাসে, নিশ্চিত

হয় ইয়াকভ।

শিশুর মতো চপল হয়ে ওঠে পলিনা। এ যে একেবারে খাঁটি ডিটেকটিভ গল্পের মতো। শার্লক হোম্‌স্‌ পড়েছ? শার্লক হোম্‌সের গল্পের মতোই মজার। তবে এখানকার ডিটেকটিভগুলো খুব বদ।

ইয়াকভ সম্মতি জানিয়ে বলে, ঠিকই বলেছ।

রিভলভার ফেরত দিয়ে পলিনা আব্দার করে ওটা একবার পরীক্ষা করে দেখাতে। ফলে ইয়াকভকে পলিনার পাশে মেঝেতে উপুড় হয়ে শুতে হয় চুল্লির দিকে তাক করে ঘোড়া টিপতেই একগাদা ছাই এসে পড়ে ওদের চোখে মুখে। ভয়ে চিৎকার করে পলিনা উঠে পড়ে। হঠাৎই মেঝেতে একটা ফুটো দেখতে পেয়ে পলিনা সোল্লাসে বলে ওঠে, ওই দেখ, মৃত্যু ওই ফুটো দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

পলিনাকে এত মিষ্টি এর আগে কোনোদিন লাগেনি ইয়াকভের অপরাধবোধের কোনো ছাপও নেই এখন আর ওর মুখে। বিদায়ের মুহূর্তে আর একবার পলিনা সেই আদরের নাম ধরে তাকে ডাকে।

শিশিরভেজা শীতের সকাল। ধীরে বইছে বাতাস। অর্কিড বনে মুক্তোর মতো স্বচ্ছ আকাশ। বাতাসে আপেলের গন্ধ।

এবার ওকে বিয়ে করতেই হবে, খেয়ালের বশেই ও একটা অন্যায় করে ফেলেছিল। উদার মনে ভাবে ইয়াকভ। সেরাফিমের একটা কথা মনে পড়ে যায় ওর।

যে কোনো মেয়েই ডুবন্ত মানুষের মতো কুটোটাকেই আশ্রয় করে বাঁচতে চায়। কুটোটি হয়েই তুমি ওকে বাঁচাও।

ইয়াকভের মনে পড়ে যায় লেফটেনান্টের কথা। ও অবশ্যই কুটো নয়। লোকটা ঝামেলাও করতে পারে। তবে ভরসার কথা এই যে ওকে নিশ্চয়ই যুদ্ধে পাঠানো হবে। নস্কভের চিন্তাটা এখন আর তাকে তেমন উদ্বিগ্ন করে তুলল না।

দিন পনেরো পরে নস্কভের সঙ্গে আবার দেখা। মুখে তার সেই বিরক্তি-কর বিগলিত হাসি।

ভালোই হলো আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে। আপনার প্রেয়সীকে সাবধান করে দেবেন যেন স্লাভকোপেৎসভের মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা না করে।

ইয়াকভ বিরক্ত হয়ে বলে, কেন? কেন আমি বলতে যাব?

মনে রাখবেন আপনাকে সব সময় আমি সৎ পরামর্শই দিয়ে থাকি।

যথারীতি পঁয়ত্রিশটি রুবল নিয়ে নস্কভ বিদায় নেয়। ইয়াকভও তখনই

ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায় পলিনার কাছে।

সব শুনে পলিনা বলে, ওটা একটা শুয়োর। তা তুমি কি বললে?

এই জাতীয় মেয়ের সঙ্গে তোমার মেলামেশার দরকারটা কী? ইয়াকভ পাল্টা প্রশ্ন করে।

পলিনা তিক্তস্বরে জবাব দেয়, প্রথমতঃ তোমার ভালোর জন্যেই, দ্বিতীয়তঃ আমি তাহলে করবোটা কি? কুকুর বেড়াল পুষবো? নাকি লেফটেনান্ট মাভরিনকে নিয়ে থাকবো। বন্দীর মতো সারাটা দিন আমি একা একা কাটাই। ওকে আমার ভালো লাগে। আমাকে বই পড়তে দেয়, রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। পোপোভার স্কুলে দুজনে একসঙ্গে যাই। অবশ্য মাঝে মাঝে ঝগড়াও হয়।

ইয়াকভের কাঁধে খোঁচা দিয়ে তীব্রতম অনুযোগের স্বরে পলিনা আবার বলতে শুরু করে, তুমি কি মনে কর রক্ষিতার মতো এভাবে গোপন জীবন যাপন করা খুব সুখের? ও বলে রক্ষিতা হচ্ছে রবারের দস্তানার মতো। ময়লা কিংবা কাদা থেকে হাত বাঁচানোর জন্যে কাজে লাগে। আলসারের মতো তুমি আমাকে লুকিয়ে রেখেছ। আমি কি কুঁজো না কানা যে আমাকে নিয়ে রাস্তায় বেরোতে তুমি লজ্জা পাও?

চুপ কর! থামো তো এবার। আমি সিরিয়াসলি বলছি! তোমায় বিয়ে আমি করবোই।

সেই মিষ্টি নাম ধরে পলিনা আবার ইয়াকভকে সম্বোধন করে বলে, অন্য লোক হলে নিশ্চয়ই তুমি তার গলা টিপে ধরতে কিন্তু লোকটাকে যে তোমার প্রয়োজন।

কয়েকদিন পরেই খবর পাওয়া গেল নস্কভ জলে ডুবে মারা গেছে এবং কারখানার নিরীহ শ্রমিক মরড্‌ভিনভ নাকি ওকে বাঁচাতে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

ইয়াকভ বুঝলো নস্কভকে খুন করা হয়েছে। মাছ ধরতে গিয়েই নাকি এই দুর্ঘটনা। ইয়াকভ মনে মনে বলল, নাকি অ্যাকসিডেন্ট!

দিন কয়েক বেশ শান্তিতেই কাটলো। ইতিমধ্যে ইয়াকভ একবার ভোর্গোরোড থেকে ঘুরে এসেছে। ফিরে আসতেই মীরন খবর দিল মিলে আবার অশান্তি শুরু হয়েছে। গোয়েন্দার একটি দল এসেছে নস্কভের মৃত্যুর তদন্ত করতে। মরড্‌ভিনভকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যারা যারা সেদিন মাছ ধরতে গিয়েছিল তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওরা এর মধ্যে রাজনীতির গন্ধ পেয়েছে।

মীরন অবশ্য এই সংবাদটুকু পরিবেশন করেই ক্ষান্ত হয়নি, স্বভাবসুলভ উদ্ধত ভঙ্গিতে সে সবাইকে তার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাও শুনতে বাধ্য করে।

একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে। বোকামিতে পেয়েছে সবাইকে। আবার একটা যুদ্ধের সম্মুখীন হতে চলেছি আমরা। কৃষকদের দেশে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে। আর ওই শ্রেণীরই শরিক হয়েছে ইলিয়া। যে শ্রেণীর ওপর মহান দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে দেশটাকে ইউরোপীয় ধাঁচে টেকনোলজি ও শিল্পায়নে উন্নত করে তোলা তাদেরই একজনের সন্তান হয়ে নিজের শ্রেণীর বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে ইলিয়া। অদ্ভুত সব কাণ্ড! শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা জঘন্য অপরাধ। গোরিংসভিয়েতভের মতো আঁতেলদের হয়তো এসব জিনিস মানায়। আমার তো মনে হয় গঠনমূলক কাজ করার ক্ষমতা যাদের নেই রাশিয়ায় সেই সব লোকই বিপ্লবের দিকে ঝুঁকছে।

মীরনের বক্তৃতা হয়তো আরো কিছুক্ষণ চলতো যদি না স্ত্রীর আবির্ভাব ঘটতো। মীরনের গর্ভবতী স্ত্রী তার বিশাল বপু নিয়ে এসে স্বামীকে বলল, তোমার এবার জামাকাপড় পাল্টাবার সময় হয়েছে। মীরনও সুড়সুড় করে স্ত্রীর অনুসরণ করে ভিতরের ঘরে চলে যায়।

মাসখানেক পরে গ্রেপ্তার হওয়া শ্রমিকরা মুক্তি পেয়ে ফিরে এল। মীরনের আদেশে একজন ছাড়া আর কাউকেই চাকরিতে ফিরিয়ে নেওয়া হলো না।

ইয়াকভের দিনগুলো মোটামুটি নির্বিঘ্নেই কাটছিল। তবু ঝামেলা যে শেষ হয়নি তা সে বুঝতে পারছিল। তাকে খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতেও হলো না। একদিন গোয়েন্দাপ্রধান নেস্তেরেংকার জরুরী তলব পেয়ে সে দেখা করতে গেল।

গোয়েন্দাপ্রধান ইয়াকভকে জানাল নস্কভকে যে হত্যা করা হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তবে প্রমাণ করা যাচ্ছে না। ইয়াকভের প্রেয়সীর সেই বান্ধবীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গোয়েন্দাপ্রধান ইয়াকভকে এই সংবাদটি দিয়ে প্রশ্ন করলেন নস্কভের ব্যাপারটি সে কারো কাছে ফাঁস করে দিয়েছে কি না। ইয়াকভ অস্বীকার করলেও নেস্তেরেংকা যে বিশ্বাস করেনি তা বোঝা গেল তার পরবর্তী মন্তব্যে।

তুমি যথেষ্ট সাবধানী নও। নস্কভের জায়গায় আর একজনকে নিয়োগ করা হয়েছে, ভবিষ্যতে কোনো মহিলার কাছে এ ব্যাপারে তুমি কিছু বলবে না।

ইয়াকভ মনে মনে বলে—এবার পালাতে হবে নইলে এই লোকটা আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে কে জানে!

হিমেল বাতাস আর তুষারপাতের মধ্যে মালগাড়ি যেমন শ্লথ গতিতে চলে সেই ভাবেই দিন কাটছিল। মাসের পর মাস কেটে গেল।

একদিন জাখর মোরোজোভ যুদ্ধ থেকে ফিরে এল। বুকের ওপর সেন্ট জর্জ পদক আঁটা। মাথায় ওর একটিও চুল অবশিষ্ট নেই, চুলহীন মাথায় ফোস্কার মতো লাল লাল দাগ। একটি ভুরু নেই, সেখানে কাটা দাগ, তার নিচে চোখটিও নষ্ট হয়ে গেছে। অন্য চোখ দিয়েই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জগৎটাকে সে দেখে।

কি ব্যাপার জাখর, আমরা কি ঠিকমতো যুদ্ধ করতে পারিনি?

ইয়াকভ প্রশ্ন করে।

ঠিকমতো যুদ্ধ করার আমাদের কিছুই ছিল না। তারপর উদ্ধত ভঙ্গিতে রুক্ষস্বরে ইয়াকভের মুখের ওপরেই সে বলল, আমরা আর মনিব চাই না, সর্বত্রই ঠগ আর জোচ্চোররা মাথার ওপর বসে আছে।

কয়েকদিন পরে জাখর এক কাণ্ড করে বসল। লোমে ভরা তার সুন্দর কুকুরটির লেজে সেন্ট জর্জ পদকটি বেঁধে প্রকাশ্যে ঘুরিয়ে বেড়াল। তার এই ঔদ্ধত্য মীরনের কাছে অসহ্য মনে হল এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হল কুকুরটার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিল টিখন।

ভেরা পোপোভার নেতৃত্বে মেয়েরা বিকলাঙ্গ সৈনিকদের হাটিয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকে। এদের কারো হাত নেই, কারো একটি পা নেই, কেউ অন্ধ পলিনাকেও এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। পলিনা ইয়াকভকে বলল, আমার আর ভালো লাগে না এ কাজ করতে। কি দুর্গন্ধ ওদের গায়ে। আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চল।

ইয়াকভ লক্ষ্য করল তার প্রেয়সীর মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে ধূমপানের মাত্রা এত বাড়িয়েছে যে নিঃশ্বাসেও তামাকের গন্ধ।

কি শহরে কি কারখানায় সর্বত্রই মেয়েদের খিটখিটে মেজাজ, জিনিস-পত্তরের দাম বাড়ায় বিরক্তি প্রকাশ করছে। ওদের স্বামীরা কাজে ঢিলেমি দিয়েছে, অন্য দিকে মাইনে বাড়াবার জন্যে আন্দোলন করছে। বিকেলের দিকে শ্রমিক বস্তিতে তীক্ষ্ণ চিৎকার আর ঝগড়াঝাটিতে সোরগোল এমন চরমে ওঠে যা আগে কোনোদিন হয়নি।

ভাঙাচোরা একটি মেশিনের মতো পিওতর মাঝে মাঝে কারখানার উঠোনে ঘুরে বেড়ায়। হাঁটার শক্তি নেই, পা দুটো অতি কষ্টে টানতে টানতে

নিয়ে যায়। চওড়া কাঁধের ওপর বেড়াবার ছেঁড়া কোটটা ঝুলতে থাকে। যাকে কাছে পায় তাকেই প্রশ্ন করে, এই কোথায় যাচ্ছিস?

শ্রমিকদের উত্তর শুনে বিড়বিড় করে বলতে থাকে, যা, কাজে যা। যত সব লোফার, ছারপোকা। আমার রক্ত চুষে খেয়েছে সব।

ইয়াকভ বাবার চেহারা, ভাবভঙ্গি ও এইভাবে ঘুরে বেড়ানো দেখে লজ্জা পায়। এদিকে মীরনের যেন ডানা গজিয়েছে, সে একবার মস্কো একবার পিট্ সবার্গ ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার মস্কো থেকে ঘুরে এসে আমেরিকান জুতো পায়ে দিয়ে ঘরে পায়চারি করতে করতে সে বর্ণনা করতে লাগল কিভাবে একজন মাতাল লম্পট চাষা জোঁকের মতো জারের গায়ে লেগেছিল।

নাতিনাতনীকে নিয়ে অন্ধ ওর্লোভা সোফায় বসে ছিল। সে প্রতিবাদ করে বসল, সব বানানো কথা। এরকম কোনো চাষা কোথাও নেই।

তাতানিয়ার হাসিখুশি বরটি উল্লাসে হাততালি দিয়ে বলল, চমৎকার! এইবার গ্রাম প্রতিশোধ নেবে।

তাতানিয়া বিরক্ত হয়ে বলে, তোমার এত খুশির কারণ কি তো বুঝতে পারছি না!

বুঝতে পারছো না? ও তো একটা স্বতন্ত্র চাষা নয়, ও হচ্ছে একটা প্রতীক!

মীরন ভ্রূকুটি করে বলে, ক'দিন আগেই তো তুমি অন্য সুরে কথা বলছিলে। তোমার মতলবটা কি? যে দিকে বাতাস বয় সেইদিকেই ঘুরছো দেখি।

জনগণের ইচ্ছা···জনগণের অধিকার···বুঝলেন না। মিত্যা হাসি হাসি মুখে বলে।

মীরন চিৎকার করে বলল, তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ সেটাই আমি জানতে চাই।

বড্ড চেঁচামেচি হচ্ছে—পিওতর বিরক্তি প্রকাশ করল। ইয়াকভ অবিশ্যি লক্ষ্য করে দেখল জামাইয়ের সঙ্গে ভাইপোর ঝগড়া লাগায় বাবার চোখে খুশির ঝিলিক। আর একটি ব্যাপারও ইয়াকভের দৃষ্টি এড়ায় না। এত লোকের মধ্যে একমাত্র মিত্যাই যেন আসন্ন কোনো সাফল্যের নিশ্চিত আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে।

আতঙ্কিত হয়ে ওঠার মতো রোজই একটা না একটা কিছু ঘটছে, যদিও একটা ঘটনার সঙ্গে আরেকটির কোনো যোগাযোগ নেই। এই ডামাডোলের

মধ্যে দুদিনের সর্দি-জ্বরে ওর্লোভা মারা গেল। ওর্লোভার মৃত্যুর কয়েকদিন পরে জারের পতন ঘটলো। কারখানা এবং সন্নিহিত অঞ্চল বজ্রপাতের মতো আলোড়িত হয়ে উঠল।

ইয়াকভ মীরনকে প্রশ্ন করল, এবার কি তবে সাধারণতন্ত্র?

তাই তো মনে হয়।

মীরনকে খুবই উত্তেজিত মনে হল। শরীরের ভারে খবরের কাগজখানা ছিঁড়ে দু টুকরো হয়ে গেল। পরের দিন বিকেলেই সে মস্কো রওনা হয়ে যাবে বলে ঘোষণা করল।

উৎফুল্ল মিত্যা বলল, এবার সব কিছুই ভালো হয়ে যাবে। যে বলিষ্ঠ আবেগ মানুষের বুকের মধ্যে জমাট বেঁধে ছিল এবার সে বাঁধ ভেঙে যাবে।

মীরন কিছু বলল না, তার মুখে শুধু চাপা হাসি ফুটে উঠল। ইয়াকভ লক্ষ্য করল সকলের মধ্যেই যেন খুশির ছোঁয়া লেগেছে। শ্রমিকদের এক সমাবেশে মিত্যা পিটার্সবার্গে কি ঘটেছে জানাতেই শ্রমিকরা মিত্যাকে টেনে এনে লোফালুফি খেলায় মেতে উঠল। শ্রমিকরা ইয়াকভকেও চেয়েছিল কিন্তু সে পালিয়ে গেল। ইয়াকভ ভালোভাবেই জানে শ্রমিকরা তাকে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেবে কিন্তু কেউ আর হাত বাড়িয়ে তাকে ধরবে না।

কয়েকদিন পরে অফিসঘরে বসে টিখনের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় ইয়াকভ। টিখন কাকে যেন বলছে, কুকুরটাকে আমার কাছে রেখে যা, ওকে আমি ট্রেনিং দেব।

বুড়ো, এই কি কুকুরকে ট্রেনিং দেবার সময়? জাখরের কণ্ঠস্বর।

বেশ বেশ, একটা রুবল দিচ্ছি, নিয়ে যা।

জাখর মোরোজোভ চলে যেতেই ইয়াকভ টিখনের কাছে গিয়ে বলে, খবর শুনেছ?

হুঁ, ওরা জারকে টেনে নামিয়েছে।

জুতো ঠিক করতে করতে মাথা নিচু করে টিখন মন্তব্য করে, তাহলে ঝড় উঠেছে অর্থাৎ আস্তানুস্কা যা বলতো—ওয়াগনের একটা চাকা ভেঙে গিয়েছে।

এদিকে পলিনা ক্রমশই অশান্ত হয়ে উঠছে। ইয়াকভকে সে বলে, আমার পক্ষে এখানে আর কোনোমতেই থাকা সম্ভব নয়। যেকোনো মুহূর্তে আমার বিপদ ঘটতে পারে।

ইয়াকভ পলিনার যুক্তির সারবত্তা মনে মনে স্বীকার করলেও মুখে বলে, আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, সবকিছু শান্ত হোক। নিজে যদিও ভালো-ভাবেই জানে পরিবেশ শান্ত হবার কোনো লক্ষণই নেই। কারখানায়

বিক্ষোভ চরমে উঠেছে আর যে লোকটির শক্ত চোয়ালকে ইয়াকভ সবচেয়ে বেশি ভয় করে সেই জাখর মোরোজোভ কখন শ্রমিকদের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে উঠেছে।

জাখরকে বলতে শোনা যায়, কমরেড্স শৃঙ্খলা বজায় রাখুন।

একদিন তাকে দেখা গেল বিচারকের আসনে বসে তিনজন শ্রমিকের বিচার করতে। এরা কারখানা থেকে সুতো চুরি করেছিল। জাখরকে বলতে শোনা গেল, জানো, তোমরা কার জিনিস চুরি করেছ? আমার জিনিস, তোমার জিনিস, আমাদের সকলের জিনিস।

শ্রমিক তিনজনকে বেত্রাঘাতের আদেশ দিল জাখর আর কয়েকজন এগিয়ে এসে সেই আদেশ কার্যকর করল।

সেদিন রাতেই তাতানিয়ার ঘরে তুমুল ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেল ইয়াকভ। তাতানিয়া স্বামীকে বলছে, তুমি তো একটা ভাঁড়, ছিটেফোঁটাও আত্মসম্মান নেই তোমার? বিশ্বাস বলে কোনো বস্তুই নেই তোমার মধ্যে। ভিখিরিদের আবার মতামত, বিশ্বাস থাকে না কি? অনেক হয়েছে, আমি কালই চলে যাচ্ছি মস্কো, ওখানে দিদির কাছে গিয়ে থাকবো।

ইয়াকভ এই ঘটনায় একটুও বিস্মিত হল না। অনেকদিন আগেই সে লক্ষ্য করেছে মিত্যা একটি সন্দেহভাজন বিশংকিত চরিত্রের লোক।

কয়েকদিন পরে মিত্যা তার জিনিসপত্তর নিয়ে শহরে চলে গেল। জিনিসপত্তর বলতে তিন বস্তা বই ও এক বাক্স জামাকাপড়।

অস্থিরতার অবসানের কোনো লক্ষণই দেখতে না পেয়ে ইয়াকভ স্থির করে ফেলেছে অবিলম্বে তাকে দেশ ছাড়তে হবে।

পলিনাকে গিয়ে সে বলল, শোনো, আমি স্থির করে ফেলেছি এখান থেকে আমরা চলে যাবো। প্রথমে আমরা মস্কো যাবো তারপর স্থির করবো কি করা যায়।

পলিনা আনন্দে অধীর হয়ে উঠে ইয়াকভকে চুম্বনে চুম্বনে পাগল করে তোলে।

জুলাই মাসের এক মনোরম সন্ধ্যা। বাগানে ছড়িয়ে পড়েছে গোধূলির রক্তিম আলো। কিন্তু মনে নেই শান্তি, অনেক অশুভ চিন্তা ছায়া ফেলছে মনের অঙ্গনে।

ইয়াকভ কাঁধের ওপর থেকে পলিনার ঘামে ভেজা উষ্ণ হাতখানা সরিয়ে বলল, পলিনা, গায়ে কিছু একটা চাপাও, তারপর এসো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনাটা সেরে ফেলি।

পলিনা ইয়াকভের হাঁটু থেকে নেমে বিছানার কাছে গিয়ে একখানা চাদর তুলে নিয়ে খোলা বুকের ওপর জড়িয়ে নেয়। তারপর গুরুতর কাজের কথা শোনার উপযোগী গাম্ভীর্য নিয়ে ইয়াকভের গা ঘেঁষে বসে।

দাড়ি ঘষতে ঘষতে ইয়াকভ বলে, শোনো, এমন একটা জায়গা, এমন একটা দেশে আমাদের যেতে হবে যেখানে অবিচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করছে। যেখানে কিছু ভেবে দেখার, কিছু বুঝে নেবার দরকার নেই, কারো ব্যাপারে মাথা ঘামাবারও নেই।

তা তো ঠিকই—পলিনা সায় দিয়ে বলে।

হ্যাঁ, আর একটা কথা। সব কিছু গোপনে করতে হবে। ট্রেনে এখন পলাতক সৈন্যদের খুব ভিড়। আমাদের গরীব সেজে যেতে হবে। শুধু সঙ্গে কিছু টাকা থাকা দরকার। অবশ্য একবার মস্কো পৌঁছে গেলে টাকার অভাব আমার হবে না, ওখানে আমার অনেক টাকা আছে।

পলিনা বলে, যাই করো তাড়াতাড়ি করো, এখানে একটি দিনও আমার থাকতে ভয় করে।

ইয়াকভ বলল, থামো। তারপর ফিসফিস করে বলল, শোনো, আমি আগে চলে যাবো তারপর তুমি মস্কোতে আমার সঙ্গে মিলিত হবে।

পলিনা বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠল, না না, তা হবে না। আমি আগে যাবো এবং তুমি আমার হাতে যথেষ্ট টাকা দিয়ে দেবে।

ক্ষুণ্ণস্বরে ইয়াকভ বলল, তুমি তাহলে আমাকে বিশ্বাস করো না।

না, করি না। পলিনার সুস্পষ্ট উত্তর। তারপর সে আরো বলে, এখানকার পরিবেশে কে কাকে বিশ্বাস করে? তাহলে জারের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা হল কেন? তুমি নিজেই কাউকে বিশ্বাস কর কি?

ইয়াকভের কাছে পলিনার যুক্তিগুলো সত্য বলেই প্রতিভাত হয়, তার চেয়েও বড় সত্য পলিনার বুকের শোভা। চাদরের ভাঁজের ভেতর থেকে সুন্দর সুডৌল দুটি স্তনের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। অতএব ইয়াকভ পলিনার দাবির কাছে হার মানে। স্থির হয় জিমিসপত্র গুছিয়ে পলিনা আগামীকালই যাত্রা করবে এবং মস্কো পৌঁছে ইয়াকভের জন্যে অপেক্ষা করবে।

পরের দিন সকালে ইয়াকভ বাড়িতে মাথা ধরা, পেটের যন্ত্রণা ইত্যাদি বলে নিজেকে অসুস্থ বলে প্রমাণ করল। সম্প্রতি সে অনেক রোগা হয়ে গেছে তাই তার কথা সকলের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হল। আটদিন পর ইয়াকভ রেলওয়ে স্টেশনের দিকে যাত্রা করল।

মাসখানেক পরে মস্কো থেকে ফিরে মীরন তাতানিয়ার সঙ্গে দেখা করল। মাথা নিচু করে হাতের রেখা দেখতে দেখতে সে বলল, তোমাকে একটা দুঃসংবাদ দিতে এসেছি। যে বেশ্যাটির সঙ্গে ইয়াকভ থাকতো, সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তার কাছ থেকেই জেনেছি, ইয়াকভকে ট্রেনে কিছু লোক মারধোর করে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেয়।

না! তাতানিয়া কান্নায় ভেঙে পড়ে চিৎকার করে উঠল।

দু'দিন পরে সে মারা যায় এবং পেটুস্কি নামে একটা কবরখানায় তাকে কবর দেয়।

তাতানিয়া চোখের ওপর রুমাল চেপে ধরে চোখের জল আটকাচ্ছিল। শরীর তার থরথর করে কাঁপছে।

দেখো, কেঁদে কোনো লাভ নেই। সত্যি কথা বলতে কি সে তোমার কিংবা আমার কাছে কোনো কাজেরই ছিল না। তা ছাড়া যদি কিছু মনে না কর তাহলে বলি সে ছিল আমাদের পরিবারের কলঙ্ক।

হায় ভগবান! তাতানিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

শোনো, কাজের কথা বলি। খবরটা চেপে রাখতে হবে। তোমার বাবার অবশ্য বোধশক্তি লুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু মা কান্নাকাটি করে অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

তাতানিয়া বলল, এইভাবে একে একে আমরা সবাই তাহলে শেষ হয়ে যাবো।

হ্যাঁ, এখানে থাকলে তাই হবে। আমার পরামর্শ হচ্ছে যত শীগগির পারো এখান থেকে পালাও। আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানদের এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

স্ত্রীর অসুস্থতার নাম করে মীরন বিদায় নেয়।

পিওতর আর্টামনোভ অর্ধেক চৈতন্য লুপ্ত স্থবির একটি মানুষে পরিণত হয়েছে। ভারি শরীরটা নিয়ে বিছানাতেই সে সারাদিন পড়ে থাকে। ঘুমের মধ্যেই অধিকাংশ সময় তার কাটে। বাকি সময়টা জানলার পাশে ইজি-চেয়ারে আধশোওয়া হয়ে বাইরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। স্ত্রী এসে বলে, আমার মনে হয় কিছুদিনের জন্যে তোমার বাইরে ঘুরে আসা উচিত। তোমার চিকিৎসা করানো দরকার।

পিওতর খেঁকিয়ে ওঠে, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। তোমার সঙ্গ এখন আমার কাছে দুবিসহ হয়ে উঠেছে। তারপর বিড়বিড় করে আপন মনে

বলতে থাকে, উঠোনে, বাগানে সর্বত্রই তো দেখছি সবাই উৎসবে মেতে উঠেছে। কারখানাটাই যে কেন নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে তা তো বুঝতে পারছি না।

পিওত্‌রের যে দ্বিতীয় সত্তাটি মাঝে মাঝে তাকে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তুলতো, ভাবতো তার মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন আগেই। সুখের কথা পিওত্‌রের চিন্তা করার ক্ষমতাই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। চিন্তা করতে তার ভালোও লাগে না। কী হবে চিন্তা করে? ওতে কোনো লাভ নেই। কিন্তু বাড়ির আর সবাই গেল কোথায়? ভোজবাজির মতো সবাই অদৃশ্য হয়ে গেল না কি? ইয়াকভ, তাতানিয়া, মিত্যা কোথায় গেল সবাই?

কখনো কখনো স্ত্রীকে সে প্রশ্ন করে, ইলিয়া ফিরেছে?

না।

এখনো না?

না, এখনো ফেরেনি।

ইয়াকভ?

সেও ফেরেনি।

হ্যাঁ, ওরা সবাই জীবনটা ফুর্তিতে কাটাচ্ছে আর মীরন লুটেপুটে খাচ্ছে। জোঁকের মতো ব্যবসার রক্ত চুষে নিচ্ছে সে।

নাতালিয়া পরামর্শ দেবার ভঙ্গিতে বলে, ওসব নিয়ে এখন আর ভেবো না।

পিওত্‌র আবার খেঁকিয়ে ওঠে, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

নাতালিয়া ধীরে ধীরে সরে আসে। ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তার দীর্ঘদিনের জীবনসঙ্গী। জীবনের অধিকাংশ সময়টাই কেটেছে এই মানুষটির সঙ্গে। সে নিজেও অসুস্থ, হাতে পায়ে জোর নেই, মোমের মতো গলতে গলতে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে।

কয়েকদিন ধরে খুব ঘন ঘন পিওত্‌র অনুভব করে ঘরের মধ্যে যেন বাইরের লোকজন যাতায়াত করছে। অন্য এক ধরনের শব্দ, অপরিচিত কণ্ঠস্বরে সে চমকে ওঠে। সেদিন এমনি কিছু অপরিচিত লোক দেখে পিওত্‌র বুঝতে চেষ্টা করছিল—এরা কারা? কি চায়? তখনই স্ত্রীর কান্না-মেশানো স্বর সে শুনতে পায়।

এ কি? কি করছো তোমরা? উনি তোমাদের মনিব তো। মনিব কি না বল? উনি অসুস্থ, ওঁর চিকিৎসার প্রয়োজন। ওঁকে আমি শহরে নিয়ে যাবো চিকিৎসার জন্যে।

পিওতর ধরে নেয় স্ত্রী তার কাছে কিছু লুকোচ্ছে। আপন মনে সে বিড়বিড় করে বলতে থাকে, আমার কাছে লুকোনো হচ্ছে। মূর্খ কোথাকার! সারাটা জীবন শুধু বোকামিই করে গেল। ইয়াকভটাও ওর দলে। ঠিক আছে, ইলিয়াই আমাকে দেখবে। ও এসেই সব কিছুর মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে।

বৃষ্টি···তুষারপাত তারপর শাঁ শাঁ শব্দ করে ঝড়।

অর্ধ-অচেতন অবস্থায় খিদের জ্বালায় পিওতর যেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে জেগে ওঠে। বুঝতে পারে সে এখন বাগানের মধ্যে গ্রীষ্মাবাসে রয়েছে। তার বিপরীত দিকের কাঁচের দেওয়ালে গাছের ভিজে ডাল এসে লেগেছে। আর সেই কাঁচের মধ্য দিয়ে আকাশটাকে মনে হয় টকটকে লাল, খুব কাছেরও মনে হয়; মনে হচ্ছে আকাশটা যেন গাছের পিছনে ঝুলছে। হাত বাড়ালেই বুঝি স্পর্শ করা যাবে।

আমার খিদে পেয়েছে। সাধ্যমতো চিৎকার করে সে বলে কিন্তু কেউ উত্তর দেয় না।

গ্রীষ্মাবাসের সামনে পাশাপাশি দুটি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। পরস্পরের কাঁধে মাথা রেখে তারা বিশ্রাম করছে। একটির রং ধূসর আর একটির রং গাঢ়। সাদা সার্ট গায়ে একটি লোক বেঞ্চিতে বসে আছে। লোকটি লম্বা একগাছা দড়ির গিঁট খুলছে।

নাতালিয়া তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? আমাকে কিছু খেতে দাও।

প্রথম ডাকেই এতদিন সে স্ত্রীর কাছ থেকে সাড়া পেয়েছে। সব সময় কাছাকাছিই সে থাকতো। আজ সে কোথায় গেল?

অবাক হয়ে পিওতর ভাবতে থাকে। ও কি তাহলে···কিংবা ও বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

মাথাটা তুলতেই সে দেখতে পায় স্নানবাড়ির কাছে কি যেন একটা চকচক করছে। একটু পরেই বুঝতে পারে যে ওটা রাইফেল, বাঁটে বেয়নেট লাগানো। ঝোপের আড়ালে সৈনিকের শরীরটা ঢাকা পড়েছে শুধু সৈনিকের কাঁধের ওপর বেয়নেটটা দেখা যাচ্ছে। উঠোনে কে যেন একজন চিৎকার করে উঠল···

কমরেড এ কী হচ্ছে? এইভাবে বুঝি ঘোড়ার যত্ন নেয়? শুয়োরকেও লোকে এর চেয়ে বেশি যত্ন করে। আর খড়গুলোই বা কেন বাইরে পড়ে ভিজছে? স্নানবাড়িতে তালাচাবি বন্ধ করে তোমাদের রাখা হোক তাই চাও না কি?

যে লোকটি দড়ির গিঁট খুলছিল সে পাশের সৈন্যকে সংগোপনে বলে, উনি নিজেকে মনে করেন ইয়ে···শয়তানের চর!

পাশের সৈন্যটি উত্তর দেয়, আগের চাইতে এখন কমাণ্ডারের সংখ্যা যে অনেক বেড়ে গেছে।

এই শয়তানগুলোকে নিয়োগ করল কে?

ওরা নিজেরাই নিজেদের নিয়োগকর্তা। আজকাল এসব আপনা-আপনিই হয়ে যায়। সেই রূপকথার গল্পের মতো।

পিওতর সাধ্যমত জোরে চিৎকার করে বলে, এই কে আছ, আমার স্ত্রীকে ডেকে দাও।

এই বুড়ো, চুপ কর্। হুঁ! ওর এখন বউকে চাই।

ঘোড়াগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। পিওতর বরফের মতো ঠাণ্ডা আঙুল দিয়ে দাড়িতে হাত বোলায়, তারপর নিজেকে দেখে। সে এখন স্নান-বাড়ির একটা ঘরের জানলাবিহীন দেয়ালের দিকে পিঠ ফিরে শুয়ে আছে। দেয়ালে আঁকা আপেল গাছ থেকে থোকা থোকা ফল ঝুলছে। একটা শক্ত কিছুর ওপর সে শুয়ে আছে। ছেঁড়াফাটা তার জ্যাকেটটা গায়ের ওপর বেছানো। এ ছাড়া তার গায়ে রয়েছে আর একটি গরম জ্যাকেট তবু তার শরীর কিছুতেই গরম হচ্ছে না। সে বুঝেই উঠতে পারছে না কেন সে এখানে এভাবে পড়ে আছে। মনে হয় ছুটিছাটা থাকায় ঘরদোর পরিষ্কার করা হচ্ছে তাই এখানে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিসের ছুটি? বাগানের মধ্যে ঘোড়াই বা কেন? আর সৈন্যই বা বসে আছে কেন? আর ওই যে মাঝে মাঝে চিৎকার করছে সে কে?

কমরেড, তোমার মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছুই নেই। ক্লান্ত হয়ে পড়েছ? ক্লান্ত হবার এখনো অনেক দেরি। বোকার ভান করে থেকো না।

এই চিৎকারগুলো যদিও দূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট তবু তাই-ই যেন পিওতরের কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে, মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে। পা দুটি যেন তার নেই মনে হয় কারণ হাঁটুর নিচ থেকে তা আর নড়ছে না। দেওয়ালের গায়ে আপেল গাছটি এঁকেছিল আইভান লুকিন। লোকটা ছিল চোর। গির্জার জিনিসপত্তর চুরি করায় জেলের মধ্যেই মারা যায়।

কেউ একজন স্নানবাড়িতে ঢুকল। ভারিক্কী চেহারা, মাথায় একটা ছেঁড়া টুপি। লোকটা যেন আলকাতরার মতো কটু গন্ধ বয়ে নিয়ে আসছে।

কে হতে পারে? টিখন কি?

আর কে হতে পারে? টিখন বললে।

টিখনের গলার স্বরও কানে তালা ধরিয়ে দেয়। বুড়ো মালীটা এমন ভাবে হাঁটু দুটি দোলাতে দোলাতে আসছে যেন সে ক্যাঁচকেচে মেঝের ওপর দিয়ে সাঁতার কেটে আসছে।

বাইরে চিৎকার করছে কে?

জাখর মোরোজোভ।

আর ওই সৈন্যটা এখানে কি করছে?

যুদ্ধ চলছে যে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে পিওতর আবার প্রশ্ন করে, শত্রু এতদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

এ যুদ্ধ যে আপনারই বিরুদ্ধে, পিওতর ইলিচ।

মনিব কঠিন স্বরে ধমকে ওঠে, এই মূর্খ বুড়ো হাঁদা কোথাকার, আমার সঙ্গে ইয়াকি করবি না, আমি তোর কমরেড নই?

সত্যি বলতে কি টিখন বিদ্রূপই করছিল। মাথার টুপিটা না খুলেই সে মনিবের পায়ের কাছে কোনো ভনিতা না করে বসে পড়ে। বাইরে তখন কর্কশ কণ্ঠে কে যেন হুকুম জারি করছে—মনে থাকে যেন রাত আটটার পর বেসামরিক ব্যক্তিদের রাস্তায় চলা নিষেধ।

আমার বউ কোথায়? পিওতর জিজ্ঞেস করে।

তিনি রুটির সন্ধানে গিয়েছেন।

কি বলছ তুমি? 'সন্ধানে' মানে?

ঠিকই বলছি। রুটি তো আর পাথরের টুকরো নয় যে এখানে-সেখানে পড়ে আছে।

বাগানের নীল ছায়ার রং ঘন হয়ে আসে। সৈন্যটি জোরে জোরে কথা বলছে। তাকে চেনাই যাচ্ছে না, জলের মধ্যে মাছের মতো তার বেয়নেটটা শুধু চিক চিক করছে। অনেক প্রশ্নই পিওতরের করতে ইচ্ছা করছে কিন্তু সে মুখ বুজেই থাকে কারণ টিখনের কাছ থেকে কোনো যুক্তিসম্মত উত্তর পাওয়া যাবে না। তবু প্রশ্নগুলো তার মাথার মধ্যে পিছলে পিছলে যাচ্ছে এবং একটার সঙ্গে আরেকটা এমনভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে যে কোন্ প্রশ্নটা যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা সে বুঝেও উঠতে পারছে না। আসল কথা হচ্ছে সে এখন ভয়ংকরভাবে ক্ষুধার্ত।

ক্ষুব্ধ টিখন বলল, হ্যাঁ, আমি বোকা হতে পারি কিন্তু আসল সত্যটা যে কী তা আমিই প্রথমে বুঝেছিলাম। জীবনের পরিবর্তনটা কি ভাবে ঘটে সেটা এবার দেখুন। আমি চিরকাল বলে এসেছি সকলেরই সমানভাবে

কঠোরভাবে পরিশ্রম করা উচিত। দেখুন এবার তাই-ই সত্য প্রমাণিত হল। এত টাকা-পয়সা জমানো সত্ত্বেও ওরা আপনাকে ধুলোর মতো ঝেঁটিয়ে বার করে দিলে। এই-ই হয়, পিওতর ইলিচ। হ্যাঁ, শয়তান ছুরি চালিয়েছে আর আপনারা শয়তানের ছুরিতে শান দিয়েছেন ; আপনি এবং আপনারা এত পাপ করেছেন যে তা গুনে শেষ করা যাবে না। আমি সব কিছু লক্ষ্য করতাম আর আশ্চর্য হয়ে যেতাম। ভাবতাম কখন এ সবের শেষ হবে ? এখন আপনার পরিণতি ঘনিয়ে এসেছে। সীসের গুলিতে সব কাজের মূল্য এখন ফিরে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, ওয়াগনের একটা চাকা ভেঙে গিয়েছে।

ওটা পাগলের মতো বকছে। সিদ্ধান্তে পৌছয় পিওতর তবু প্রশ্ন করে, আমি এখানে কেন ?

আপনাকে ওরা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

মীরন কোথায় ?

সকলের একই পরিণতি।

ইয়াকভের কি খবর ?

সে তো অনেকদিনই এখানে নেই।

ইলিয়া কোথায় ?

শোনা যাচ্ছে যারা ক্ষমতায় এসেছে তাদের সঙ্গে আছে। নিশ্চয়ই তাই হবে। সে ক্ষমতায় আছে বলেই আপনি এখনো বেঁচে আছেন নইলে···

ওকে ক্ষেপামিতে পেয়েছে। এই বয়সে এটাই তো স্বাভাবিক। টিখন সম্পর্কে পিওতরের আগের সিদ্ধান্তই বহাল থাকে।

ক্ষুদে ক্ষুদে তারা আকাশে দেখা যাচ্ছে। ঠিক এভাবে অসংখ্য ক্ষুদে তারাদের আকাশের বুকে জ্বলজ্বল করতে পিওতর কোনোদিন দেখেনি।

টিখন টুপিটা খুলে ফেলে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আবার ক্ষোভ জানাতে থাকে।

আবার আপনার কথাতেই ফিরে আসি। ধূর্ত বুদ্ধির ফল ভোগ করছেন। ভিখিরিরাও অনেক সহজ জীবনযাপন করছে।

হঠাৎ-ই কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ পাল্টে টিখন প্রশ্ন করে, সেই ছেলেটির কথা মনে পড়ে ? সেই যে কেরানীর রুগ্ন ছেলেটা ?

কেন ? তার কথা এখন উঠছে কেন ?

পিওতর ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে ভয় পেয়েছে না আকস্মিক প্রশ্নে বিস্মিত হয়েছে। একটু পরেই অবশ্য সে বুঝতে পারে যখন টিখন আরো স্পষ্ট করে বলে, আপনি ওকে হত্যা করেছিলেন ঠিক যেভাবে আপনার

তার কুকুরটাকে হত্যা করেছিল।

এতক্ষণে পিওতর টিখনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। এতদিন পরে যখন কি না সে অসুস্থ এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তখন টিখন তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এতে যতটা না সে আতঙ্কিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ হয়েছে টিখনের অমানুষিক নির্বুদ্ধিতায়।

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে সে খানিকটা মাথা তুলে বলতে থাকে। তার বক্তব্যের মধ্যে অনুযোগ যেমন আছে তেমনি রয়েছে বিদ্রূপ। মুখটা তার ভীষণ শুকনো আর জিভটা তেতো লাগে।

মিথ্যে কথা। তাছাড়া সব অন্যায় কাজেরই শাস্তির একটা সময় থাকে। সে সময়সীমা পেরিয়ে গেছে। তোর শিকার ফসকে গেল। সেদিন তুই কি দেখেছিলি আর কি বলেছিলি তাও ভুলে গেছিস।

টিখন ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে, কি বলেছিলাম আমি? আপনাকে হত্যা করতে স্বচক্ষে অমি দেখিনি কিন্তু আমি ঠিকই বুঝেছিলাম। আমি যা বলেছিলাম তা আপনার মানসিক প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্যে। আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম আর আপনি খুশি হয়ে আমার কথাগুলো লুফে নিয়েছিলেন। আমি শুধু দেখে গেছি আর অপেক্ষা করেছি···হ্যাঁ, আপনারা সবাই একই ধাতুতে গড়া। আলেক্সি ইলিচ তার মাতাল শ্বশুরকে দিয়ে বাক্সির সরাইয়ে আগুন ধরায়। এর পিছনে কে আছে সঠিক অনুমান করে মাতালটাকে পিটিয়ে মারার ব্যবস্থা করেন আপনার বাবা। নিকিতাই একমাত্র আসল ঘটনাটা জানতো। হয়তো সে মুখ বুজেই থাকতো কিন্তু আপনার ওপর একবার খুব চটে গিয়ে সে আমাকে সব বলে দেয়। আমি তাকে বলেছিলাম, তুমি তো সাধু মানুষ, তোমার এসব ভুলে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমি মনে রাখবো। আপনার কাজকর্ম দেখে নিকিতা ভীত হয়ে উঠেছিল, শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি দিতে যায়, তারপর মঠে চলে যায় আপনাদেরই জন্যে প্রার্থনা করতে। আপনাদের জন্যে প্রার্থনা করতেও সে ভয় পেত আর সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত সে ঈশ্বরের ওপরেও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

টিখনের কথা বুঝি আর শেষ হবে না। বোধহয় পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত চলবে। টিখনের কথার মধ্যে কোনো বিদ্বেষ নেই। অত্যন্ত ধীরে সংযতভাবে সে কথা বলছে। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে টিখনের চেহারাটা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাত্রিবেলায় বাদুড়ের দলের উড়ে যাওয়ার মতো টিখনের খসখসে গলার স্বরে পিওতরের ভয় লাগে না ঠিকই কিন্তু কথাগুলোর গুরুভার তাকে কাবু করে ফেলে। পিওতর মনে মনে সান্ত্বনা

পাবার চেষ্টা করে নিশ্চয়ই লোকটার মাথাটা বিগড়ে গিয়েছে। টিখন এবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। যেভাবে লোকে ঘাড়ের ওপর থেকে মস্ত ভারি বোঝাটা ফেলে দিয়ে স্বস্তি অনুভব করে ঠিক সেইভাবে। সেই একঘেয়ে সুরে অতীতের গর্ভ থেকে জিনিস খুঁড়ে বের করে যা কিনা ভুলে যাওয়াই ভালো ছিল সেই সব কথাই বলতে থাকে।

আপনারা, অর্থাৎ আর্টামনোভরা আমার বিশ্বাসকে হত্যা করেছেন। আপনাদের জন্যে নিকিতা ইলিচ আমার বিশ্বাসকে হত্যা করেছে। সে নিজের বিশ্বাসও হারিয়েছে, আমারটাও নষ্ট করেছে। আপনাদের কোনো ঈশ্বরও নেই, শয়তানও নেই। আপনাদের ঘরে যে দেবমূর্তিগুলো রয়েছে ওগুলো শুধুই লোককে বোকা বানাবার জন্যে। আপনাদের মধ্যে বিশ্বাস বলে কোনো বস্তু আছে কি? এমন কিছু আছে কি যাতে আপনাদের বিশ্বাস আছে? হ্যাঁ, ধাপ্পাবাজিতে আপনাদের বিশ্বাস আছে। আপনাদের জীবন আগাগোড়াই মিথ্যায় ভরা। এখন সব উলঙ্গ হয়ে পড়েছে। ওরা আপনাদের মুখোস খুলে দিয়েছে।

প্রাণপণ চেষ্টায় পিওতর তার পা দুখানা মেঝের ওপর রাখার চেষ্টা করে কিন্তু মেঝের ঠাণ্ডার স্পর্শ অনুভব করে না। মনে হয় তার পা বুঝি ভেঙে গিয়েছে। হাঁটুর নিচ থেকে পায়ের বাকি অংশ শূন্যে ঝুলতে থাকে। ভয় পেয়ে পিওতর টিখনের কাঁধ আঁকড়ে ধরে।

এক ঝটকায় হাতখানা সরিয়ে দিয়ে টিখন বলে, আমাকে স্পর্শ করবেন না বলে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে জোরে পারবেন না। সে শক্তি আপনার নেই। শক্তি ছিল আপনার বাবার কিন্তু দম্ভে সব মাটি হয়ে গেল। আপনারা আমার বিশ্বাস নষ্ট করে দিয়েছেন, এখন আমি মরতেও ভয় পাই। আপনাদের শয়তানির কারসাজি দেখে দেখে আমার সব বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছে।

একদিকে খিদের জ্বালা অন্যদিকে পায়ের অবশ ভাবটা পিওতরকে ভাবিয়ে তুলেছে।

হায় ভগবান, আমি কি মরে যাচ্ছি? আমার তো পঁচাত্তর বছর বয়সও হয়নি। পিওতর আর একবার চেষ্টা করে শুয়ে পড়ার কিন্তু কিছুতেই পা তুলতে পারে না। টিখনকে তখন সে বলে, আমার পা দুটো তুলে দেবে?

টিখন ভূতপূর্ব মনিবের পা দুটো বেঞ্চির ওপর তুলে দিয়ে খানিকটা থুথু ফেলে। আবার টিখন নিজের জায়গায় টুপিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। তার হাতে কি যেন চিকচিক করে ওঠে। পিওতর ঠাহর করে দেখে

ওটি একটি ছুঁচ। অন্ধকারের মধ্যেই টিখন টুপি সেলাই করতে থাকে। পিওতর ভাবে এতেই প্রমাণিত হয় লোকটা পাগল। একটা হলুদ আলোর রেখা বাগানের মধ্যে দেখা যায়। দূর থেকে ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট একটি কণ্ঠস্বর ভেসে আসে :

আমাদের আর ফেরা যাবে না রুমরেড্স, না, কোনোদিনই আর ফেরা যাবে না।

ওই কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে টিখনের কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল, আপনার বাবা আমার ভাইকে খুন করেছিল।

মিথ্যে কথা! কখন খুন করেছিলেন?

সময় জেনে কী লাভ?

তুমি সব সময় মিথ্যে কথা বল কেন, উন্মাদ কোথাকার! কি চাও তুমি? তুমি কি আমার বিবেক? আমার বিচারক? কেনই বা বিগত তিরিশ বছরে এসব কথা বলনি?

বলিনি তার কারণ আমি ভাবছিলাম।

ও, বিদ্বেষ জমাচ্ছিলে। যাও, পুলিসের কাছে রিপোর্ট করে এস।

এখন পুলিস বলে কিছু নেই।

যাও, গিয়ে বলে এস, এই যে সেই লোক যে সারা জীবন আমার খাওয়া-পরা জুটিয়ে এসেছে। এর বিচার করুন। আমার তো মনে হয় তুমি রিপোর্ট করেই এসেছ। এস, আমাকে পীড়ন কর, ভয় দেখাও, চাপ দিয়ে টাকা আদায় করে নাও। এই তো তোমার মতলব।

টাকা আপনার নেই। একটি কানাকড়িও নেই। কোনোদিন ছিলও না। আর বিচারকের আমি ধার ধারি না। আমি নিজেই আমার বিচারক।

তাহলে আমাকে শাসাচ্ছ কেন?

টিখন যে তাকে শাসাচ্ছে না এমন একটা অস্পষ্ট অনুভূতি পিওতরের আছে। টিখন আবার বলে, খুনেদের দিন শেষ হয়েছে। কেন আমার ভাইকে খুন করা হয়েছিল?

ভাইয়ের ব্যাপারটাই মিথ্যে।

না, মিথ্যে নয়, আমি তখন তার সঙ্গে ছিলাম। যখন আপনার বাবা তাকে আঘাত করেছিল তখন আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। আমার ভাইয়ের রক্তই আপনার বাবা মৃত্যুর সময় বমি করেছিলেন নইলে অত রক্ত কোত্থেকে আসবে?

তুমি খুব দেরি করে ফেলেছ···

সে যাই হোক আপনি এখন সহায়সম্বলহীন, ধ্বংসের পথে, আর আমি যেমনটি ছিলাম তেমনই আছি, নেপথ্যে থেকে সব দেখে যাচ্ছি।

হ্যাঁ, একটা পাগল বনে গেছিস।

পিওতরের মনে হয় তার ভূতপূর্ব এই কর্মচারী তাকে ক্রমশই কোণঠাসা করে একটা গর্তের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। দুর্বোধ্য, ভয়াবহ সেই অন্ধকার। আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করে সে বলে, খুবই দেরি করে ফেলেছো। তোমার কোনোদিন কোনো ভাই ছিল না। তোমাদের মতো লোকের কিছু থাকে না।

থাকে। বিবেক থাকে।

তুমিই আমার ছেলে ইলিয়াকে বিপথে চালিত করেছ।

না, আপনারাই আমাকে বিপথে চালিত করেছেন। কতবার যে আপনার বাবাকে হত্যা করার ইচ্ছে হয়েছে আমার তার ইয়ত্তা নেই। আপনি একজন শঠ।

শঠ তুই।

অন্ধকারের মধ্যে ধমকানির কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

কে যায়? কে তুমি? তোমাদের বলা হয়েছে না রাত আটটার পর রাস্তায় বেরোবে না!

টিখন উঠে দরজার সামনে গিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর পিওতর দেখে বাগানে হলুদ আলোর রেখার ওপর দিয়ে একটা বড় কালো ছায়া চলে যায়। চরম কিছু ঘটতে যাচ্ছে সেই আশঙ্কায় পিওতর চোখ বোজে।

কিছু পেলে? টিখন কাকে যেন জিজ্ঞেস করে।

এইটুকুই পেয়েছি।

এ তো তার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর। এই বদমায়েশ বুড়োটার কাছে আমাকে রেখে কোথায় গিয়েছিল সে?

পিওতর চোখ মেলে তারপর কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ানো দুটি কালো মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে। এক ঝলক আলোর মতো সব অন্ধকার যেন এক মুহূর্তে আলোকিত হয়ে ওঠে, মনে পড়ে যায় সব কিছু। সারা জীবন সে ভেবে এসেছে কার দোষে তার জীবনটা এমন প্রবঞ্চনায় ভরে গেল।

স্ত্রী কাছে এসে নত হয়ে বলে, ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।

পিওতর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, টিখন, এই মেয়েছেলেটাই যত নষ্টের মূল। ওর লোভই আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে।

পরমুহূর্তেই বিজয়ীর মতো উল্লাস প্রকাশ করে বলে, নিকিতাও এরই জন্যে···টিখন, তুমি নিজেই তো তা জানো।

শ্বাস নেবার জন্যে পিওতর কথা থামাতেই খুব আশ্চর্য হয় নাতালিয়ার ওপর তার কটূক্তির কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে। সে একটুও কান্নাকাটি করল না। কম্পিত হস্তে পিওতরের চুলে বিলি কাটতে কাটতে উদ্বেগ ও স্নেহমেশানো কণ্ঠস্বরে ফিসফিসিয়ে বলল, চুপ! চেঁচামেচি কর না, বাইরে সব পাজি লোকগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমাকে কিছু খেতে দাও।

নাতালিয়া কিছুটা চাটনি আর একখানা ভিজে রুটি স্বামীর হাতে তুলে দেয়। চাটনিটা গরম কিন্তু রুটিটা আঠার মতো তার আঙুলে লেগে যায়।

বিস্ময়ে ক্ষোভে পিওতর চিৎকার করে বলে, এ কি! আমার জন্যে শুধু ই নিয়ে এসেছ?

ঈশ্বরের নামে তোমায় অনুরোধ করছি, চুপ কর। ফিসফিসিয়ে আবার স বলে, আর কিছুই পাওয়া গেল না এমন কি সৈন্যরাও···

আমার সারা জীবনের অবদানের বিনিময়ে তুমি আমাকে এই দিচ্ছ? আমার সারা জীবনের ভয়, পরিশ্রমের বিনিময়ে তুমি আমাকে···

বিড়বিড় করতে করতে রুটিখানাকে পরখ করছিল পিওতর। অস্পষ্ট ব সে অনুভব করল মারাত্মক কিছু একটা ঘটেছে। অসহনীয়, চরম পমানজনক কিছু আর তার জন্যে বোধহয় নাতালিয়াকে দায়ী করা ল না।

রুটিখানাকে দরজার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্লান্ত কিন্তু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, এ আমার চাই না।

টিখন রুটিখানা মাটি থেকে তুলে ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝেড়ে নিয়ে নাতালিয়াকে দেয়। নাতালিয়া স্বামীর হাতে রুটি তুলে দিয়ে বলে, লক্ষ্মীটি রাগ করো না, খেয়ে নাও।

নাতালিয়ার হাত সরিয়ে দিয়ে পিওতর চেপে চোখ বন্ধ করে। রাগে ফেটে পড়ে বলে, এ আমার চাই না, দূর হও তুমি।

সমাপ্ত

'ডেকাডেন্স' প্রসঙ্গে

ম্যাকসিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬) টলস্টয়ের সঙ্গে কথোপকথনে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছিলেন " আমার জানা একটি ধনী বণি পরিবারের কাহিনী তাঁকে শুনিয়েছিলাম। অধঃপতনের অমোঘ নি নির্মম ভাবে অনুসৃত হয়েছিল সেই কাহিনীতে। শুনতে শুনতে টল এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি আমার জামা টেনে বলেছিলেন, ব'ল যাও, বলে যাও, থেমো না। সমগ্র পরিকল্পন শোনার পর টলস্টয় মন্তব্য করেছিলেন, অপূর্ব! অনবদ্য! আমি কর পাপ আর তুমি আমার কল্যাণের জন্যে প্রার্থনা করবে! মদ্যপ, লম্প অর্থপিশাচ ভাইদের জন্যে এক ভাই চলে গেল মঠে সন্ন্যাসীর জীব গ্রহণ করে ওদেরই জন্যে প্রার্থনা করতে! চমৎকার! এ কাহি তোমাকে লিখতেই হবে।

যদিও ১৯০৪ সালেই উপন্যাসটির ছক তিনি তৈরি করে রে ছিলেন তবু লেনিনের পরামর্শে আর্টামনোভ পরিবারের তিন পুরু কাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচনায় হাত দেন ১৯২৪ সালে। ফলে উপন্যাসটি হয়ে দাঁড়ায় এক ধরনের ঐতিহাসিক দলিল। একদিকে যেমন প্রা বৈপ্লবিক রাশিয়ার বুর্জোয়াদের জীবনযাত্রার নিখুঁত ছবি এঁকে অন্যদিকে এদের পতন ও ক্ষয় (ডেকাডেন্স) যা ছিল অবধারিত বিপ্লব জয়যাত্রার মধ্যেই তেমনি উপন্যাসটির সার্থক পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে গোর্কি। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসটি তিনি উৎসর্গ করেছিলে রোমাঁ রোলাঁকে। উৎসর্গপত্রটি অভিনবত্বের জন্যেই এখানে তুলে দেওয়া হল :

"To Romain Rolland
man
and Poet"